KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৪৪ সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীল উৎসব
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5	Year of Publication : May 1985 Jun 1985 July 1985 Aug 1985 Sep 1985
	Condition : Brittle Good
Editor : বিজয়ার ঘটকরায়, অভিজিৎ চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

সেপ্টেম্বর
১৯৮৫

সূচিপত্র

উগ্রপন্থীদের হাতে লঙ্গোয়ালের মৃত্যুতে পানজাবে নির্বাচন কিভাবে প্রভাবিত হবে? সাধারণ মানুষ ভোট দেবেন, কি দেবেন না—তাতেই কি বোঝা যাবে পানজাব-চুক্তির সামর্থ্য কতখানি? পানজাব প্রসঙ্গে **সনাতন মিত্র** আলোচনা 'পানজাবের ভবিষ্যৎ'।

প্রাণের রহস্য নিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। এই প্রাণেরই ধর্ম আর উপাদান বিষয়ে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে অ-বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞাসু পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন **দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়** 'প্রাণের ধর্ম ও উপাদান' নিবন্ধে।

আসাম-চুক্তির আইনগত যৌক্তিকতা কী? তার পরিণাম কী? কত বিপুলসংখ্যক মানুষ ভোটাধিকার হারিয়ে অ-ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছেন? আসাম সমস্যা নিয়ে এ মাসের **দেশে বিদেশে**।

ধারাবাহিক রচনা—**সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সেলিনা হোসেন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ**।
আমাদের বিচলিত মূল্যবোধ নিয়ে এ মাসের গল্প **উৎপলকুমার দত্তের** 'পৃথিবীর অসুখ'।

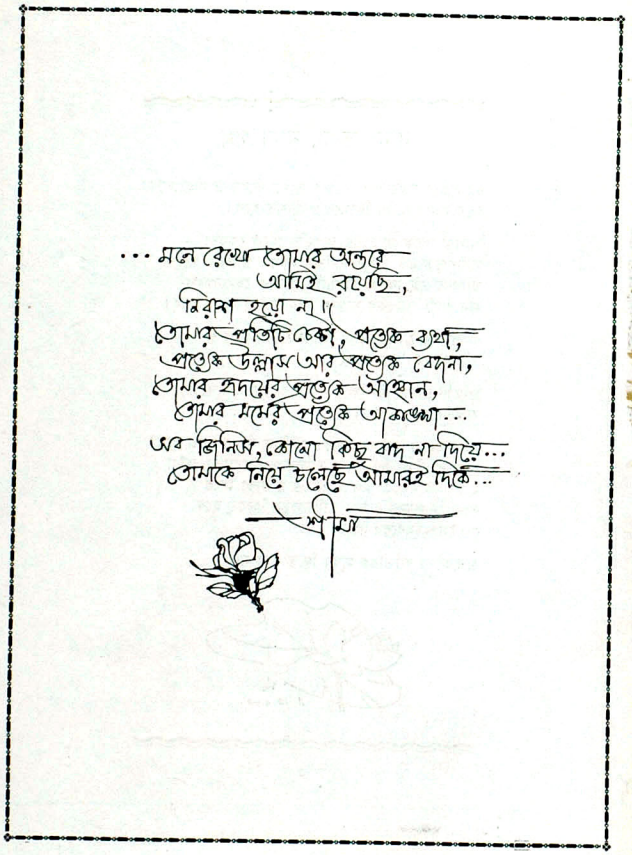

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ৫
সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
ভাদ্র ১৩৯২

প্রাণের ধর্ম ও উপাদান দীপংকর চট্টোপাধ্যায় ৩৪৯
আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ শংকর ঘোষ ৩৭৭
পানজাবের ভবিষ্যৎ সনাতন মিত্র ৪০৯

মার্বেল-সিঁড়ির ছায়া বিরাম মুখোপাধ্যায় ৩৬৫
শেষপাতা মতি মুখোপাধ্যায় ৩৬৬
বিরহ কান্তিময় ভট্টাচার্য ৩৬৭
দুটি কবিতা কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার ৩৬৮

পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ৩৬৯
পৃথিবীর অসুখ উৎপলকুমার দত্ত ৩৮৫
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৯২
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪০০

গ্রন্থসমালোচনা ৪১৪
গৌতম নিয়োগী, রশীদ আল ফারুকী, বিজিতকুমার দত্ত,
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, বর্ণালী দাস

নানা প্রসঙ্গ ৪২৪
দেবীপদ ভট্টাচার্য, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়,
ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আলোচনা ৪৩১
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী দাস

ঢাকার চিঠি ৪৩৮
সৈয়দ আবুল মকসুদ

প্রবন্ধচিত্র : রনেনআয়ন দত্ত

মুখপাতের ছবি। হেমন্ত মিশ্র

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

পশ্চিমবঙ্গ গণ্ডীগ্রন্থাগার সংস্থা কলিকাতা
ডাকটিকিট দিতে হইবে

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সরল সহজ ভাষায় লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ৫·০০ টাকা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত—অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। মূল্য ৯·৫০ টাকা

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বঙ্গের তথা ভারতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ও সচিত্র আলোচনা। মূল্য ১৮·০০ টাকা

ভারতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ২৪·০০ টাকা

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

অল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। রচনার বৈচিত্র্যে সাহিত্যের মতোই সরস ও সুপাঠ্য। মূল্য ২·০০ টাকা

হিন্দু সমাজের গড়ন ॥ নির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতের বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র-সংবলিত। মূল্য ১৫·০০ টাকা

পৃথ্বীপরিচয় ॥ প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথিবীর জন্মকথা থেকে ক্রমবিকাশের পথে সে কেমন করে প্রাণীবিকাশের অনুকূল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তার চমৎকার বর্ণনা। মূল্য ৭·৫০ টাকা

প্রাণতত্ত্ব ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীববিদ্যার মূল তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ১০·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

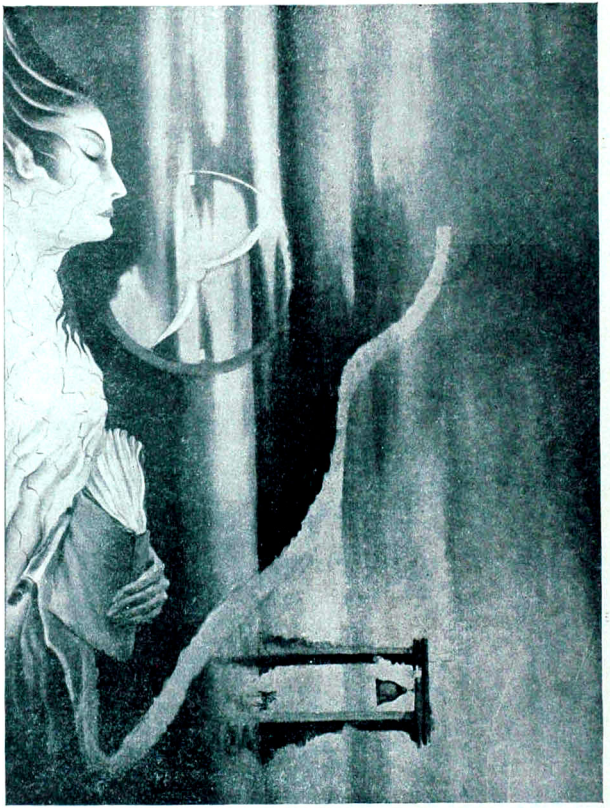

প্রাণের ধর্ম ও উপাদান

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট-ছোট্ট ছেলেরা সব কী দিয়ে হয় তৈরি?
ছোট্ট-ছোট্ট ছেলেরা সব কী দিয়ে হয় তৈরি?
শামুক ছুঁচো ব্যাঙ
আর পিঁপড়ের ঠ্যাঙ
ছোট্ট-ছোট্ট ছেলেরা সব তাই দিয়ে হয় তৈরি।

ছোট্ট-ছোট্ট মেয়েরা সব কী দিয়ে হয় তৈরি?
ছোট্ট-ছোট্ট মেয়েরা সব কী দিয়ে হয় তৈরি?
মশলা চিনি তুলো
আর যা-কিছু ভালো,
ছোট্ট-ছোট্ট মেয়েরা সব তাই দিয়ে হয় তৈরি।

—গুরুসদয় দত্ত (ইংরেজি ছড়ার অনুসরণে)

এই বিশ্বের সমস্ত অস্তিত্বের মূলে আছে একদিকে আকস্মিকতা আর অন্য দিকে প্রয়োজন। —দেমোক্রিতোস

সচরাচর যাকে আমরা প্রাণের রহস্য বলি, তার মূল কথা হল প্রাণলোকের বিপুল বৈচিত্র্য এবং জটিলতা। পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নশাস্ত্রের তুলনায় প্রাণতত্ত্বের বিকাশ এই কারণেই পরে হয়েছে এবং ধীরে-ধীরে হয়েছে। প্রাণতত্ত্বের প্রধান সূত্রগুলির মূলে আছে অগণিত সপ্রাণ সত্তার ব্যাপক এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণের মোটামুটি দুটো ধারা ছিল।

(১) জীববৃত্তান্ত (ন্যাচারাল হিস্ট্রি) এবং ভূতত্ত্ব : এই ধারার পদ্ধতিটা ছিল নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে প্রাণী আর উদ্ভিদসমূহের বাইরের চেহারা, গড়ন, অঙ্গসংস্থান ইত্যাদি লক্ষ করা এবং সেইসব লক্ষণের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা। ভূতত্ত্বের দিক থেকে জীবাশ্মের চর্চাও এই পদ্ধতিরই অঙ্গ ছিল। এরই পরিণামে শেষ পর্যন্ত ডারউইন এবং ওয়ালেসের অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অভিব্যক্তিবাদকে বলতে পারি আধুনিক প্রাণতত্ত্বের প্রথম মহৎ সামান্যীকরণ।

(২) প্রথমে অনুবীক্ষণ এবং পরে রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীরের ভিতরকার গড়ন খতিয়ে দেখা। অনুবীক্ষণযন্ত্র প্রথম ব্যবহৃত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, কিন্তু দু-শ বছর পরে কোখ্ এবং পাস্তুরের হাতে জীবাণু-সংক্রান্ত গবেষণাতেই তারা আধুনিক প্রাণতত্ত্বের শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৮২৭ সালে আর্মিচ

যে বর্ণচ্ছটাবিহীন অনুবীক্ষণ তৈরি করলেন, কোষকলার সূক্ষ্ম গড়নের পর্যবেক্ষণ তার ফলে সহজ হল। ১৮৩৯ সালে শ্লিডেন এবং শোয়ান্ দেখালেন যে প্রাণীর শরীর আসলে অসংখ্য কোষের সমষ্টি। অভিব্যক্তিবাদ যেমন বিভিন্ন প্রজাতির বিকাশকে বুঝতে সাহায্য করে, কোষতত্ত্ব তেমনি ব্যক্তির বিকাশকে বোধগম্য করে তোলে। ফন্ বেয়ার দেখালেন, শুক্রকোষ আর অণ্ডকোষের মিলনের ফলে নিষিক্ত অণ্ডকোষ থেকে কিভাবে ভ্রূণের বিকাশ হয়। উন্নত প্রাণীদের গড়নের বিপুল জটিলতার ফলেই অবশ্য প্রথম যুগে এই জ্ঞান কার্যত খুব একটা এগিয়ে যেতে পারে নি। কালক্রমে এককোষী প্রোটোজোয়া এবং জীবাণুর সরলতর গড়ন এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ে চর্চা শুরু হল। অনুবীক্ষণ এবং রাসায়নিক পদ্ধতি, দুটোই এই চর্চায় কাজে লাগল। লুই পাস্তুর ছিলেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ। সিরকা যখন গেঁজে যায়, তখন ঈস্টের ছোটো-ছোটো গোলাকার কোষই তার মধ্যে কাজ করে, এটা পাস্তুর দেখালেন। ঈস্টের অনুপস্থিতিতে গেঁজানো ব্যাপারটাই ঘটে না। প্রাণতত্ত্বের ইতিহাসে এটা একটা বড়ো ঘটনা, কারণ তার আগে গেঁজানোর প্রক্রিয়াকে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হত। পাস্তুরের গবেষণা জীবাণুতত্ত্বের অগ্রগতির পথ খুলে দিল। ক্রমশ এইভাবেই প্রাণরসায়নের বিকাশ সম্ভব হল। সেই প্রাণরসায়নের কাজ হল সপ্রাণ সংস্থার দেহকোষের রাসায়নিক উপাদানগুলিকে জানা এবং তাদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে বোঝা। আস্তে-আস্তে এটা বোঝা গেল যে, যে-কোনো দেহকোষের ভিতরে কয়েক হাজার স্বতন্ত্র রাসায়নিক উপাদান থাকে। তার মধ্যে অন্তত কয়েক শ উপাদান তৈরি হয় কোষের মধ্যেই। এই কয়েক শ উপাদানের সংযোগে আবার গড়ে ওঠে কয়েক হাজার বড়ো-বড়ো অণু (ম্যাক্রোমলিকিউল)। এইসব অণুর কোনো-কোনোটি থেকে শক্তি আহরণ করে গড়ে ওঠে কোষের বিভিন্ন উপাঙ্গ। এই যে জটিল বিচিত্র রাসায়নিক ঘটনাসমষ্টি, একেই আমরা সংক্ষেপে বলি জীবন। জীবন বলতে সাধারণত যে ছবিটা মনে আসে, সেটা হল একটা গোটা প্রাণী বা উদ্ভিদের ধর্ম। অন্যদিকে কোষের ভিতরকার রাসায়নিক ক্রিয়াগুলিকে পরিভাষায় বলা হয় বিপাকীয় ক্রিয়া (মেটাবলিজম)। আর এইসব ক্রিয়াতে যোগদান করে যেসব অণু, তাদের বলা হয় বিপাকীয় উপাদান (মেটাবলাইট)।

আমাদের এই প্রবন্ধে আমরা কোষের বিপাকীয় উপাদান এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে যথাসম্ভব সহজে করে কিছু কথা বলব। পুরো ব্যাপারটা যেহেতু অত্যন্ত জটিল, সেইহেতু শুধু কয়েকটি মোটা কথাই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলা যাবে। এমন কয়েকটি কথা, যাতে প্রাণধারণের কয়েকটি মূলসূত্রের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তার আগে আমরা অন্য একটি কাজ করব। প্রাণধারণের মূলসূত্রগুলিকে সহজে করে বলবার খাতিরে প্রাণের কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আমরা একটু খতিয়ে দেখব।

প্রাণের সামান্য লক্ষণ বলতে অবশ্য অনেক প্রশ্নই উঠে যেতে পারে। আমরা এখানে সেইসব দার্শনিক প্রশ্নের মধ্যে যাব না। না গিয়ে বরং ব্যাপারটাকে একটু সহজ করে দেখব। বিখ্যাত প্রাণতত্ত্ববিদ জাক মোনোকে অনুসরণ করে আমরা সরলচিত্তে একটি কাল্পনিক পরীক্ষার কথা ভাবব।[১] পরীক্ষাটা এইরকম। মনে করুন, মঙ্গলগ্রহে মহাকাশবিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা আছে। সেই সংস্থা জানতে চান, পৃথিবীতে সভ্য প্রাণীর বসবাস আছে কিনা। সভ্য প্রাণী বলতে তাঁরা বোঝেন এমন প্রাণী, যারা জীবনধারণের খাতিরে নানা কৃত্রিম উপকরণ তৈরি করে। এই কৃত্রিম উপকরণগুলির গড়নের মধ্যে একটা সাযুজ্য থাকে, যা প্রাকৃতিক জিনিসের মধ্যে সচরাচর থাকে না। যেমন ধরুন পরিচ্ছন্ন সমতল, বা সরলরেখা, বা সমকোণ ইত্যাদি। এইসব সরল জ্যামিতিক লক্ষণ মানুষের হাতে-গড়া জিনিসে বারবার ফিরে-ফিরে আসে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এগুলো বড়ো একটা দেখা দেয় না। ঘটনাচক্রে যদি-বা দেখা দেয়, বারবার একইভাবে দেয় না। এবারে মনে করুন, মঙ্গলগ্রহের ওই গবেষক সংস্থা একটি যন্ত্র তৈরি করলেন যা এই ধরনের সাযুজ্যের লক্ষণসমন্বিত কৃত্রিম উপকরণ সহজেই খুঁজে বার করতে পারে, এবং তাই থেকে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা রাখে। এই যন্ত্রটিকে তাঁরা মহাকাশযানে চাপিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। যন্ত্রটি এসে নামল কলকাতার উপকণ্ঠে কোনো জায়গায়, ধরুন সল্ট লেক উপনগরীতে। ভূপৃষ্ঠে নেমেই দু ধরনের জিনিস যন্ত্রটির নজরে পড়ল : (ক) উপনগরীর সাজানো ছিমছাম বাড়িগুলো, আর (খ) রাস্তার অন্যপাশে একটু দূরে কয়েকটি টিলা। এই দু ধরনের জিনিসের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে সে এইমাত্র আলোচিত লক্ষণ দুটি খুঁটিয়ে দেখবে। অর্থাৎ গড়নের জ্যামিতিক সারল্য এবং পৌনঃপুনিকতা বিচার করে সে বুঝতে পারবে যে টিলাগুলি প্রাকৃতিক বস্তু, আর বাড়িগুলো কোনো সভ্য প্রাণীর হাতেগড়া জিনিস।

বেশ, এই পর্যন্ত তো ভালোই হল। এবারে ধরুন, যন্ত্রটির নজর গেল ওই অঞ্চলে কোনো গাছের ডালে গড়ে-ওঠা একটি মৌচাকের দিকে। মৌচাকের ভিতরে এক-একটি ছোটো-ছোটো খোপের সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য যন্ত্রটি কী সিদ্ধান্ত করবে? খোপের গড়নের সুষমা আর পৌনঃপুনিকতা দেখে অবশ্যই কৃত্রিম বলে ধরে নেবে। এখন, যাঁরা মৌচাকের গড়নের বিষয়ে জানেন, তাঁরা বলবেন এর মধ্যে ভাবনাচিন্তা বা পরিকল্পনার কোনো ব্যাপার নেই, প্রকৃতির সহজ নিয়মের বশে স্বাভাবিকভাবেই এগুলি একটি বিশিষ্ট আকার পায়। অর্থাৎ মৌচাকের গড়ন আসলে একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। তার মানে, একটু ধাঁধা রয়ে গেল।

ধাঁধার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। মৌচাকের গড়ন থেকে এবারে যদি আমাদের আগন্তুক যন্ত্রটি মৌচাকের বাসিন্দাদের দিকে নজর ফেরায়, তবে কী দেখবে? দেখবে, খুব জটিল-দৈহিকগড়ননবিশিষ্ট অনেকগুলি ছোটো-ছোটো সচল সত্তাকে, যারা আগাগোড়া একই ছাঁচে তৈরি। কারণ, একটি মৌমাছির সঙ্গে অন্য-সমস্ত মৌমাছির আপাদমস্তক মিল রয়েছে সমস্ত দিক দিয়েই। এই সচল সত্তাগুলিকে সহজেই সে উঁচুদরের কোনো শিল্পজাত যন্ত্র বলে ভেবে নিতে পারবে। অর্থাৎ গোটা মৌমাছিতন্ত্রকেই তার কৃত্রিম বলে মনে হবে।

তাহলে এইভাবে বাইরের লক্ষণ ধরে এগিয়ে গিয়ে কৃত্রিম জিনিস আর প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে তারতম্য করা কি সম্ভব? যেমন ধরুন, এই একই পদ্ধতিতে একটি ঘোড়া আর একটি মোটরগাড়ির মধ্যে কি তফাত করা যাবে? এই দুটি সত্তার মধ্যে বাহ্য অমিল নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আরো গভীরতর মিল আছে এই ব্যাপারে যে এরা উভয়েই দ্রুত চলাফেরা করবার ক্ষমতা রাখে। মোটরগাড়ি চলে রাস্তা দিয়ে, আর ঘোড়া চলতে পারে যে-কোনো জায়গায়—সেই কারণেই তাদের গড়নের অসাম্য আছে।

এইভাবে দেখতে গেলে কিন্তু সমস্ত সপ্রাণ সংস্থার মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় : প্রতিটি সপ্রাণ সংস্থার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে, পরিকল্পনা আছে। এইমাত্র ঘোড়া-নামক যে প্রাণীটির কথা বলা হল, তার গোটা দেহের গড়নের মধ্যে দ্রুতবেগে চলার ব্যাপারটা একটা উদ্দেশ্যের মতো স্বপ্রকাশ হয়ে আছে। অবশ্য মোটরগাড়ির ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য এবং মোটরগাড়ি নিশ্চয়ই প্রাণী নয়, অন্য প্রাণীর তৈরি যন্ত্রমাত্র। তাহলে এদের মধ্যে তফাত কিভাবে করব? তফাত তো করতেই হবে। কিভাবে, সেটা এখনই দেখা যাবে, কিন্তু তার আগে এটা বোঝা দরকার যে উদ্দেশ্যযুক্ত হলেই যদিও প্রাণী হয় না, তবু প্রাণী হতে হলে যে উদ্দেশ্যযুক্ত হতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ উদ্দেশ্যযুক্ত হওয়াটা প্রাণিমাত্রেরই প্রয়োজনীয় লক্ষণ, যদিও লক্ষণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট নয়। এই উদ্দেশ্যযুক্ত হওয়াটাকে পরিভাষায় বলা হয় টেলিয়োনমি। বাঙলায় একে আমরা বলতে পারি উদ্দেশ্যময়তা।

এখন এইমাত্র মোটরগাড়ি আর ঘোড়ার মধ্যে যে তফাত করার কথা বললাম, সেটা কিভাবে হবে? একটু তলিয়ে দেখলেই খুব স্পষ্ট একটা তফাত চোখে পড়বে। মোটরগাড়ি জিনিসটা তৈরি করতে লোহালক্কড় আর অন্য যেসব উপাদান লাগে, সেগুলো আপনাআপনি জোড়া লাগে না, বাইরে থেকে জোড়া দিতে হয়। শুধু মোটরগাড়ি নয়, যে-কোনো কৃত্রিম জিনিস বা যন্ত্রই তৈরি হয় বাইরের কোনো-না-কোনো কর্তার প্রভাবে। অপর পক্ষে, সপ্রাণ যে-কোনো সংস্থা বাইরের কোনো শক্তির প্রভাবে তৈরি হয় না। তার অস্তিত্বের মূলে থাকে নিজেরই ভিতরকার স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা, এবং সেই ক্ষমতার আত্মপ্রকাশের নিয়মকানুন। বাইরে থেকে হাজার চেষ্টা করেও নিমের গাছে শিম ফলানো যায় না, বড়ো জোর তার ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে নতুন চারাগাছের বিকাশকে ব্যাহত করা যায়। প্রাণীর প্রতিটি দেহকোষের মধ্যেই থাকে তার স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের নিজস্ব নকশা। সেই নকশাকে অনুসরণ করেই গড়ে ওঠে তার পরিণত চেহারা।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম : প্রতিটি সপ্রাণ

সংস্থার জটিল গড়ন এবং ক্রিয়ার মূলে আছে তার নিজেরই ভিতরকার স্বয়ম্ভর উদ্দেশ্যময়তা। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত সেই পর্যবেক্ষক যন্ত্রটি যে-মুহূর্তে এটা আবিষ্কার করবে, সেই মুহূর্তে তার মনে হবে যে এই ধরনের একটি সংস্থার জটিল গড়নের পিছনে নিশ্চয়ই অনেকটা তথ্যের সরবরাহ আছে। সেই তথ্য কোথা থেকে আসে?

এবারে সেই যন্ত্র তার চূড়ান্ত আবিষ্কারটি করবে। সেই আবিষ্কারটি হল এই যে, প্রত্যেক সপ্রাণ সংস্থার সংগঠনের মধ্যে প্রকাশমান যাবতীয় তথ্য আসে অনুরূপ গড়নের অন্য একটি সত্তা থেকে। এই শেষোক্ত সত্তাকে আমরা বলি প্রথমটির জনক (অথবা জননী)। অর্থাৎ সপ্রাণ সংস্থার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ পাওয়া গেল : নিজের অনুরূপ নতুন সংস্থা বা সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতা তার আছে। সেই সন্তানের মধ্যে সে তার নিজের গড়ন-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অক্ষত আকারে সঞ্চারিত করে দেয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এইভাবেই প্রাণের সংগঠনের নকশা সংরক্ষিত হয়ে যায়। এই বিশেষ গুণটিকে আমরা বলব নিত্যজনন অথবা সংক্ষেপে শুধুই নিত্যতা (ইনভ্যারিয়েন্স)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাণের তিনটি সামান্য লক্ষণ হল উদ্দেশ্যময়তা, স্বাধীন স্বনির্মাণ এবং নিত্যজনন। এর মধ্যে নিত্যজননের ধর্মটিই বিশেষ করে চোখে পড়ে এবং সবচেয়ে সহজে বর্ণনা করা যায়। এই নিত্যজননের মূল কথাটা হল উচ্চদরের বিন্যাসসম্পন্ন গড়নের হুবহু প্রতিকৃতি তৈরি করা। বলা বাহুল্য, এর জন্যে প্রচুর পরিমাণ তথ্যের প্রয়োজন। সপ্রাণ সংস্থাটি যত জটিল এবং উন্নত হবে, তার নিত্যজননের জন্যে ততই বেশি পরিমাণে তথ্য লাগবে। এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত এই তথ্যই প্রাণীর জাতিরূপকে অপরিবর্তিত রাখে। তাই যে-কোনো প্রজাতির সহজাত এই তথ্যের পরিমাণকে আমরা বলতে পারি তার 'নিত্যতার আধেয়'।

প্রাণের অন্য যে বিশিষ্ট লক্ষণের কথা একটু আগে বলেছি, সেই উদ্দেশ্যময়তা ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। উদ্দেশ্য বলতেই আমাদের কোনো-না-কোনো পরিকল্পনার কথা মনে আসে। কিন্তু পরিকল্পনা জিনিসটা তো আত্মমুখ (সাবজেকটিভ)। কোনো বস্তুর মধ্যে যখন পরিকল্পনার উপস্থিতি দেখি, তখন এটাই তো মনে হয় যে ঘটনাটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে নি, বাইরে থেকে কেউ ঘটিয়ে দিয়েছে। একদিকে বলছি, সপ্রাণ সংস্থা নিজের ভিতর থেকেই গড়ে ওঠে, বাইরের কোনো শক্তি তার অস্তিত্বের মূলে কাজ করে না। আবার অন্যদিকে বলছি, তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে, পরিকল্পনা আছে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী? উদ্দেশ্যময়তা মানে কি তবে ছদ্মবেশে কোনো পরম জগৎকারণের অবতারণা? বিজ্ঞানীরা যে বলেন, সৃষ্টির মূলস্বরূপ কোনো পরম কারণে (ফাইনাল কজ) তাঁদের বিশ্বাস নেই, সেটা কি তাহলে বাজে কথা? বলা বাহুল্য, প্রশ্নটি খুব সহজ নয়। এ-প্রশ্নের আলোচনা আমরা একটু পরে করব। তার আগে উদ্দেশ্যময়তা ব্যাপারটার স্বরূপ নিয়ে একটু ভাবা যেতে পারে।

যে-কোনো সপ্রাণ সংস্থার মধ্যে উদ্দেশ্যময়তা অবশ্য নানাভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। তৃণভোজী প্রাণীর পাকস্থলীতে একাধিক প্রকোষ্ঠ থাকে, যাতে দুষ্পাচ্য তৃণ হজম করা সহজ হয়। মরুভূমির কাছাকাছি অঞ্চলে যে ক্যাকটাস-জাতীয় গাছ জন্মায়, জলীয় বাষ্প সংরক্ষণের খাতিরে অভিযোজনের ফলে তার পাতাগুলি কাঁটার আকার ধারণ করে। এইরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একেবারে দেহকোষের স্তরেও প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব সার্থকতা আছে, কোথাও উদ্বৃত্ত বলতে কিছু নেই। আবার এই সবকিছুর ভিতর দিয়ে একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যায়। সেই উদ্দেশ্য হল প্রাণীর আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি। ছোটো-বড়ো বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের নিজস্ব উদ্দেশ্যকে যদি এক-একটি বাজনা বলে ভাবি, তবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যটিকে বলব এদের মিলিত ঐকতান। সপ্রাণ সংস্থার যা-কিছু ক্রিয়া, তার অন্তিম উদ্দেশ্য হল প্রজাতির নিত্যতার উপাদানকে যথাসম্ভব অক্ষত রেখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত করা। অভিব্যক্তির দিক দিয়ে যে প্রজাতি যত উন্নত, তার মধ্যে এই মৌল উদ্দেশ্যটি তত বিচিত্রভাবে কাজ করে যায়।

একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো। নিত্যজননের এই যে মৌল উদ্দেশ্য, তার কেন্দ্রে তো আছে জননের ব্যাপারটাই। সেই জননের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য কিভাবে সরবরাহ করা হয়, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু প্রজাতির সংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির সঙ্গে এ ছাড়া আরো অনেক বিচিত্র ক্রিয়া, অনেক ধরনের অভিযোজন আর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও জড়িত হয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে এইসব পরোক্ষ ক্রিয়াকলাপের পরিধি অনেকটা বিস্তৃত হয়। যে প্রাণী যত উন্নত, তার শৈশব তত দীর্ঘ হয়। এই দীর্ঘ শৈশবের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল খেলা। খেলার ভিতর দিয়ে শিশুর মনের বিকাশ হয়, সমাজের মধ্যে তার স্বাঙ্গীকরণ ঘটে। শিশু যে গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তার ঐক্যও এইভাবে দৃঢ় হয়। সব মিলিয়ে এতে প্রজাতির সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণের সাহায্য হয়। এমনকি মানুষের সমাজে শিল্পকলা কিংবা সংগীতের কথা যদি ভাবি, তবে শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির কাজে তাদের ভূমিকাও রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে। তার কারণ, মানুষের যৌনতা তার অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে পরিকীর্ণ হয়ে থাকে, আর তার ব্যক্তিসত্তাও সমাজের এইসব সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পূর্ণতা খুঁজে পায়। মানুষের বেঁচে থাকা আর বংশরক্ষার উদ্দেশ্যকে ঘিরে নানা ধরনের সংকেতের তন্ত্র গড়ে উঠেছে। তাকেই আমরা বলি মানুষের সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ যেভাবে নিজের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করে, তার কোনো তুলনা অন্য কোনো প্রজাতির মধ্যে অন্তত দৃশ্যত মেলে না। সেই কারণেই মানুষের সংস্কৃতিতে প্রাণধারণ আর বংশবৃদ্ধির মৌল উদ্দেশ্যের উপস্থিতি অনেক সময় আমরা ঠাহর করতে পারি না।

যাই হোক, উদ্দেশ্যময়তা, স্বাধীন স্বনির্মাণ এবং নিত্যজনন—প্রাণের এই তিনটি ধর্মের মধ্যে অবশ্যই কিছু-কিছু সম্বন্ধ আছে। জননের নিত্যতাকে সচরাচর আমরা বলি বংশগতি। সেই বংশগতি আত্মপ্রকাশ করে প্রাণিদেহের স্বনির্মাণের মাধ্যমে। আর এই দেহের গড়নের মধ্যেই নানাভাবে কাজ করে যায় প্রাণের বিচিত্র উদ্দেশ্যময়তা। তবু এটাও ঠিক যে উদ্দেশ্যময়তা এবং জননের নিত্যতাকে যে-অর্থে প্রাণের মৌল লক্ষণ বলতে পারি, ঠিক সেই অর্থে প্রাণিদেহের স্বনির্মাণকে আমরা প্রাথমিক মর্যাদা দিতে পারি না। বরং দেহের স্বাধীন সংগঠনশীলতাকে বলা যায় অন্য দুটি মৌল লক্ষণের রূপায়ণের পদ্ধতি। অর্থাৎ সেই সংগঠনশীলতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যময়তা এবং জননের নিত্যতাকে প্রকাশ করা।

একবার যদি মেনে নিই যে উদ্দেশ্যময়তা এবং নিত্যজননই হচ্ছে প্রাণের মূলগত ধর্ম, তবে সেই ধর্মের তাৎপর্য নিয়ে আবার নানা ধরনের দার্শনিক প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাণ এবং অপ্রাণের ভেদ নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার ইতিহাসে অনেক তর্কের নজির পাওয়া যাবে। সমস্ত লৌকিক ধর্মমতের মধ্যেই তো এইরকম কিছু-না-কিছু তর্কের বীজ আছে। আমরা এখানে তার আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে উদ্দেশ্যময়তা আর জননের নিত্যতা, এই দুটি স্বতন্ত্র লক্ষণের অস্তিত্ব ধর্মে বিজ্ঞানে এবং দর্শনে সর্বত্রই স্বীকৃত।

২

এ পর্যন্ত যা বলা হল, তাতে প্রাণের শরীরী উপাদান সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা হয় নি। এবারে আমরা সেই প্রসঙ্গে চলে আসতে পারি। বলা বাহুল্য, প্রাণের মৌল দুটি লক্ষণ প্রাণীর শরীরের গড়নের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। সেই গড়নের মধ্যে কোনো সর্বজনীন নীতি আছে কি? অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নের আলোচনায় আমরা যেমন অণু-পরমাণুকেই পদার্থের প্রাথমিক উপাদান বলে ধরে নিই, প্রাণতত্ত্বের আলোচনায় তেমন কোনো প্রাথমিক উপাদানের কথা কি ভাবা যায়? পদার্থবিদ্যায় পরমাণুর (কিংবা অণুর) ধারণাকে সর্বজনীন বলা যায় এই কারণে যে বিভিন্ন পদার্থের বাইরের গড়ন এবং চেহারা যেমনই হোক না কেন, সেই গড়নের মূলে পরমাণুর সমষ্টি কাজ করে। অন্তত এইভাবে ভাবলে পদার্থের ধর্ম সহজে বোঝা যায়। সপ্রাণ সংস্থার অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যেও কি তেমন কোনো উপাদান কাজ করে?

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই প্রশ্নের উত্তরও গিয়ে দাঁড়ায় ওই এক জায়গাতেই : সপ্রাণ হোক আর অপ্রাণ হোক, সমস্ত পদার্থের মূলেই আছে অণু-পরমাণুর উপাদান। এটা কোনো অনুমান নয়, পুরোপুরি পরীক্ষিত সত্য। উনিশ শতকের শেষাধেই একটা জিনিস মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল : প্রাণীর দেহকোষে এমন কোনো পরমাণু পাওয়া যায় না, যা

জড়জগতে অনুপস্থিত। তবে সপ্রাণ সংস্থামাত্রেই দেহের গড়নে কারবন পরমাণুর উপস্থিতি একটু বেশি করে চোখে পড়ে। সেই কারণে কারবনঘটিত যৌগ (কম-পাউন্ড) পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলীর চর্চাকে একটু আলাদা করে বলা হত জৈব রসায়ন (অরগানিক কেমিস্ট্রি)। এখন কিন্তু আমরা জানি যে কারবনঘটিত যৌগসমূহের এমন কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই যাতে তাদের আলাদা করে দেখা প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ কারবন পরমাণুর উপস্থিতি-নির্বিশেষে রসায়নশাস্ত্র মূলত এক এবং অদ্বিতীয়। তবে প্রাণীর দেহকোষে যেসব অণুপরমাণু থাকে, তাদের জটিল ক্রিয়াকলাপের চর্চাকে সুবিধার খাতিরেই বলা হয় প্রাণরসায়ন। প্রাণ-রসায়নের মূল উদ্দেশ্য হল সপ্রাণ সংস্থার গড়ন এবং ক্রিয়াকে বোঝা। এই প্রবন্ধের গোড়াতে সে-বিষয়ে আমরা দুয়েকটি কথা বলেছি। এবারে প্রাণের মৌল লক্ষণ-গুলিকে মনে রেখে আর একটু বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে।[১]

একদিক দিয়ে যেমন প্রাণের মৌল উপাদান বলতে দেহকোষের অন্তর্গত বৃহত্তর অণুগুলিকে (ম্যাক্রোমলি-কিউল) বোঝায়, তেমনি এটাও ঠিক যে সপ্রাণ সংস্থা-মাত্রেরই দেহের গড়ন এবং ক্রিয়াকে বুঝতে হলে দেহ-কোষের কথাটা মনে রাখতে হবে। দেহের বস্তুগত সংগঠনের দিক দিয়ে প্রাথমিক একক (ইউনিট) বলতে হয় দেহকোষগুলিকেই। তার কারণ, সবচেয়ে ছোটো যে প্রাণী তারও দেহে অন্তত একটি কোষ থাকে। এই ধরনের প্রাণীকে আমরা বলি এককোষী প্রাণী। এর সবচেয়ে সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হল এশেরিশিয়া কোলাই বা ই কোলাই জীবাণু, যার আক্রমণকে আমরা বলি ই কোলাইয়ের ছোঁয়াচ।

এমনিতে অবশ্য মানুষ এবং অন্য উচ্চতর স্তনাপায়ী প্রাণীর অন্ত্রের মধ্যে এরা স্বচ্ছন্দে বসবাস করে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলে এরা ক্ষতি করে না। এখন, কয়েকটি কারণে প্রাণরসায়নের চর্চায় ই কোলাই জীবাণুকে ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, এককোষী প্রাণীর দেহের গড়ন এবং ক্রিয়া বোঝা অনেকটা সহজ। বহু-কোষী প্রাণীর দেহের জটিল ক্রিয়াকলাপ বোঝবার আগে এই ধরনের সরল প্রাণীর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নিলে সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, ল্যাবরেটরিতে সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সহজেই ই কোলাই জীবাণুর চাষ করা যায়। ৩৭° সেলসিয়াস উষ্ণতায় শুধু খানিকটা গ্লুকোজ এবং কিছু খনিজ লবণের দ্রবণের মধ্যে রাখলেই ই কোলাই জীবাণুরা স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় প্রতি ষাট মিনিটে কোষবিভাজনের মাধ্যমে একটি ই কোলাই জীবাণু থেকে দুটি সন্ততির জন্ম হয়। অর্থাৎ প্রতি ষাট মিনিটে জীবাণুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবারে যদি গ্লুকোজের ওই দ্রবণের সঙ্গে কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আর পিউরিন এবং পাইরি-মিডিন-জাতীয় জৈব ক্ষার মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে বংশবৃদ্ধির হার তিনগুণ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতি কুড়ি মিনিটে কোষবিভাজন ঘটতে থাকে। বোঝা যাচ্ছে, এই শেষোক্ত রাসায়নিক উপাদানগুলি জীবাণুটির বিকাশের সহায়ক। বাইরে থেকে এইসব 'খাদ্য' সরবরাহ করলে কোষের ভিতরে আর তাকে নতুন করে এগুলো তৈরি করে নিতে হয় না। ফলে তার তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয় এবং কোষবিভাজনও দ্রুত হতে থাকে।

এই যে ই কোলাই জীবাণু, এর সবেধন নীলমণি একটিমাত্র কোষের চেহারা কিরকম? ধরুন, প্রশনটা রসা-য়নের দিক থেকেই করা গেল। অর্থাৎ এই একটি কোষে কী কী ধরনের অণু পাওয়া যাবে, সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। কেননা আণবিক মাপকাঠিতে এই ছোট্ট কোষটির আয়তনও খুবই বড়ো। ছোট্ট কোষ বলছি এই কারণে যে উচ্চতর যে-কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহকোষের গড় আয়তনের তুলনায় এর আয়তন পাঁচশ ভাগের একভাগ। তবু এরই ওজন একটি জলের অণুর ওজনের ছ হাজার কোটিগুণ বেশি। আর এর মধ্যে পাওয়া যাবে কয়েক হাজার স্বতন্ত্র ধরনের কারবনঘটিত অণু। অর্থাৎ অণু-গুলির রকমফের গুনলে দেখা যাবে যে রকমের সংখ্যাই কয়েক হাজার। মোট অণুর সংখ্যা অবশ্যই আরো অনেক বেশি। এই বিপুলসংখ্যক অণুর বর্ণনা দেওয়া যায় কিভাবে?

কোষের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের অণুর বিবরণ দেওয়ার একটা সহজ উপায় হচ্ছে তাদের বড়ো-বড়ো কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া। দেখা যায় যে, মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে এদের বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে প্রত্যেকটি শ্রেণীর গড়নের কতকগুলি নিজস্ব

বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ যেসব অণুকে একই শ্রেণীতে ফেলছি, তাদের প্রত্যেকটিতে কিছুসংখ্যক পরমাণু একই-ভাবে সাজানো থাকে। এই চারটি শ্রেণী হল :

(১) কারবোহাইড্রেট অণু, যার মূলে থাকে শর্করা-জাতীয় উপাদান ; (২) লিপিড বা চর্বিজাতীয় অণু ; (৩) প্রোটিন, এবং (৪) নিউক্লিক অ্যাসিড।

এই চার রকমের অণুর গড়ন এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা ধারণা ১নং সারণী থেকে পাওয়া যাবে।

১নং সারণী

সপ্রাণ সংস্থার দেহকোষের অন্তর্গত প্রধান কয়েকটি শ্রেণীর অণু

শ্রেণী	অণুর গড়ন	ক্রিয়াকলাপ
(১) কারবো-হাইড্রেট	কারবন, হাইড্রোজেন এবং অকসিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে তৈরি অণু, যার মধ্যে এই মৌল-গুলির অনুপাত হয় ১:২:১। অর্থাৎ যেন প্রতিটি কারবন পরমাণুর সঙ্গে থাকে একটি করে জলের অণু। এই ধরনের ছোটো শর্করা-জাতীয় অণু জুড়ে-জুড়ে যে বড়ো কারবো-হাইড্রেট অণু তৈরি হয়, তাকে বলে পলি-স্যাকারাইড। যেমন, দুটি গ্লুকোজ অণু মিলে তৈরি হয় মলটোজ। কখনো কখনো শর্করার অণুতে অ্যামিনো গ্রুপ থাকে। যথা, গ্লুকোজামিন।	কোনো-কোনো কারবোহাইড্রেট অণু দেহকোষের দেয়ালের উপাদান হতে পারে। যেমন, সেলুলোজ এবং পেকটিন, এরা কোষের দেয়ালকে মজবুত করে তোলে। এ ছাড়া অন্য কারবোহাইড্রেট গ্লুকোজের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। যেমন, গ্লাই-কোজেন। এদের কাজ হল খাদ্য সরবরাহ করা।
(২) লিপিড	জলে গোলে না এইরকম চর্বিজাতীয় অণু, যা তৈরি হয় কোনো-না-কোনো অ্যালকোহলের সঙ্গে জৈব অ্যাসিডের সম্মিলনের ফলে। আদি লিপিড গড়ে ওঠে গ্লিসেরলের সঙ্গে তিনটি দীর্ঘাকৃতি ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে। একে বলে ট্রাইগ্লিসারিড। গ্লিসেরলের বদলে স্ফিঙ্গোসিনও থাকতে পারে। ফ্যাটি অ্যাসি-ডের লক্ষণ হল অনেকগুলি CH_2 গ্রুপের উপস্থিতি। ফ্যাটি অ্যাসিডের বদলে কোনো অণুও থাকতে পারে। কোনো-কোনো লিপিড অণুতে ফসফরাস থাকে। তাকে বলে ফসফো-লিপিড। সাধারণ উষ্ণতায় যে লিপিড তরল অবস্থায় থাকে, তাকেই আমরা বলি তেল।	লিপিডের প্রধান কাজ খাদ্যসরবরাহ। প্রাণীর ভুক্ত বাড়তি খাদ্য লিপিড কলার আকারে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যে সঞ্চিত থাকে। চামড়ার ঠিক নীচে সঞ্চিত লিপিড দেহকে গরম রাখে আর দেহের কোমল অঙ্গ-গুলিকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। ফসফোলিপিডগুলি দেহের যাবতীয় ঝিল্লির অঙ্গীভূত হয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। ফসফোলিপিডের এই গুণের মূলে আছে জলে গুলে না যাওয়ার ক্ষমতা।
(৩) প্রোটিন	কারবন (C), হাইড্রোজেন (H) অক্সিজেন (O) নাইট্রোজেন (N) এবং কখনো-কখনো গন্ধক (S) পরমাণুবিশিষ্ট বড়ো অণু। এরা গড়ে ওঠে একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের সম্মিলনে। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের	অধিকাংশ প্রোটিনের কাজ হল জৈব অনুঘটক হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। নিয়ন্ত্রণ বলতে ক্রিয়ার হার বাড়ানো বা কমানো বোঝায়। এই ধরনের

শ্রেণী	অণুর গড়ন	ক্রিয়াকলাপ
	অ্যামিনো-গ্রুপ (NH_2) যুক্ত হয় আর একটির আয়নিড কারবক্সিল গ্রুপের COO^- সঙ্গে।[৩] এই ধরনের মেলবন্ধনকে বলা হয় পেপটাইড বন্ধন (পেপটাইড বন্ড)। অ্যামিনো অ্যাসিড সম্বন্ধে পরে বলা হবে।	প্রোটিনকে বলে এনজাইম। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এনজাইমের নিজের শরীরে কোনো বদল হয় না। 'প্রোটিন' কথাটি মূলত গ্রীক। এর অর্থ : আদি বস্তু। প্রাণের উপাদান হিসেবে প্রোটিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু-কিছু প্রোটিন আছে যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপাদান হিসেবে তাদের দার্ঢ্য দেয়। যেমন, কোষের দেয়াল, কোষঝিল্লী, রাইবোজোম, পেশীতন্তু, স্নায়ু ইত্যাদি।
(৪) নিউক্লিক অ্যাসিড	দীর্ঘ রেখাকৃতির অণু, যাতে থাকে ফসফরাস (P), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং নাইট্রোজেন (N) পরমাণু। এগুলি তৈরি হয় পিউরিন বা পাইরিমিডিন জাতীয় জৈব ক্ষার, পাঁচটি কারবন-অণুবিশিষ্ট পেনটোজ শর্করা এবং ফসফেট গ্রুপের সম্মিলনে। এদের বিশদ বর্ণনা পরে দেওয়া হবে।	দেহকোষের মধ্যে দু ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। (ক) ডি-অক্সি-রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি এন এ (DNA) হচ্ছে সমস্ত কোষের অন্তর্গত জীবের প্রাথমিক উপাদান। (২) রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ'র (RNA) কাজ হল প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করা। কিছু-কিছু ভাইরাস আছে, যাদের শরীরে আর এন এই হল জীনের প্রাথমিক উপাদান।

১নং সারণীতে দেহকোষের যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদানের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও কিছু-কিছু ক্ষুদ্রতর অণু কোষের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন, প্রোটিন অণুর খণ্ড অংশ বা অ্যামিনো অ্যাসিড, নিউক্লিক অ্যাসিডের খণ্ড অংশ বা নিউক্লিয়োটাইড, অকসিজেন, কারবন-ডাই-অকসাইড, কিছু-কিছু অজৈব আয়ন বা তড়িৎযুক্ত পরমাণু, প্রচুর পরিমাণে জল, ইত্যাদি। আমরা অবশ্য প্রধান চারটি উপাদানের কথাই বিশেষ করে বলব। আর তার মধ্যেও আবার প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের গুরুত্ব হবে বেশি। কেন, তা ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

এখন, এই যে সব রাসায়নিক উপাদান, এদের গড়নের ব্যাপারটা বুঝতে হলে রসায়ন সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে দুয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

সমস্ত রাসায়নিক পদার্থকে সচরাচর দুভাগে ভাগ করা হয় : মৌল (এলিমেন্ট) আর যৌগ (কমপাউন্ড)। মৌল পদার্থ বলে সেইসব পদার্থকে, কোনো রাসায়নিক পদ্ধতিতেই যাদের একটিকে অন্য কোনোটিতে রূপান্তরিত করা যায় না, কিংবা সরলতর অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থেও পরিণত করা যায় না। প্রত্যেকটি মৌল পদার্থকে বিশিষ্ট অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন, কারবনকে C, অক্সিজেনকে O, সোডিয়মকে Na, হাইড্রোজেনকে H, নাইট্রোজেনকে N, এইভাবে লেখা হয়। আবার একাধিক মৌলের সংযোগে যখন বিশিষ্ট রাসায়নিক-গুণসম্পন্ন পদার্থ গড়ে ওঠে, তখন তাকেই বলা হয় যৌগ। যৌগের রাসায়নিক সংকেত লেখা হয় তার অন্তর্গত মৌলগুলির পরিচায়ক সংকেতগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে। যেমন, মামুলি নুন (কমন সল্ট) বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হবে NaCl। এতে থাকে সোডিয়াম আর ক্লোরিন—এই দুটি মৌল।

যে-কোনো মৌল পদার্থের ক্ষুদ্রতম যে খণ্ড পাওয়া সম্ভব, তাকেই বলা হয় ওই মৌলের পরমাণু (অ্যাটম)। পরমাণুকেও অবশ্য ভাগ করা যায়, কিন্তু ভাগ করার পরে যে টুকরোগুলো পাওয়া যাবে তার মধ্যে মৌলের লক্ষণগুলি থাকবে না। ভাগ করলে দেখা যাবে, পরমাণুর কেন্দ্রে (নিউক্লীয়স) আছে নিউট্রন আর প্রোটন—এই দু-জাতের অপেক্ষাকৃত ভারী কণা। আর কেন্দ্রের বাইরে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রন নামে একধরনের হালকা কণা, যার ওজন প্রোটন বা নিউট্রনের ওজনের প্রায় দু হাজার ভাগের একভাগ। নিউট্রনের শরীরে তড়িৎ থাকে না। প্রোটনের শরীরে থাকে একটা নির্দিষ্টপরিমাণ ধনতড়িৎ, আর ইলেকট্রনের থাকে ঠিক সেই-পরিমাণ ঋণতড়িৎ। সচরাচর পরমাণুর কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন থাকে, কেন্দ্রের বাইরে থাকে সেই-সংখ্যক ইলেকট্রন। ফলে সব মিলিয়ে পরমাণুটি হয় তড়িৎশূন্য বা তড়িতের দিক দিয়ে উদাসীন (নিউট্রাল)। সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন প্রত্যেকটি গ্রহ একেকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা সেইভাবে পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি সুনির্দিষ্ট কতকগুলি কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। যেসব ইলেকট্রন কেন্দ্রের বেশি কাছে ঘোরাফেরা করে, কেন্দ্রের ধনতড়িৎ তাদের বেশি প্রবলভাবে টানে। ফলে তারা বেশি দৃঢ়ভাবে পরমাণুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আর সে-তুলনায় দূরের ইলেকট্রনগুলি অনেকটা আলগাভাবে আটক থাকে। এই পর্যন্ত গ্রহদের সঙ্গে পরমাণুর ইলেকট্রনগুলির চলাফেরার মিল আছে। কিন্তু গ্রহদের কক্ষপথে যেমন একটি করেই গ্রহ থাকতে পারে, পরমাণুর বেলায় সেই নিয়ম খাটে না। পরমাণুর ভিতরকার একেকটি কক্ষপথে একসঙ্গে একাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে। প্রত্যেকটি কক্ষপথে সর্বাধিক কটি ইলেকট্রন থাকতে পারে, তার একটা পরিষ্কার হিসেব আছে। যেমন ধরুন, কেন্দ্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী কক্ষপথে থাকতে পারে সর্বাধিক দুটি ইলেকট্রন, তার পরেরটিতে থাকতে পারে আটটি ইলেকট্রন, তৃতীয়টিতে থাকবে সর্বাধিক আটটি, এইরকম। এখন, সবচেয়ে ছোটো যে পরমাণু সেই হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে যদি ক্রমশ আরো বড়ো পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের বিন্যাস লক্ষ করি, তবে কী দেখব? দেখব যে একটি করে ইলেকট্রন এসে ভিতর দিক থেকে শুরু করে ক্রমশ বাইরের কক্ষপথগুলি দখল করছে। হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে একটিমাত্র ইলেকট্রন, কেন্দ্রের নিকটতম কক্ষে। এবারে আর-একটি ইলেকট্রন যদি যোগ করি (কেন্দ্রেও অবশ্যই প্রোটন যোগ করতে হবে, কিন্তু সে কথা এখন থাক), তবে সেটি ওই নিকটতম কক্ষপথে গিয়ে তাকে ভরতি করে ফেলবে। এইভাবে যে পরমাণু পাব, তার নাম হিলিয়ম। এবার তৃতীয় একটি ইলেকট্রন যোগ করলে ওই এক-নম্বর কক্ষে (অর্থাৎ কেন্দ্রের নিকটতম কক্ষে) আর তার জায়গা হবে না। তাকে যেতে হবে দু-নম্বর কক্ষে (অর্থাৎ ঠিক পরের কক্ষে)। ফলে, যে পরমাণু পাব, তার নাম লিথিয়ম। অবশ্য এর কেন্দ্রে থাকা চাই তিনটি প্রোটন। এইভাবে ইলেকট্রন বসাতে-বসাতে যখন দু-নম্বর কক্ষ পূর্ণ হবে, তখন পরমাণুতে ইলেকট্রনের বিন্যাস হবে এইরকম : এক-নম্বর কক্ষে দুটি ইলেকট্রন, আর দু-নম্বর কক্ষে আটটি। সুতরাং মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে দশ। এটি হবে নিয়নের পরমাণু, যে নিয়ন গ্যাস ফ্লোরেসেন্ট টিউবে ব্যবহার করা হয়। এখন, এই যে হিলিয়ম আর নিয়ন পরমাণু, এদের মধ্যে ইলেকট্রনের কোনো অসম্পূর্ণ কক্ষ নেই। এরা খুব স্থাবর হয়। অর্থাৎ চট করে এরা কোনো রাসায়নিক ক্রিয়ায় যোগ দেয় না। সেই কারণে হিলিয়ম আর নিয়ন গ্যাসকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। আবার যেহেতু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণু বেশ স্থাবর হয়, সেইহেতু এদের কাছাকাছি গড়নের অন্য পরমাণুরা চেষ্টা করে এদের মতন ইলেকট্রন-বিন্যাসে গিয়ে পৌঁছতে। ধরুন, সোডিয়মের একটি পরমাণুর কাছাকাছি রয়েছে ক্লোরিন গ্যাসের একটি পরমাণু। সোডিয়মের ইলেকট্রন-সংখ্যা হল ১১। অর্থাৎ নিয়নের অনুরূপ ১০টি ইলেকট্রনের বিন্যাস সম্পূর্ণ করে নিয়ে তারপর এর বাইরের কক্ষে (অর্থাৎ তৃতীয় কক্ষে) থাকে একটিমাত্র ইলেকট্রন। সদর মহলের এই একটিমাত্র ইলেকট্রনকে আমরা বলি সোডিয়মের সংযোজী ইলেকট্রন (ভ্যালেন্স ইলেকট্রন)। আর, যে কক্ষে সে আছে, সেই তৃতীয় বা সদর কক্ষটিকে বলব সংযোজী কক্ষ। এই সংযোজী ইলেকট্রনটিকে কোনোভাবে ত্যাগ করতে পারলে সোডিয়ম পরমাণুটি অনেকটা স্থাবর হবে। অন্যদিকে, ক্লোরিন পরমাণুটির অবস্থা কী? তার মোট ইলেকট্রন-সংখ্যা হল ১৭। অর্থাৎ তার প্রথম দুটি কক্ষ ১০টি ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ, আর তৃতীয় কক্ষে আছে

৭টি ইলেকট্রন। এই তৃতীয় কক্ষটিই হল ক্লোরিনের সংযোজী কক্ষ এবং এখানে আরো একটি ইলেকট্রনের জায়গা হতে পারে। সুতরাং ক্লোরিন পরমাণুটি সোডিয়ম পরমাণুর কাছাকাছি থাকার ফল কী হবে? না, সোডিয়মের একক সংযোজী ইলেকট্রনটি বেরিয়ে এসে ক্লোরিনের সংযোজী কক্ষটি পূর্ণ করবে। অর্থাৎ সোডিয়ম পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে স্থাবরত্ব পেল। এইভাবে খানিকটা ঋণতড়িৎ বিসর্জন দিয়ে সে হয়ে গেল ধনতড়িৎযুক্ত। আর ক্লোরিন পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন লাভ করে স্থাবর হল, ফলে তার শরীর হল ঋণতড়িৎ-যুক্ত। এই ধরনের তড়িৎযুক্ত পরমাণুকে বলা হয় আয়ন (ion)। ধনতড়িৎযুক্ত আয়নকে বলতে পারি ধনায়ন আর ঋণতড়িৎযুক্ত আয়নকে ঋণায়ন। এইভাবে একটি পরমাণু তার সংযোজী কক্ষ থেকে একটি বা একাধিক ইলেকট্রন অন্য পরমাণুকে দান করে দিলে পরমাণু দুটির মধ্যে যে মেল-বন্ধন তৈরি হয়, তাকে আমরা বলি আয়নিক বন্ধন (আয়নিক বন্ড)। যে-কোনো পরমাণু এইভাবে যতগুলি ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে স্থাবরত্ব পায়, সেই সংখ্যাটিকে বলা হয় তার যোজ্যতা (ভ্যালেন্সি)। সোডিয়ম সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনতড়িৎযুক্ত হয়ে যায়, তাই তার যোজ্যতা হল ধনাত্মক। আর ক্লোরিনের যোজ্যতা হবে ঋণাত্মক। পরিভাষায় আমরা বলি সোডি-য়মের যোজ্যতা +১ এবং ক্লোরিনের যোজ্যতা −১।

পরমাণুর সঙ্গে পরমাণু যোগ করবার আর-একটি পদ্ধতি আছে, যাতে সরাসরি ইলেকট্রন বর্জন এবং গ্রহণ না করে যৌথভাবে ভোগ করা হয়। এই ধরনের রাসায়নিক বন্ধনকে বলা হয় সহযোজী বন্ধন (কোভ্যা-লেন্ট বন্ড)। এক্ষেত্রে পরমাণুগুলির মিলনের ফলে যে অণু তৈরি হয়, তার অবস্থা দাঁড়ায় অনেকটা একান্নবর্তী পরিবারের মতো। যেমন ধরুন, হাইড্রোজেন অণু, যাতে থাকে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু। অণুটিকে সূচিত করা হয় এইভাবে : H_2। এখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর একক সংযোজী ইলেকট্রন দুটি একই সঙ্গে দুটি পর-মাণুতেই যুক্ত থাকে। সহযোজী বন্ধনের দৃষ্টান্ত সব-চেয়ে বেশি মেলে অবশ্য কারবনঘটিত যৌগগুলিতে। কারবনের পরমাণু সহজে স্থাবরত্ব অর্জন করে একক যোজ্যতাবিশিষ্ট চারটি পরমাণুর সঙ্গে অথবা ডবল যোজ্যতাবিশিষ্ট দুটি পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রন যৌথ-ভাবে ভোগ করে। তার কারণ, কারবনের সংযোজী কক্ষে থাকে চারটি ইলেকট্রন। এই চারটি ইলেকট্রনকে পুরো-পুরি বর্জন করে সে অবশ্য হিলিয়ম গ্যাসের স্থাবর চেহারা পেতে পারত। আবার অন্য কোনো পরমাণু থেকে চারটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সংযোজী কক্ষটি পূরণ করতেও পারত। কিন্তু তার চেয়ে সহজ হয় গ্রহণ-বর্জন না করে ইলেকট্রনের অংশীদারি করা। 'সহজ হয়' না বলে বোধহয় বলা উচিত যে সহযোজী বন্ধন অন্য যে-কোনো বন্ধনের তুলনায় বেশি দৃঢ় হয় এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করতে বেশি শক্তি লাগে।

সহযোজী বন্ধন এবং আয়নিক বন্ধন ছাড়া আরেক ধরনের বন্ধন আছে, যাকে বলা হয় ফ্যান ডার হ্বাল্‌স বন্ধন। দুটি পরমাণু যখন পরস্পরের কাছে চলে আসে, তখন তাদের একটির দরুন অন্যটির উপর খানিকটা তড়িতের আবেশ হয়। তার ফলে পরস্পরের উপর যে বল কাজ করে, তাকেই বলা হয় ফ্যান ডার হ্বাল্‌স বল। আবিষ্ট তড়িতের চিহ্ন আবেশসৃষ্টিকারী মূল তড়িতের চিহ্নের বিপরীত হয়, তাই গোড়াতে এই বল হয় আকর্ষণ-ধর্মী। তারপর পরমাণু দুটি পরস্পরের বেশি কাছে চলে এলে একটির ইলেকট্রনসমষ্টি অন্যটির ইলেকট্রন-সমষ্টির গায়ের উপর গিয়ে পড়ে, ফলে সমধর্মী দুটি তড়িৎপুঞ্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ফলে ফ্যান ডার হ্বাল্‌স বলের দরুন দুটি পরমাণু পরস্পরের খুব বেশি কাছাকাছি আসতে পারে না। যতটা কাছাকাছি আসতে পারে, সেই দূরত্বটাকে বলা হয় তাদের ফ্যান ডার হ্বাল্‌স ব্যাসার্ধ। সেই ব্যাসার্ধ মোটামুটিভাবে পরমাণুটির আয়তনের কাছাকাছি। ফ্যান ডার হ্বাল্‌স বন্ধনের ফলে যদি একটি অণু তৈরি হয়, তবে সেটি খুব দৃঢ়বদ্ধ হবে না। তার অন্তর্গত পরমাণুগুলি স্বাভাবিক উষ্ণতার দরুন খানিকটা আন্দোলিত হবেই। সেই আন্দোলনের ধাক্কা সামলে অণুটি কায়ক্লেশে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। দুটি স্বতন্ত্র অণুকে যদি ফ্যান ডার হ্বাল্‌স বন্ধনের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হতে হয়, তবে একটির একাধিক পরমাণুকে অন্যটির একাধিক পর-মাণুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে। খুব কাছাকাছি এসে এটা করার মানে হচ্ছে একটি অণুর পরমাণু-সংস্থানের সঙ্গে অন্যটির পরমাণু-সংস্থান খাপে-খাপে মিলে যাওয়া। এইভাবে মিলে গেলেই একটি অণুর অন্তর্গত একাধিক

পরমাণু অন্যটির একাধিক পরমাণুর যথাসম্ভব কাছা-কাছি আসতে পারবে এবং আকর্ষণ দৃঢ় হবে। সুতরাং একটি অণুর গায়ে কোথাও ফাঁক থাকলে সেই ফাঁকের মধ্যে অন্য অণুটির বেরিয়ে-থাকা একটি অংশ খাঁজে-খাঁজে বসে যাওয়া চাই। কোনো এনজাইম যখন দুটি রাসায়নিক উপাদানের মধ্যেকার ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, তখন দেখা যায় উপাদান দুটির অণু এইভাবেই অল্প-ক্ষণের জন্যে এনজাইম-অণুর গায়ে খাঁজে-খাঁজে বসে যায়। একাধিক রাসায়নিক উপাদানের এই যে পরস্পরের আকার অনুযায়ী মিলে যাওয়া, এটাকে বলা যায় আকার-অনুসারিতা (স্টিরিওস্পেসিফিসিটি)। যেহেতু আকার নির্ভর করে অণুর বিশিষ্ট গড়নের উপর, সেইহেতু এক-একটি এনজাইম কেবল বিশিষ্ট একজোড়া রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গেই এইভাবে খাঁজে-খাঁজে মিলতে পারে। আকারের সামান্য এদিক-ওদিক হলে আর মিল হবে না, এনজাইম অণুটিও অনুঘটকের কাজ করতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোষের অন্তর্গত রাসায়নিক ক্রিয়া-সমূহে ফ্যান ডার হ্বাল্‌স বলের খুব একটা বড়ো ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকাটা হচ্ছে আকার-অনুসারিতাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকটি রাসায়নিক ক্রিয়াকে বিশিষ্ট একটি এনজাইমের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি এনজাইম অণু অনেক অণুর মধ্যে থেকে দুটি বিশিষ্ট অণুকে 'ছুঁয়ে-ছুঁয়ে' আকার অনুযায়ী 'চিনে নিচ্ছে'। সেই চিনে-নেওয়াটা অবশ্যই প্রাণের নানা রাসায়নিক ক্রিয়াকে উদ্দেশ্যময়তার ছক অনুযায়ী চালানোর খাতিরে অপরিহার্য। প্রত্যেক তালার জন্য যেমন একটি স্বতন্ত্র চাবি না থাকলে সংসার চালানো যায় না, তেমনি প্রত্যেক বিশিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়াকে চালানোর জন্যে (অথবা বন্ধ করার জন্যে) একটি বিশিষ্ট এনজাইম থাকা দরকার। সেটা থাকলে তবেই প্রাণের অসংখ্য বিপাকীয় ক্রিয়া ঐক্রতানের মতো চলতে পারে।

আকার-অনুসারিতার মাধ্যমে প্রাণের উদ্দেশ্যময়তা কিভাবে কাজ করে, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অ্যানটিবডি-অ্যানটিজেন জুটির কর্মকাণ্ডে। উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীরে বাইরে থেকে কোনো জীবাণু এসে প্রবেশ করলে তার সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করবার জন্য দেহকোষে অ্যানটিবডি তৈরি হয়। এই জীবাণুর গায়ে এমন কিছু বড় অণু থাকে যাকে বহিরা-গত বলে চেনা যায়। যেমন ধরুন, কোনো প্রোটিন বা পলিস্যাকারাইড বা নিউক্লিক অ্যাসিড, যা প্রাণীর শরীরে অনুপস্থিত। এগুলিকে বলা হয় অ্যানটিজেন। এর প্রত্যুত্তরে দেহকোষের ভিতরে বিশেষ একধরনের প্রোটিন অণু তৈরি হয়, যা ওই অ্যানটিজেনের সঙ্গে খাঁজে-খাঁজে বসে গিয়ে বৃহত্তর একটি মিশ্রসংস্থা তৈরি করে। এই প্রোটিনগুলিই হল অ্যানটিবডি। এবারে ওই মিশ্র-সংস্থাটির মোকাবিলা করা হয় রক্তের শ্বেতকণিকাদের সাহায্যে। শ্বেতকণিকারা মিশ্রসংস্থাগুলিকে হজম করে সাফ করে দেয়। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফাজোসাইটোসিস। এইভাবে রোগপ্রতিরোধের নিজস্ব ব্যবস্থা শরীর করে নেয় বাইরে-থেকে-আসা যে-কোনো উপাদানের বিশিষ্ট গড়ন অনুসারেই। এমন নয় যে শরীর আগে থেকে বুঝতে পারে যে আগন্তুক জীবাণু রোগ সৃষ্টি করবে। আগন্তুকের দেহের বাইরের দিকে কোনো-কোনো অংশের গড়নই তাকে বহিরাগত বলে চিনিয়ে দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ তার উচ্ছেদের আয়োজন শুরু হয়ে যায়।

সপ্রাণ সংস্থার শরীরে সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক রাসা-য়নিক উপাদান কিন্তু গড়ে ওঠে সহযোজী বন্ধনের মাধ্যমে। তার একটা কারণ এই যে প্রাণের রাসায়নিক উপাদানগুলিতে কারবনঘটিত যৌগের প্রাধান্য দেখা যায়। আর একথা তো বলেইছি যে কারবন পরমাণু অপেক্ষা-কৃত সহজে সহযোজী বন্ধন গড়ে নেয়। এই ধরনের বন্ধন বেশি দৃঢ় হয় এবং এর দরুন যৌগগুলি আয়তনেও ছোটো হয়। বলা বাহুল্য, সপ্রাণ সংস্থার শরীরের গড়ন যদি বজায় রাখতে হয়, তবে অণুর সঙ্গে অণু এমনভাবে জুড়তে হবে যাতে তাদের বন্ধন দৃঢ় হয়। কারবনঘটিত অণুর সহযোজী বন্ধনই এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপ-যুক্ত। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রকৃতি প্রাণরচনার জন্যে সেই পথই বেছে নিয়েছে। শারীরবৃত্তের স্বাভাবিক উষ্ণতায় (মানুষের ক্ষেত্রে যার মান ৯৮·৬° ফারেনহাইট) সহযোজী বন্ধন কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। তা ছাড়া একই পরমাণু যখন দুটি সহযোজী বন্ধনে অংশ নেয়, তখন তাদের মধ্যেকার কোণ মোটামুটি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। যেমন ধরুন, একটি কারবন পরমাণু চারটি

হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সহযোজী বন্ধনে যুক্ত হয়ে তৈরি করে মিথেন গ্যাসের অণু। মিথেনের রাসায়নিক সংকেত হল CH_4। জলা জায়গায় অন্ধকারে যে আলেয়া দেখা যায় তা আসলে এই মিথেন গ্যাসের জ্বলনের ফল। এখন, কারবন পরমাণুর সাপেক্ষে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অবস্থান যদি এঁকে দেখাতে চাই তবে ছবিটা হবে এইরকম :

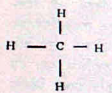

লক্ষ করে দেখুন, কারবন পরমাণুর সঙ্গে প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর বন্ধনকে বোঝাবার জন্যে একটি করে যোজক সরলরেখা আঁকা হয়েছে। এই রেখাগুলিকে আমরা বলব বন্ধনরেখা। তা ছাড়া দেখুন এখানে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু কারবন পরমাণুটিকে ঘিরে সুষমভাবে সাজানো আছে। সেটাই স্বাভাবিক, কেননা চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে কোনো তারতম্য ঘটবার কারণ নেই। তবু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এই ছবিও ঠিক নয়। কারণ মিথেনের পাঁচটি পরমাণুকেই যে একই তলে (এক্ষেত্রে কাগজের গায়ে) থাকতে হবে, এমন কথা নেই। কার্যত হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি একটি পিরামিডের চারটি শীর্ষবিন্দুতে থাকে আর কারবন পরমাণুটি থাকে সেই পিরামিডের কেন্দ্রে। আর কারবনের সঙ্গে পাশাপাশি যে-কোনো দুটি হাইড্রোজেনের যোজকরেখা দুটির মধ্যবর্তী কোণ হয় ১০৯° ডিগ্রী।

মিথেনগ্যাসে এক-একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে কারবন যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র সহযোজী বন্ধন রচনা করে, সর্বত্র অবশ্য তেমন করে না। যেমন, কারবন-ডাই-অকসাইডে (CO_2) থাকে দুটি মাত্র অকসিজেন পরমাণু, যার প্রত্যেকটির সঙ্গে কারবন পরমাণুটি একটি ডবল বন্ধন বা দু-ফেরতা বন্ধন রচনা করে। সেটা দেখানো যায় এইভাবে : O=C=O।

একক সহযোজী বন্ধনের গুণ হচ্ছে এই যে বন্ধনরেখার সাপেক্ষে অণুটি ঘুরতে পারে। অর্থাৎ সেইভাবে ঘোরালে অণুর কোনো বদল হয় না, রাসায়নিক ধর্ম তো বদলায়ই না। অপরপক্ষে ডবল বন্ধন বা ত্রয়ী বন্ধনের ক্ষেত্রে এ-রকম ঘোরা চলে না। ফলে ডবল-বন্ধনবিশিষ্ট অণুর ত্রিমাত্রিক চেহারা কেমন হবে, তার উপরে কিছু-কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়ে যায়। এর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রোটিন অণুর অন্তর্গত পলিপেপটাইড বিন্যাসে। এক-একটি প্রোটিন অণু তৈরি হয় অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সম্মিলনে। ১নং সারণীতে আমরা বলেছি, একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো গ্রুপ (NH_2) যুক্ত হয় আর-একটির আয়নিত কারবকসিল গ্রুপের (COO^-) সঙ্গে।° একেই বলে পেপটাইড বন্ধন। বন্ধনের ফলে অ্যামিনো গ্রুপের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু (H) গিয়ে মিলিত হয় কারবকসিল গ্রুপটির অন্তর্গত হাইড্রকসিল গ্রুপ (OH)-এর সঙ্গে। পরিণামে একটি জলের অণু (H_2O) বেরিয়ে আসে এবং বাকি থাকে পেপটাইড বন্ধনে মিলিত দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড। যেমন ধরুন, গ্লাইসিন এবং অ্যালানিন—এই দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মিলনে তৈরি হয় গ্লাইসিল্যালানিন এবং জল। এই গ্লাইসিল্যালানিন অণুটিকেই আমরা বলতে পারি মিলনের ফলে জাত পলিপেপটাইড।

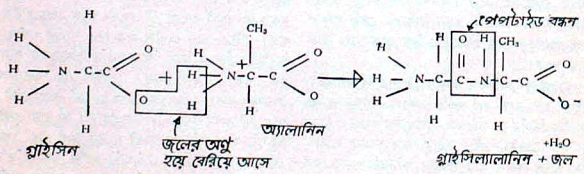

৩৬০ পাতায় গ্লাইসিল্যালানিনের পেপটাইড বন্ধনের উৎপত্তি বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। বাঁদিকে দেখছি, একটি গ্লাইসিন অণু মিলছে একটি অ্যালানিন অণুর সঙ্গে। মিলনের ফলে জলের একটি অণু বেরিয়ে আসছে এবং পেপটাইড বন্ধনে আবদ্ধ গ্লাইসিল্যালানিন অণু তৈরি হচ্ছে। দুটি অণুর মিলনস্থলে যে ছায়াকীর্ণ অঞ্চল আঁকা হয়েছে, সেটাই পেপটাইড বন্ধনের এলাকা। দুপাশের দুটি কারবন পরমাণুকে নিয়ে তার চেহারা দাঁড়াবে এই ছবি :

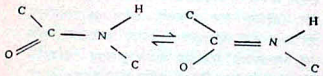

এখানে দেখুন, পেপটাইড বন্ধনের অন্তর্গত কারবন আর নাইট্রোজেন—এই দুটি প্রতিবেশী পরমাণুকে ছবির দু জায়গায় দুভাবে যুক্ত করা হয়েছে। বাঁদিকে তাদের মধ্যে রয়েছে একক বন্ধন আর ডানদিকে রয়েছে ডবল বন্ধন। তার মানে হল, কিছুটা সমগ্র কারবন পরমাণুটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটিমাত্র ইলেকট্রন যৌথভাবে ভোগ করবে, আর বাকিটা সময় যৌথভাবে ভোগ করবে দুটি ইলেকট্রন। এই দুটি সম্ভাব্য অবস্থাকে দুমুখী তীর দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখন, খানিকটা সময় পেপটাইড বন্ধনটি ডবল বন্ধন হিসেবে থাকে বলে বন্ধনরেখার সাপেক্ষে অণুটির আবর্তন চলবে না। ফলে, পেপটাইড বন্ধনের সবকটি অণুকে একই তলে থাকতে হয়। অর্থাৎ উপরে পেপটাইড বন্ধনের যে চেহারা আঁকা হয়েছে, সেটি সর্বদা সমতলে থাকবে। বাকি দুটি বন্ধনের, অর্থাৎ C—C এবং N—C বন্ধনের, সাপেক্ষে কিন্তু আবর্তন সম্ভবপর। অতএব প্রোটিন অণুর গড়ন এমন হতে হবে যাতে প্রত্যেকটি পেপটাইড বন্ধন এক-একটি সমতলে থাকে।

এই যে পেপটাইড বন্ধন, এর থেকে গোটা একটি প্রোটিন অণু কিভাবে গড়ে ওঠে? গ্লাইসিল্যালানিনের পেপটাইড বন্ধন তৈরির ছবিটি ভালো করে দেখুন। গ্লাইসিন আর অ্যালানিন—এই দুটি অ্যামিনো-অ্যাসিডের অণুতেই দেখবেন পরমাণুর বিন্যাস একই রকমের। কেবল গ্লাইসিনে যেখানে মধ্যবর্তী কারবন পরমাণুর সঙ্গে উপর দিকে যুক্ত আছে হাইড্রোজেন পরমাণু, সেখানে অ্যালানিনে রয়েছে মিথাইল গ্রুপ (CH_3)। সাধারণভাবে এটাই অ্যামিনো অ্যাসিডের ধর্ম। ওই একটি পার্শ্ববর্তী গ্রুপই বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকমের হবে, তা ছাড়া বাকি পরমাণুগুলির সংস্থান হবে একই রকম। স্বতন্ত্র পার্শ্ববর্তী গ্রুপের মোট সংখ্যা যা পাওয়া যায় তা হল কুড়ি। ফলে কুড়িটি স্বতন্ত্র অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এদেরই বিভিন্ন সংযুক্তিতে পরপর পেপটাইড বন্ধনে জুড়ে-জুড়ে আলাদা-আলাদা প্রোটিন গড়ে ওঠে। অনেকগুলি অণু জুড়ে গড়ে-ওঠা এইরকম বৃহৎ অণুকে অনেক সময় পলিমার বলা হয়। বলা বাহুল্য, কুড়িটি স্বতন্ত্র অ্যামিনো-অ্যাসিড পরপর নানাভাবে সাজিয়ে বিপুলসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রোটিন অণু গড়া যেতে পারে। কার্যত অবশ্য সংখ্যাটা তত বড়ো নয়। ল্যাবরেটরিতে কয়েক শ স্বতন্ত্র প্রোটিন শুদ্ধ আকারে পাওয়া গেছে। যে-কোনো একটি প্রজাতির শরীরে বেশ কয়েক হাজার স্বতন্ত্র প্রোটিন থাকতে পারে। দুটি স্বতন্ত্র প্রজাতির মধ্যে আবার একই ধরনের দুটি প্রোটিনের গড়নের কিছু-কিছু পার্থক্য থাকে। ফলে, এটা অনুমান করা যায় যে, প্রাণিলোকে স্বতন্ত্র প্রোটিনের সংখ্যা বহু লক্ষ হবে।

যাই হোক, প্রোটিন অণুর অন্তর্গত এই যে সিঁড়ির মতো করে সাজানো পেপটাইডের শ্রেণী, এদের ত্রিমাত্রিক সংস্থানকে ধরে রাখার জন্যে পেপটাইড বন্ধন ছাড়াও আরো কিছু দ্বিতীয় স্তরের বন্ধন প্রয়োজন হয়। ধরে রাখাটা দরকার প্রোটিন অণুর আকার বজায় রাখার জন্যে, কেননা সেই আকার এনজাইম হিসেবে তার ক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য। প্রোটিনটি যদি এনজাইম নাও হয়, তবু তার আকার বজায় থাকা প্রয়োজন কোষকলার স্থাপত্যকে বাঁচিয়ে রাখার খাতিরে। এখন, পলিমারের অন্তর্গত একেকটি অ্যামিনো-অ্যাসিডকে বলতে পারি তার মোনোমার। মোনোমারগুলি হল সিঁড়ির একেকটি ধাপের মতো। সিঁড়িটিকে যদি মজবুত করতে হয়, তবে ধাপগুলিকে তার মধ্যে কিভাবে সাজাব? এটা দেখা গেছে যে প্রত্যেকটি ধাপ সিঁড়ির শির-দাঁড়ার সঙ্গে একই কোণে থাকা দরকার। সিঁড়িটি টানা ঋজু হলে তো এই কোণ হবে সমকোণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি ঘোরানো সিঁড়ি হয়? সেক্ষেত্রেও দেখা যায়, ধাপগুলোকে ঘোরানো

সিঁড়ির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে যদি একই কোণে রাখি, গড়নটা মজবুত হয়। পলিমার অণুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমগ্র অণুর সাপেক্ষে মোনোমারগুলিকে যদি একই সংস্থানে রাখি, তবে প্রতিটি মোনোমার ঠিক সমানসংখ্যক এবং একই ধরনের দ্বিতীয় স্তরের বন্ধন গড়ে নেয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে মোনোমারগুলিকে সাজালে যে সংস্থান পাওয়া যায়, তা যথার্থই অনেকতলা বাড়িতে বাইরের দিকের ঘোরানো সিঁড়ির মতো হয়। পরিভাষায় এই ধরনের জ্যামিতিক গড়নকে বলা হয় কুণ্ডলী (হেলিক্স)। সুষম রৈখিক আকারে সাজানো পলিমারের স্বাভাবিক গড়ন যে কুণ্ডলীই হবে, এটা এখন সুবিদিত। অর্থাৎ মোনোমারগুলির নিজস্ব বিশিষ্ট আকার যাই হোক না কেন, সমগ্র অণুতে তাদের পারস্পরিক সংস্থানকে যথাসম্ভব দৃঢ় করে তোলার তাগিদেই অণুটি কুণ্ডলীর আকার পরিগ্রহ করে। প্রোটিন অণুকে অবশ্য মোটেই সুষম বলা যায় না, কেননা তার কুণ্ডলী গড়ে ওঠে কুড়িটি স্বতন্ত্র অ্যামিনো-অ্যাসিডের বিচিত্র বিন্যাসে। তবু স্থাপত্যের দৃঢ়তার যেসব যুক্তি এইমাত্র দেওয়া হল, সেগুলি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রোটিন ছাড়া অন্য যেসব অণু কুণ্ডলীর আকার নেয়, তার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১নং সারণীতে আমরা বলেছি, পিউরিন অথবা পাইরিমিডিন জাতীয় জৈব ক্ষার, পেনটোজ-জাতীয় শর্করা এবং ফসফেট গ্রুপের সম্মিলনে এদের রেখাকৃতি অণুগুলি তৈরি হয়। ডি এন এ এবং আর এন এ-র মধ্যে গড়নের কিছু পার্থক্য থাকলেও দুটিকেই কোষকেন্দ্রে পাওয়া যায়, তাই এদের নাম নিউক্লিক অ্যাসিড। আয়তনে এরা প্রোটিন অণুর চেয়ে বড়োই হয়। ১৯৪৪ সালে মারকিন জীবাণুবিদ অ্যাভারী দেখালেন, নিউমোনিয়ার জীবাণুর শরীরে সন্তর্পণে বড়ো আয়তনের ডি এন এ অণু যোগ করলে তার বংশগতির গুণাবলী বদলে দেওয়া যায়। অর্থাৎ ডি এন এ অণুর মধ্যেই বংশগতির উপাদান থাকে। এই বংশগতির মূল কথাটা হল দেহকোষের মধ্যে যেসব প্রোটিন তৈরি হবে, তাদের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পর্যায়ক্রমে কিভাবে সাজানো থাকবে সেটা বলে দেওয়া। এর আগেই আমরা দেখেছি, প্রাণের উদ্দেশ্যময়তা বিশদভাবে কাজ করে প্রোটিনসমূহের মাধ্যমেই। দেহকোষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এবং স্থাপত্য প্রোটিনগুলির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব বংশগতি বলতে যে শরীরের যাবতীয় প্রোটিন তৈরি করার কর্মসূচীকেই বোঝাবে, এটা মোটেই আশ্চর্য নয়। এখন, প্রোটিন তৈরির নির্দেশগুলি বাস্তবিক কিভাবে দেওয়া থাকে? এ-পর্যন্ত যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তাতে এই ধরনের নির্দেশ রসায়নের ভাষাতেই দেওয়ার কথা মনে হবে। যে রাসায়নিক সংকেত এজন্যে প্রকৃতি ব্যবহার করেন, তাকে আমরা বলি জনন-সংকেত (জেনেটিক কোড)। অন্য একটি প্রবন্ধে আমরা সে-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখলেই চলবে যে নির্মিতব্য প্রোটিনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের পর্যায়ক্রম নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণকারী নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে নিউক্লিয়োটাইডের পর্যায়ক্রমের উপর। অর্থাৎ জনন-সংকেত বলতে আমরা বুঝি নিউক্লিক অ্যাসিড অণুর মধ্যে নিউক্লিয়োটাইডগুলির বিন্যাসকে। এই বিন্যাসই বলে দেবে নির্মিতব্য প্রোটিনের মধ্যে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড কিভাবে সাজানো থাকবে। এই নিউক্লিয়োটাইডগুলি কী জিনিস? না, এগুলি হল নিউক্লিক অ্যাসিড-নামক পলিমারজাতীয় অণুর অন্তর্গত মোনোমার। চার রকমের নিউক্লিয়োটাইড থাকে এক-একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে। ডি এন এ-র অন্তর্গত নিউক্লিয়োটাইডগুলি হল: (১) ডিঅক্সিঅ্যাডেনোসিন (পেন্টোজ) ফসফেট; (২) ডিঅক্সিথাইমিডিন (পেন্টোজ) ফসফেট; (৩) ডিঅক্সিগুয়ানোসিন (পেন্টোজ) ফসফেট; (৪) ডিঅক্সিসাইটিডিন (পেন্টোজ) ফসফেট।

লক্ষ করে দেখুন, এর প্রত্যেকটিতে পেন্টোজ-নামক শর্করা এবং ফসফেট গ্রুপের সঙ্গে একটি করে ক্ষারক (বেস) আছে। সেই ক্ষারকগুলি হল: (ক) অ্যাডেনিন, (খ) থাইমিন, (গ) গুয়ানিন, এবং (ঘ) সাইটোসিন। এর মধ্যে (ক) এবং (গ)-এর গড়ন অনেকটা একরকমের। তাদের একযোগে বলা হয় পিউরিন। আর (খ) এবং (ঘ)-এর গড়নে অনেকটা মিল আছে। এদের একত্র করে বলা হয় পাইরিমিডিন। পিউরিনগুলির গড়ন এমন যে তারা পাইরিমিডিনগুলির যে-কোনো একটির সঙ্গে খাঁজে-খাঁজে বসে যাবে। এইভাবে খাঁজে-খাঁজে বসেই ডি এন এ-র কুণ্ডলীর এক-একটি ধাপ তৈরি হয়। একটি নিয়োক্লিয়োটাইডের সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী নিউক্লিয়োটাইডের বন্ধন রচিত হয় ফসফেট গ্রুপ এবং শর্করাটির অন্তর্গত হাইড্রকসিল গ্রুপের মাধ্যমে। ডি এন এ-র কুণ্ডলীতে পরপর তিনটি ধাপে নিউক্লিয়োটাইডের যে বিন্যাস তৈরি হল, তার মধ্যে থাকে একটি অ্যামিনো-অ্যাসিড তৈরির উপযোগী তথ্য। এইভাবে পরপর একে-একে অ্যামিনো-অ্যাসিড তৈরির নির্দেশ সাজানো থাকে ডি এন এ-র অণুতে। পরের প্রবন্ধে এ নিয়ে আমরা আরো বলব, সুতরাং আপাতত এখানেই থামছি।

আর এন এ অণুর মধ্যে থাইমিনের বদলে থাকে ইউরাসিল নামে ক্ষারক। আর পেন্টোজ শর্করাতে একটি বাড়তি হাইড্রকসিল গ্রুপ (OH) থাকে। তাই এই ধরনের শর্করাকে ডিঅক্সিরাইবোজ না বলে বলা হয় শুধু রাইবোজ। এটা মোটামুটি সুবিদিত যে ডি এন এ-র অন্তর্গত তথ্যের সাহায্যে প্রোটিন তৈরির সময় আর এন এ অণু দূতের কাজ করে। শুধু তাই নয়, ডি এন এ-র অন্তর্গত তথ্য যাতে সঠিকভাবে আর এন এ-র অণুতে সঞ্চারিত হয়, তার ব্যবস্থাটা খুব সহজ এবং প্রত্যক্ষ: আর এন এ-র অণুটি তৈরিই হয় ডি এন এ অণুটিকে ছাঁচ হিসেবে কাজে লাগিয়ে। এই ছাঁচের সূত্রটি আবার আকার-অনুসারিতার ব্যাপার। ডি এন এ পলিমারের প্রতিটি ধাপে যে নিউক্লিয়োটাইড আছে, তার সঙ্গে খাঁজে-খাঁজে মিলে যায় এমন রাইবোনিউক্লিয়োটাইডই তার পাশাপাশি তৈরি হবে। অর্থাৎ ডি এন এ-র একটি ধাপে যদি থাকে অ্যাডেনিন, তবে তার পাশে আর এন এ-র উপাদান হিসেবে পাব ইউরাসিল (এক মিথাইল গ্রুপের অভাব ছাড়া এটি থাইমিনের সঙ্গেই তুলনীয়)। আর ডি এন এ-র ধাপে যদি থাকে গুয়ানিন, তবে তার পাশে গড়ে উঠবে সাইটোসিন। অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিয়োটাইডগুলির দিকে তাকালে বলতে পারি, অ্যাডেনিনের পরিপূরক হল ইউরাসিল, আর গুয়ানিনের পরিপূরক সাইটোসিন। এই পরিপূরক উপাদান দিয়ে তৈরি আর এন এ অণুটি ডি এন এ অণুর তথ্য অবিকৃতভাবে বহন করবে। এবারে এই আর এন এ পলিমারই হবে প্রোটিন তৈরির প্রত্যক্ষ ছাঁচ। যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিন পলিমারটি নির্মিত হবে, প্রথমে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে সহযোজী বন্ধনের মাধ্যমে একটি করে উপযোগী (অ্যাডাপটর) অণু যুক্ত হয়ে যায়। এই উপযোগী অণুগুলি রাইবোনিউক্লিয়োটাইড মোনোমারের পার্শ্ববর্তী গ্রুপগুলির সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডের খাঁজে-খাঁজে বসে যাওয়ার কাজটা অনেক বেশি সহজ করে তোলে। এইভাবে খাঁজে-খাঁজে বসিয়ে পরপর অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি সাজানো চলতে থাকে। এখন, যাকে আমরা বলছি উপযোগী অণু, সেগুলোও কিন্তু আসলে ছোটো আয়তনের আর এন এ অণু। পরিভাষায় এদের বলা হয় বদলি আর এন এ (transfer RNA বা সংক্ষেপে tRNA)।

ডি এন এ-র ছাঁচ থেকে আর এন এ অণু তৈরি হয় কোষকেন্দ্রেই, কেননা ডি এন এ থাকে কোষকেন্দ্রে। কিন্তু তৈরি হবার পর আর এন এ অণুগুলির অধিকাংশ চলে যায় কেন্দ্রের বাইরে সাইটোপ্লাজমে। সেখানে রাইবোজোন-নামক গোলাকার ছোটো-ছোটো কণাতে তারা জমা থাকে। প্রোটিন অণুগুলি তৈরি হয় এই রাইবোজোনে।

এ ছাড়া অন্য যে দু ধরনের অণুর কথা ১নং সারণীতে বলা হয়েছে, সেই লিপিড এবং কারবোহাইড্রেটের প্রধান কাজ হল দেহকোষের যাবতীয় ক্রিয়ার জন্যে শক্তি জোগানো। শক্তি জোগানোর সঙ্গে জড়িত বিপাকীয় ক্রিয়াগুলিও যথেষ্ট জটিল। এইসব ক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি ধাপেই কোনো-না-কোনো বিশিষ্ট এনজাইম কাজে লাগে। এখানেও দেখতে পাই প্রাণের উদ্দেশ্যময়তার সাধনে প্রোটিনের ভূমিকা। এই বিপাকীয় ক্রিয়াগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। আপাতত পুঁথি না বাড়িয়ে প্রাণরসায়নের এই সামান্য ভূমিকা আমরা এখানেই শেষ করছি।

উল্লেখপঞ্জী

[১] জাক মোনো, 'Chance and Necessity (Collins Fontana, 1972)

[২] প্রাণরসায়নের বিষয়ে ভালো বইয়ের কোনো অভাব নেই। তবে অনেকটা সহজ করে বোঝানো আছে এমন একটি বই হল স্টীভেন রোজের 'The Chemistry of Life' (Pelican, 2nd ed., 1979)। আর জেমস ডি ওয়াটসনের 'Molecular Biology of the Gene' (Benjamin, New York 1970) তো একটি ধ্রুপদী এবং অত্যন্ত সুপাঠ্য বই। এটি অবশ্য অনেক বেশি বিশদ এবং খানিকটা প্রাক্‌শিক্ষণের দাবি রাখে।

[৩] কার্বক্সিল গ্রুপ বলতে বোঝায় COOH এই পরমাণুগোষ্ঠী। এটি হল জৈব অ্যাসিডের, অতএব প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডের, সহজাত অঙ্গ। জলীয় পদার্থে যখন অ্যাসিডটি দ্রবণের আকারে থাকে, তখন আয়নিত হয়। সেই আয়নের মধ্যে COOH এর চেহারা হয় COO^- অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুটি বর্জন করে সে ঋণতড়িৎযুক্ত হয়ে যায়। বস্তুত এই ঋণতড়িৎ হল অ্যাসিডের বিশিষ্ট ধর্ম।

[৪] যে-কোনো রচনার ক্ষেত্রেই যা হয়, এখানেও সেইভাবে একাধিক বন্ধু বা স্বজনের সঙ্গে আলাপ বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। এঁদের মধ্যে শ্রীমান ব্রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যায়।

মার্বেল-সিঁড়ির ছায়া

বিরাম মুখোপাধ্যায়

বারুণীপুকুর নয়, টাকির দিঘির পম্পাড়ে
মার্বেল-সিঁড়ির সেইসব ছায়া—ডুবন্ত আলোয়
ইচ্ছার ছায়ারা নড়েচড়ে মনে পড়ে কি মনদি'?
সবেদাগাছের নিচে সন্ধ্যার শুকর পূর্ণিমার
আলো খোঁজে শোঁকে, আলোর আঁচলে নাক ঘ'ষে ঘ'ষে
কোনো বাঁধাধরা আস্তানার দিকে নিঃশব্দে এগোয়,—
স্বপ্নেরা কী ক্ষীণায়ু শহুরে-জীবনের ক্রীতদাস
যান্ত্রিকতা, বিদঘুটে দাবি হুকুম তামিল করে।

তারপর হারানো ও নিরুদ্দেশ-খবরের শিরে
মার্বেল-সিঁড়িতে-বসা তোমার ফটোটা দেখলাম
ময়মনসিঙে ব'সে অরুন্তুদ হতবাক ভাবি :
মনদি' তুমি কি সেই টাকির দিঘিতে ডুব দিলে!
নাকি হাসপাতালের বেড থেকে উন্মাদ উধাও
কলকাতা-শহরের গলি-ঘুঁজি পিছল পাতালে
ছিন্‌তাই হয়ে গিয়ে অহোরাত্র সন্ত্রাসের ফাঁদে
মৌন জীবনযাপন জীবনের আনাচে-কানাচে॥

শেষপাতা

মতি মুখোপাধ্যায়

কী হবে ও বই নিয়ে, শেষপাতা কবে ঝরে গেছে
দরোজা কপাট সব পড়ো-পড়ো, এমনি মলাট
সাপলুডো গ্রাম-পথ, স্মৃতির রাখাল ফেরে ঘরে
গাভীর গম্ভীর ডাকে সন্ধ্যা ক্রমে ভারী হয়ে নামে।

অপঠিত বইটির শেষপাতা ছিল একদিন
কলার ঝাড়ের মতো বাড়ন্ত জীবন সেই দিকে
বিয়োনোর ঢের পরে একদিন শান্ত উপহার
কেউ বলে মহামুক্তি, কারো কাছে অন্ধ যবনিকা।

তবু যেন ইচ্ছে হয় ক্রমে ওই পাতাটিতে যেতে
কোন সুর বেজেছিল, কার বুকে ইমন বেহাগ
উত্তুরে শীত-হাওয়া নাকি তপ্ত ফাগুন-দুপুর
বিদায়মুহূর্তে কার চুম্বনের ইচ্ছা জেগেছিল।

বিরহ

কান্তিময় ভট্টাচার্য

ছুঁয়েছে উত্তপ্ত জ্বর কপালের রগদুটো ফুলো
চুল-ছেঁড়া রাগ এসে চিবিয়ে খাচ্ছে নখ থেকে চুলও
এমন পীড়িত সুখ তোকে আমি কী দেব অতীত
বিস্মৃতির চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে সমূহ পিরীত

চিরুনি-দাঁতের মতো সর্বাঙ্গে কেটে দিচ্ছে যন্ত্রণার বিলি
বেহুঁশ জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন লুঠ করে তুই কোথায় পালালি
একবার ফিরে আয় ছিঁড়ে খা ভালোবাসা-নখে

রক্তাপ্লুত বিনিময়ে মাখিয়ে দেব সুর্মা-প্রেম চোখে

দুটি কবিতা

কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার

সংশয়

কারো-কারো বাঁচার আকুতি
বড়ো প্রবল
কেউ-কেউ আত্মহত্যাপ্রবণ
কেউ-বা হত্যাকারী যুদ্ধবাজ

এইসব সংশয় দর্শন
বুঝে না তো সুচেতন মন

হৃদয় অবুঝ খুব
ডুবে যায় চেতনার জলে
আলো-অন্ধকারে তীব্র দ্বন্দ্ব চলে
চিরকাল অবচেতনের ফলমূলে
বন্দী রই
আমি ক্ষুদ্র ধূলিকণা অন্য কিছু নই।

শুক্রকীটে থেকেছি যখন
তখনো
ছিলাম এক নর্দমায়
হয়তো-বা স্বচ্ছ নদীজলে
আমি তো স্থবির যেন পড়ে আছি
জন্মমৃত্যুর অতলে।

বোধ

পৌরাণিক স্বপ্ন দেখি ভোররাতে
ঘুম ভাঙে
নিশিপাওয়া মানুষের মতো
নিদ্রায় জাগরণে
মগ্ন হই অন্তর্লীন আরেক আযানে।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

বাদল চলে যায়। মালেকের কষ্ট হয়। আমবাগানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ও পুরো দৃশ্য দেখতে পায়। সুজা মানিককে হত্যা করেছে পয়সার জন্যে, বাদল তোরাব আলীকে বলে দিয়েছে পয়সার জন্যে। তবে বাদল তোরাব আলীর ফাঁদে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সুজার উদ্ভাবন একদম নিজস্ব। সুজা কেমন করে এত শক্ত হয়ে গেল, এত ঋজু এবং অকুতোভয়? প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে মালেক সুজার বাড়িতে আসে। সাগর থেকে ফেরার পর সুজার সঙ্গে দেখা হয় নি। মার কথাও সুজা তেমন মনে করে না, ও ভীষণভাবে নিজের পরিবারের মধ্যে গুটিয়ে গেছে। সুজা চৌকিতে গোল হয়ে বসে ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। দৃশ্যটা মালেকের কাছে নতুন। ও বেশিরভাগ সময় শুয়ে থাকতেই পছন্দ করে। এখন কি সুজার জীবনযাপন বদলে যাচ্ছে? রান্নাঘর থেকে ইলিশভাজার গন্ধ ভেসে আসে। মালেককে দেখে ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে ওঠে।

—কাকু?

—কী রে, ক্যান আছস তোরা? আজই ফিরিলা বড়োভাই?

—হ আজই।

—শরীল ভালা তো?

—ভালা।

—মানিকর খবর হুনলাম!

সুজা মাথা নাড়ে, যেন গভীর দুঃখে অভিভূত।—কী কইরগাম ক?

মালেক একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে মুখ ভাবলেশহীন এবং নির্বিকার।

—পোয়াডা বাড়ছিল বেশি!

মালেক সুজাকে বুঝতে পারে না। যখন মনে হয় দুঃখে অভিভূত, তখন চেহারা কী ভীষণ কাতর দেখায়; যখন নির্বিকার হয়ে যায় তখন রুক্ষ এবং মেজাজি। রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে-মুছতে কাঞ্চন আসে। সুজা সাগর থেকে ফিরলে কাঞ্চন ভীষণ হাসিখুশি থাকে। আজ কি একটু অন্যরকম? না, বোঝা যায় না।

—মালেক ভাই, আপনারে দুইখান ভাজা মাছ দি?

—দ্যান।

—মুড়িও দিও।

সুজা পা গুটিয়ে বসে। কাঞ্চন চলে যায়। রোগা

ছিপছিপে শরীরে কোথাও মেদ নেই। দশটা ছেলেমেয়ের মা হলে কী হবে, শরীর এখনো শক্ত সমর্থ। কাজে ক্লান্তি নেই। দু ভাইয়ের মধ্যে বেশি কথা হয় না। সুজা সব সময় স্বল্পভাষী, মালেকও তেমন আসর জমিয়ে কথা বলতে পারে না। দুজনে মিলিত হলে বেশিরভাগ সময় নীরবেই কাটে।

—মাছ ক্যান ধরিলা বড়োভাই?

—ত্যান ন। এইবার মৌসুমত সুবিধা নাই।

—তোরাব আলীর খরচা উডিব না?

—খরচা তো উডিবই।

কাঞ্চন মুড়ি আর ইলিশভাজা দেয়। রান্নাঘরে ছেলে-মেয়েগুলো হৈ-চৈ করে ভাত খাচ্ছে। আজ ওদের উৎসব। এমন উৎসব ওদের ভাগ্যে কমই জোটে। মালেকের পেটে খিদে ছিল। দ্রুত মুড়ি আর মাছ খেয়ে ফেলে। ইচ্ছে করে আরো একবাটি মুড়ি খেতে, কিন্তু কাঞ্চনের কাছে চাইতে পারে না। ওরা বড়ো কষ্টে থাকে। কথাটা মনে হতেই মাথা ঝিম মেরে যায়। সুজা এই কষ্ট তাড়াতে চাইছে। পারবে কি সুদিন ধরে রাখতে? এরপর পুলিশ, হাজত ইত্যাদি চিন্তায় মালেকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়। ও আগ বাড়িয়ে এইসব কোনো কিছু ভাবতে চায় না। আসলে স্থায়ী সংগ্রাম ছাড়া প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে কি সুখ পাওয়া যায়? যায় না। সুজা একা বড়োলোক হলে কি বাদলের দুঃখ ঘুচবে, না-কি বসির আলির চোখের জল শুকোবে?

—তুই কী ভাবস, মালেক? মার শরীল ভালা তো?

—ঘরত গরম, ল বারত যাই বই।

দুজনে খালের পাড়ে নারকেলগাছের নীচে দাঁড়ায়। কাঁটাঝোপের জোনাকিগুলো জ্বলছে-নিভছে, শরীরের একদম কাছে, হাত বাড়ালে মুঠিতে পোরা যায়। মালেক মুঠিতে ধরে আর ছাড়ে। জোনাকির সঙ্গ ভালো লাগে। নাফের জলে ছেড়ে দিলে কি ওগুলো ফুলের মতো ভাসতে-ভাসতে চলে যাবে? ওদের এই জ্বলে-থাকা কি রাতদিনের হতে পারে না? সুজা মালেকের আচরণে রেগে যায়।

—কথা ন কছ ক্যা, মালেক?

—কইয়াম, থিয়ো।

—পোলাপানের মতো খেলা শুরু কইরগাম।

সুজার উচ্চকণ্ঠ মালেককে স্পর্শ করে না। ও নাফের পাড়ে দাঁড়িয়ে নারকেলি হাওয়ায় ভিন্ন চিন্তা করে। সাফিয়ার মুখ মনে পড়ে। ও এখন শুকুরের স্ত্রী। জোনাকির মতো ওর খুশির ফানুস জ্বলছে আর নিভছে। মালেকের বুকের ভেতরের কালো মোটা দাগ দগদগে ঘা হয়ে পুড়িয়ে যাচ্ছে। ও এই পর্যন্ত কাউকে কিছু বলে নি, সাফিয়ার সঙ্গে দেখাও হয় নি। শুধু আলেকের কাছে নীরবে ঘটনাটা শুনেছে। সাফিয়াকে টুকরো-টুকরো করে নাফ নদীতে ভাসিয়ে দিলে কি তার মাংসপিণ্ড এমন ফুলের মতো জ্বলবে?

—তুই কিছু ন কইলে আঁই যাই গই। আন্ধারত থিয়াই থয়ন ন যায়।

—কামডা ভালা ন কর বড়োভাই। মালেকের শক্ত নির্মম কণ্ঠস্বর এতক্ষণে নীরবতা চৌচির করে দেয়।

—কাম? তোর কথা ন বুইঝলাম। সুজা অবলম্বন হাতড়ায়। কিন্তু পরক্ষণে মালেকের হাত আঁকড়ে ধরে। কণ্ঠ বদলে যায়, বিষাক্ত সাপের মতো হিশহিশ ধ্বনি।

—কইয়ে কনে?

—হেইডা কথা ন। কথা হৈল তোরাব আলীও জানে। মালেক নির্বিকার উত্তর দেয়।

—কইয়ে কনে? সুজার কণ্ঠে জেদ। বাদলের কান্না মনে পড়ে যায়। মালেক নিজের পদ্ধতিতে উত্তর দেয়।

—কামডা ঠিক ন হয়।

—উপদেশ ন দিবি। সুজা খেঁকিয়ে ওঠে।

—অ্যান করি বড়োমানুষ হওন ন যায়, বড়োভাই।

—অত কথা হুনিত ন চাই। নিজের চরকাত ত্যাল দে।

সুজা দুপদাপ পা ফেলে চলে যায়। মালেক বুঝতে পারে যে ও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠেছে, এখন শক্ত হবার প্রস্তুতি নেবে। শুরু হবে তোরাব আলীর সঙ্গে লড়াই।

সুজা চলে গেলে মালেক নাফের পাড় দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে হাঁটে। হাঁটতে-হাঁটতে মনে হয় কার যেন ফিশফিশ কথা ভেসে আসছে। ও কান খাড়া করে। পাশের ঝোপ থেকে হাসির শব্দ।—সালেক না? মেয়েটি কে? জুলেখা নয় তো? ও সংশয় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরক্ষণে মনে হয় উচিত হচ্ছে না, পা বাড়ায়। সেই সঙ্গে ওদের হাসি-কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে সালেক আর

জুলেখাই। নিজের নির্বুদ্ধিতায় রাগ হয়। কতদিন ওদের এখানে-ওখানে কথা বলতে দেখেছে, কিন্তু কোনো-দিন মনে হয় নি যে ওরা এতদূর এসেছে। হাঃ, কত দ্রুত কত কিছু ঘটছে, ও নিজেই কেবল তাল রাখতে পারছে না। ও বড়ো বেশি পিছিয়ে-পড়া মানুষ। ওর সামনে দিয়ে সাফিয়া মুক্তো সরিয়ে টাকা বানায়, বিয়ে করে সংসার বাঁধে। সব জায়গায় হেরে যাওয়া বুঝি নিয়ম হয়ে গেছে। আত্মমগ্ন হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কখন যে সাফিয়ার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায় না। রাত বেশি না, কেবল সন্ধ্যা উতরেছে। এদিক-ওদিক লোকজনের আসা-যাওয়া চলাফেরা চলছে, কারো গানের সুরও ভেসে আসছে, ঘরে-ঘরে রান্নাবান্না হচ্ছে, কিন্তু সাফিয়ার বাড়িটা বড়ো বেশি চুপচাপ মনে হয়। কেউ কি নেই? ও তো জানে শুকুর কখনোই জুয়া খেলে রাতদুপুরের আগে ফেরার লোক নয়। ও ঝাঁপ খুলে নিঃশব্দে ঢোকে। ঘর অন্ধকার। চুলোয় আগুন নেই।

—সাফিয়া?

—কে বাবা, মালেক? বারান্দায় শুয়ে থাকা জয়গুন সাড়া দেয়।

—চাচী, আপনের কী হইয়ে?

—জ্বর আইস্যে, বাবা।

—কখন? কামে গেলেন না?

—কামত্তুন আইতে-আইতেই জ্বর আই গেলগই।

মালেক পাশে বসে কপালে হাত দেয়। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।—মাথায় পানি দিবেন না?

—দিয়ম বাবা, তুঁই দ। সাফিয়া যে কডে গিয়ে কইত না পারি।

জয়গুনের অসহায় আর্তকণ্ঠে মালেক বিচলিত বোধ করে। বালতিতে করে পানি উঠিয়ে জয়গুনের মাথা ধুয়ে দেয়।

—কিছু খাইবেন না, চাচী?

—না, বমি লাগে।

জয়গুন বালিশে মাথা হেলিয়ে দেয়। মালেক পাশে বসে থাকে। জয়গুন ওর হাত আঁকড়ে ধরে আছে। ছাড়াতে গেলে চেপে ধরে। ও কী করবে বুঝতে পারে না। কতক্ষণ বসে থাকবে? বুড়িকে একলা রেখে চলে যেতেও মন চায় না। সাফিয়া ফিরছে না কেন?

—চাচী, চেরাগ কডে?

জয়গুন কথা বলে না। অন্ধকার ভালো লাগে না ওর। কুপিটা পেলে জ্বালিয়ে রাখত।

—চাচী, ও চাচী!

সাড়া নেই। মালেকের হাত ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ ওর ভীষণ ভয় করে। মরে যায় নি তো বুড়ি? ও কপালে হাত রাখে, শরীরের তাপ বেড়েছে। এতই কি নিস্তেজ হয়ে গেল? ও উঠোনে পায়চারি করে। একটু পরে সাফিয়া ফেরে। মালেককে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

—তুঁই?

—কডে গেইলা?

—টেফনাফ।

—বেড়াইতে?

—হ।

—ভালাই তো আছ! মালেকের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ সাফিয়া ধরতে পারে না।

—শুকুর ন আইয়ে?

—অখনই? তইলে জুয়া খেলিব কনে? সাফিয়া প্রসঙ্গ ফেরাতে চায়।

—মা ন আইয়ে?

—আইসো। চাচীর জ্বর।

—জ্বর?

সাফিয়া দৌড়ে বারান্দায় উঠে যায়। মালেক নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। কোথাও যেতে ভালো লাগে না। ঘরে ফেরে।

—মালেক আইসাস না?

—হ, মা।

—আলেক কডে?

—ন দেখি, আই পড়িব। মালেক চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে।

—আঁই ঠিক করি সালেক বিয়া করিলে আঁই দুবলার চরত যাইয়াম গৈ।

—না বাবা, না।

—ক্যা?

—হ্যাডে গেলে মানুষে আর ন ফিরে।

—ক্যা করমর বাপ ন ফিরে?

—হিতারা গেইল দশজন, ফিরগে তিনজন মাত্র। মালেকের মা আর্তকণ্ঠে বলে।

—তোঁয়ার লাই আঁই কোনো জাগাত যাইত ন পারি। তোঁয়ারে কারো কাছত রাখি গেলে আঁই শান্তি ন পাই।

বুড়ি কথা বলে না। জীবনের শেষবেলায় এইটুকুই তার শান্তি। নইলে তো বেঁচে থাকা এখন দোজখের আগুন, নিরন্তর পোড়ে। অন্ধ হয়ে যাবার পর সব-কিছুই তো অন্ধকার, যেমন কর্মহীন জীবন তেমন অর্থহীন শ্বাসটানা।

—তুই উগ্যা বিয়া কর, বাবা।

—বিয়া কইল্যে তোঁয়ার লগে বউর কাইজ্যা হইব। তারতুন তো অ্যানে বহুত ভালা আছি, মা।

—আঁর কলিজা তো ঠাণ্ডা না হয়। তোর বউর লগে আঁই কইজ্যা ন কইরগ্যাম। যিয়ান কইব হিয়ান হুইনাম। তুই চাই লইস, বাজান।

মালেক হো-হো করে হাসে।

—তোঁয়ারে অন্যায় কইলেও তুই ন কইবা?

—না বাজান, না।

মার আত্মসমর্পণের ভাষায় মালেকের বুক কেমন করে।—তোঁয়ার শান্তি হইলে বিয়া কইরগ্যাম।

—কখন?

—চাই কখন হয়। মালেক নিস্তেজ গলায় বলে। ওর মা ভরসা পায় না। এভাবেই তো ও সান্ত্বনা দেয়। তারপর কত সময় চলে যায়, মালেকের সময় আর হয় না।

—দুবলার চরত যাইয়ারে আকিলার বাপ কলেরাত মইরগ্যে।

মালেকের মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। ও উঠে বসে।

—কনে কইয়ে?

—ক্যা আনসু মিয়া খবর আইন্যে। তুই ন হুনস?

—না। মালেক আবার শুয়ে পড়ে।

—আহা রে, অ্যাতেক্কিন পোলাপান তুই যাইয়ারে চাই আসিস।

—হুদা চোখের দেখা দেখিয়ারে কী হইব?

মালেক নিজেকে প্রশ্ন করে। এইজন্যেই তো ও একটা স্থায়ী সমাধান চায়। কিন্তু কেউ ওকে বুঝতে পারে না, উলটে গাল দেয়। ও কাদের নিয়ে সামনে এগুবে? ও বিষণ্ণ হয়ে থাকে। বাপ-মরা আকিলারা লাথ্‌থি খেতে-খেতে পাথর হয়ে গেলে তারপর বুঝি একজোট হবে! এর জন্য কয় পুরুষ অপেক্ষা করতে হবে? লাথ্‌থি ওরা নিজেরা খাচ্ছে না? তাহলে জোট বাঁধছে কই? কেন সব-কিছু নিয়মমতো হয় না? কেন এত গোঁজামিল? এত ফুটো কি ও একলা বন্ধ করতে পারবে? মালেক বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শোয়। সেনট মার্টিনের প্রবালগুলো হাজার বছর ধরে জমতে-জমতে পাথর হয়েছে, মানুষেরা অমন জমে না কেন? জমে কালো মিশমিশে পাথর হয়ে মালার মতো বেড় দিয়ে রাখবে নিজেদের ভূখণ্ড। সেই পাথরে চমৎকার ফুল ফুটবে, সুরভিত ফুল, যা কোনোদিন শুকিয়ে ঝরে পড়বে না। আবেগে ওর চোখে পানি আসে। কৈশোরে একবার সুজার সঙ্গে গিয়েছিল দুবলার চরে শুটকি বানাতে। হীরন পয়েনটের উত্তর-পুব কোণে, সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে তিন মাইলের মতো লম্বা দুবলার চর। অবাক বিস্ময় ওকে অভিভূত করে রেখে-ছিল। কুচো চিংড়ি থেকে শুরু করে ছোটো সাইজের হাঙরের শুটকি সৈকত জুড়ে ছড়িয়ে আছে। গন্ধে টেকা দায়। প্রথম কদিন খুব কষ্ট হয়েছিল। যখন-তখন বমি আসতে চাইত, তারপর ঠিক হয়ে যায়। সমুদ্রের জালে ধরা পড়ে বাইশ রকমের মাছ। রূপচাঁদা আর লম্বা ছুরি মাছের শুটকির কদর বেশি। সেই বয়সে কাজের চাইতে আনন্দ ছিল বেশি। কার্তিকের শুরুতে গেলে মাঘের শেষে ফিরতে হত, প্রায় চার মাস। সময় যে কিভাবে ফুরোয় তা টেরই পাওয়া যেত না। সৈকতে লাল কাঁকড়ার পেছনে ছুটে কত যে সময় নষ্ট করেছে। কাজ ফেলে এসব করতে দেখলে সুজা মারতে আসত। অথচ কাঁকড়াগুলো বালুর ভেতর দ্রুত কিভাবে যে ঢুকে যেত, জেদ বাড়ত ওর। কখনো বালু খুঁড়ে বের করে আনত। এখন এইসব ভাবলে ক্লান্তি আসে। প্রতি বছর মৌসুমি জেলেরা দুবলার চরে যায় শুটকি বানানোর জন্যে। ও বড়ো হয়ে কখনো যায় নি। সবচেয়ে বড়ো কষ্ট পানির। গর্ত খুঁড়ে সংগ্রহ করতে হয় খাবার পানি। ডায়রিয়ায় কত লোক যে মরে। সব জেনেও মানুষ ছুটে যায় কাজের জন্যে। কুয়াশার হিম-পড়া রাতে পাতার ঘরে ঘুম আসতে চায় না, বুক ভরে শ্বাস নিলে গন্ধহীন বাতাস নেই, কলজে-ভরা পানি ঢকঢকিয়ে খাওয়া যায় না, তবুও যেতে হয়, মরতে হয়। নইলে পেটে ভাত জোটাবে কে? ও বিছানায় উঠে বসে। এখন থেকে মানুষগুলোকে এক-জোট করতে হবে।

—ও বাবা?

—কও, মা।

ওর মা কাশে, শুকনো আর বুকভাঙা কাশি। কথা বলতে কষ্ট হয়। মালেক উঠে মায়ের কাছে আসে।

—তোমার লাই ওষুধ আনি গিয়া?

বুড়ি প্রবলবেগে মাথা নাড়ে।

—এখন থক। তুই সালেকর লাই অগ্যা কিছু কর।

—ক্যা? হিতার কী হইয়ে?

—ক-দিন পর-পর মাইয়াডারে ঘরত আনে। আঁর এক্কেবারে ভালা ন লাগে। বিয়া পড়ায়ে দে।

—তুই কিছু ন কও?

—তুই ছাড়া আঁর কথা কি কেউ হুনে?

মালেকের বুকের ধুকধুকুনি বেড়ে যায়। সালেক এতদূর নেমে গেছে? কই, ও তো টের পায় নি? কত কিছুই তো ওর অজান্তে ঘটে, ও কি সব টের পায়? সালেক কাল সেনট মার্টিন যাবে। ও টাকা-পয়সা ভালোই করেছে। ফিরলেই বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। একটা কিছু ঘটে গেলে আর মুখ দেখাতে হবে না।

পনেরো দিনের মাথায় ফিরে আসে সালেক। চকচকে দৃষ্টি, উজ্জ্বল চেহারা। গায়ে নতুন জামা, পরনে নতুন লুঙি। ঘাটেই মালেকের সঙ্গে দেখা। ও হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—মা ক্যা আছে, মাইজ্যা ভাই?

—ভালা। তুই?

—আইও, তোঁয়ার লগে কথা আছে। সালেক ওকে টেনে এনে নারকেলগাছের ছায়ায় বসে।

—আঁই বিয়া কইরগ্যে, মাইজ্যা ভাই।

ওর আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে মালেক বিমূঢ় হয়ে যায়।

—বিয়া? জুলেখা—

—রাখি দ জুলেখা, হিতার বাপর তো কিছু নাই। বিয়া করি কী পাইয়াম? রহিমুনর বাপর তো পোয়া নাই, হুদা অগ্যা মাইয়া। এখন আঁরে দুয়া টলার দিয়ে আর অগ্যা জাল, বুড়া মরিলে ব্যাক পাইয়াম।

—ঘরজামাই হবি না?

—খারাপ কী? আঁই বড়ো মানুষ হইতাম চাই, মাইজা ভাই। বহুত টলার, জাল, হাজার-হাজার মাছ, লাখ-লাখ টেঁয়া ট্যাঁকত রাইখাম।

সালেকের স্বপ্নাতুর দৃষ্টির সামনে মালেকের বুক জ্বলে যায়। বারবার জুলেখার মুখ ভেসে ওঠে। এখন সে মুখ বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, বয়সকালের কান্তিময় দীপ্তিতে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। ও কথা বলতে পারে না।

—তুই কথা ন কও ক্যা?

—কামডা ঠিক ন হয়।

—তোঁয়ার নান ভালা মানুষর কাছত ঠিক ন হয়। আঁই তোঁয়ার নান ফেরেশতা হইত ন পাইজ্যাম। চালাকি করি উভিত ন পারিলে কেউ হাতর কাছত আনি ন দেয়।

—জুলেখারে ঠকাইয়াস ক্যা?

মালেক ঠাস করে গালে চড় মারে। সালেক বিব্রত হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর হিংস্র-ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বলে, তোঁয়ার যদি এতই দরদ থাকে তইলে তুই নিজেই বিয়া কর না? আঁর অত মাথা-ব্যথা নাই।

ও দুপদাপ করে লম্বা পায়ে চলে যায়। কিছু করতে না পারার গ্লানিভরা অসহায় মানুষের মর্মজ্বালা নিয়ে মালেক সেকেন্দারের দোকানে আসে।

তখন দাওয়ার ওপর খুঁটিতে হেলান দিয়ে জুলেখা শূন্য আকাশ দেখে। গত রাতে মা টের পেয়ে ভীষণ মেরেছে। ও নিজেও নিজের ভুলে দিশেহারা, অনবরত প্রার্থনায় সালেকের প্রত্যাবর্তন কামনা করছে। জেলে-পাড়ার অনেকেই জানে সালেকের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা। ও এখন কার কাছে যাবে? মার কাছ থেকে ঘটনা শুনে বাবা রাতে ভাত খায় নি। ভোরে উঠে টেকনাফ গেছে, এখনো ফেরে নি। আমি কি মরে যাব? খেলে বমি আসে, এ লজ্জা লুকোই কোথায়? ওর মা ওকে গলায় দড়ি দিতে বলেছে। কিছুতেই না। সালেকের সঙ্গে এত সুখের সময় কাটিয়ে এখন ও মরবে কেন? কী আনন্দ, কী উত্তেজনায় আড়াই মাস কেটে গেল। জুলেখার হাসি পায়, কষ্টের হাসি। সুখের মুহূর্ত অতিক্রম করা কি মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া? ওর মাথা ঝিমঝিম করে। শরীর জুড়ে অবসাদের ক্লান্তি। রাতে ঘুম হয় নি। এখন বেলা দুপুরে। কিছু খাওয়া হয় নি। প্রতিদিনই একবার করে যায় সালেকের খোঁজে। ওর অন্ধ মা আদর করে কথা বলে, ভালো লাগে। মনে হয় অন্তত একটা সান্ত্বনার ঠাঁই আছে। আজও যাবে। মায়ের পিটুনির ফলে পিঠে ব্যথা, হাঁটতে ইচ্ছে করে না। পেটের ভেতর নাকি মানুষ বাড়ছে, ওর

শরীর শিরশির করে। এত সহজে সব-কিছু হয়ে যায়, এ বোধ ভাঙতে না ভাঙতেই ও মা হতে যাচ্ছে।

বিকেলে সালেকের ঘরের সামনে যখন আসে তখন ও মার কাছে চুটিয়ে বিয়ের গল্প করছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে কী পেয়েছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছে। অনাগত ভবিষ্যতে ট্রলার, জাল ছাড়াও জমি, বাড়ি পাবার সম্ভাবনা ওকে বিভোর করে রাখে। জুলেখা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, ঢুকতে সাহস হয় না। এক সময় সালেকের গল্প শুনতে-শুনতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সালেক দ্রুত উঠে আসে।

—তুঁই?

—তুঁই বিয়া কইরগ্য? জুলেখা জলভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

সালেক মুহূর্তে ঝাঁকুনি খায়। তারপর নির্মম শুকনো কণ্ঠে বলে, হুনলাই তো করগ্যি।

—আঁর পেটে তোঁয়ার—

—মিছা কথা।

—না, হাছা। তোঁয়ার গা ছুঁই কইর।

জুলেখা ওকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। এখন আর চোখে জল নেই।

—আঁই বিয়া করগ্যি জুলেখা, বেশি ফ্যাচফ্যাচ ন কইরগ্য।

—বিয়া কইরগ্য তো কী হইয়ে? আঁরে আবার বিয়া কর। আঁই কী কইরগ্যাম?

—হিবা ন হয়।

গনি মিয়ার চেহারা ভেসে ওঠে ওর সামনে—ক্রূর, ভয়াল। জুলেখাকে বিয়ে করলে কেটে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। নিজের এমন সুন্দর ভবিষ্যৎ ফেলে কি কেউ কাদায় ঢোকে? ও বিড়ি ধরায়।

—ক্যান ন হয়? জুলেখা শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

—ন হয়, ন হয়। বেশি কথা ন বাড়াইও।

—এখন আঁই কী করগ্যাইম! কডে যাইয়াম?

—মরো, মরো, মরিয়ারে জ্বালা জুড়ো। এত বাঁচনের শখ ক্যা? সালেকের নিষ্ঠুর উচ্চারণে ও হতবাক হয়ে যায়। কী নিদারুণ জলোচ্ছ্বাসে ওর পায়ের নীচের সবটুকু মাটি ধুয়ে যায়। জুলেখা দাঁড়াতে পারে না। অপমানের গ্লানিতে ওর মগজে ঘূর্ণি, বেদনার নীল-দংশনে পুরো জেলেপাড়া অন্ধকার, দুপায়ে প্রেমের আগুন মাড়াতে-মাড়াতে ও নাফের পাশে এসে দাঁড়ায়। সালেক চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে। মেজাজ খচে গেছে। সেনট মার্টিন থেকে ফেরার পর কেবলই বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ওর মা-র দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পায়।

—সালেক?

—কও, মা।

—মাইয়াডারে বিয়া কর। হিতে আঁর কাছত থাকিব। নইল্যে জাইল্যাপাড়াত হিতারা থাকিব ক্যানে?

—না, মা। ন হয়।

—না না ন করিস। আগে মনত না আছিল? বিয়র লাই মাইয়াডারে সব্বনাশ করিলি? বুড়ি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। মার এই কণ্ঠ ও কোনোদিন শোনে নি। অভিমানে অবুঝ হয়ে যায়।

—তোঁয়ারা কেউ আঁর ভালা ন চাও। ব্যাক আঁর দুশমন। আঁই আর তোঁয়ারার কাছত ন থাইক্যম। আর কোনোদিন আঁরে ন দেখিবা। মনত করিবা তোঁয়ারার সালেক মরি গিয়ে।

উত্তেজনায়, আবেগে ও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিছন থেকে মার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ও শুনতে পায় না। ভ্রূক্ষেপহীন হাঁটে। সেনট-মার্টিনগামী শেষ ট্রলারটা এখনো ছাড়ে নি।

সেকেন্দারের চায়ের দোকানে বসে মালেক একটা সমবায় সমিতির কথা মনে-মনে ভেবে ফেলে। ও একে-একে দু-একজনের সঙ্গে আলাপ করে, তারপর বক্তৃতা দিতে শুরু করে। নিজেদের হাজার সমস্যার কথা বলে, কিভাবে প্রতিকার করা যায় তার উপায় বের করার পন্থা ভাবতে বলে। লোকে মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শোনে, সেকেন্দারের দোকানে মানুষ ভিড় করে। অনেক কথা বলার পর ও নিজেও অবাক হয়। এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারবে নিজেও ভাবে নি। কেমন গলগলিয়ে কথা বেরিয়ে আসে, মাথা এখন একদম পরিষ্কার। স্বচ্ছ দেখতে পায় সব-কিছু। প্রথমে সবাইকে একসাথে আনতে হবে। জড়ো করতে না পারলে তো বাঁধন দৃঢ় হবে না। অনেকেই বলে নিজেদের সমস্যা ওরা মালেকের কাছে নতুন করে শুনল, ওরা মতো এমন করে ভাবে নি। রাত বাড়লে একে-একে লোক চলে যায়, ও হাঁটুর ওপর কপাল রেখে বসে থাকে। সেকেন্দার কাপ-পিরিচ ধুয়ে রাখছে, কাজ শেষ হলে ঝাঁপ আটকাবে। মালেকের আচরণ ওকে বড়ো বেশি ক্ষুব্ধ করেছে, কিছুতেই উত্তেজনা কমাতে পারে না। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, ফিরলেই তো মালেকের মুখোমুখি হতে হবে। ওই অমানুষটা এখন অসহ্য।

—বাড়ি ন যাইবেন, মালেক ভাই?

—তোঁয়ার কাম শ্যাষ হইয়ে না?

—হ।

—ল, চলো।

—আচ্ছা মালেক ভাই, আঁরা ছোডলোক, জম্মি ছোডলোক হইয়ারে, মইরগ্যমও হেইভাবে, আঁরার দরকার কী চাঁদ ধরনের শখ করার?

—কথাটা ঠিক না কও সিকান্দার মিয়া। আঁরার কথা আঁরে ন ভাবিলে কনে ভাবিব?

—ধুরু, রাখি দ-ন। এইয়ুন করি কিছু ন হইব। সমিতি-টমিতি কত দেইলাম। কোনো কামত ন আইয়ে। নিজের ধান্দা গুছাই লন। বেগুনের লাই ভাবিয়ারে লাব নাই।

—কী যে ক মিয়া। ন দেইলানা বেগুনে সায় দিল।

সেকান্দার আর কথা না বাড়িয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। মালেক ডানের মোড়ে অন্ধকার রাস্তায় নেমে গেছে। সেকান্দারের মতো লোক প্রতি পদক্ষেপে একজন করে বাধা দেবেই, ওদের ডিঙোতে হবে, সঙ্গে নিতে হবে। আগেই মাথা গরম করে লাভ নেই। মনে-মনে একটা কমিটি ঠিক করে ফেলে। খন্দকার সভাপতি, ও সম্পাদক ইত্যাদি ইত্যাদি। মাথার ওপর চাঁদ নেই, গাছের মাথায় বাতাসের দুলুনি নেই, চারদিকে গুমোট ভ্যাপসা। ওর ভেতরে এবং বাইরে একই আবহাওয়া। এভাবেই শাহপরি দ্বীপ মনের মধ্যে আমূল লেপটে থাকে, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে কোনো ফারাক না রেখেই। সব মানুষকে একই বাঁধনে বেঁধে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা-মমতার এক মোহনায় এনে নতুন শাহপরি দ্বীপ গড়বে। কত বছর লাগবে? কত দিন?

সকালে উঠে মার কাছে সালেক আর জুলেখার সব ঘটনা শুনে গুম হয়ে থাকে। একটু পরেই শুকনো মুখে বসির আলি আসে।

—জুলেখারে ন পাই।

—রাইতে ঘরত ন যায়?

—না।

বসির আলি ধপ করে বসে মালেকের হাত আঁকড়ে ধরে।

—আঁর কী হইব?

ও জবাব দেয় না। ওর শরীরের ভেতর গরম স্রোত বয়। বুঝে নেয় জুলেখা কোনো অঘটন ঘটিয়েছে। কিন্তু কোথায়? কিভাবে?

—চলেন টোয়াই চাই।

—আর কডে টোয়াইয়্যাম।

বসির আলি উঠতে চায় না। শরীর ভারি, ক্লান্তি এবং বেদনায়। এই মেয়েটা ওর প্রথম সন্তান, বুক জুড়ে আছে। মন তো কোনো কিছুই বোঝে না! কেমন করে হেঁটে-হেঁটে জেলেপাড়ার প্রান্তটুকু অতিক্রম করবে?

—উঠেন চাই, চলেন।

মালেক বসির আলির হাত ধরে টেনে ওঠায়। আধাবেলা দুজনে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজে, কোথাও নেই জুলেখা। রাতারাতি এই শাহপরি দ্বীপ থেকে অলৌকিকভাবে উধাও হয়ে গেল, বুঝি কোনোদিন আর কারো মুখোমুখি হবে না ও। বসির আলির বউ বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। সেই কান্না কেমন অদ্ভুত লাগে মালেকের কাছে, কান্নাটা ভিন্ন, একদম বুক-ফাটানো। বসির আলি হাত-পা ছড়িয়ে বারান্দায় বসে আছে, সব-কিছুই তাদের বোধের বাইরে। একে দুয়ে জেলেপাড়ার নারীপুরুষ বসির আলির বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছে। কারো কণ্ঠে উৎকণ্ঠা, কারো কণ্ঠে সমবেদনা। কিন্তু চাপা কৌতূহলের ফিশফিশানি সর্বত্র, কেন এমন করল মেয়েটা? মালেক কারো প্রশ্নের জবাব দেয় না। মানুষের ভিড় থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে, নাফের মোহনায় একবার ঘুরে আসবে। কেবলই মনে হয়, এখন ভাটি, জুলেখা যদি লজ্জার অবসান ঘটায় তাহলে মোহনায় থাকলেও থাকতে পারে। ও কাদার মধ্যে থেকে ডিঙি ঠেলে বের করে নেয়। ভাটির টানে ডিঙি সর-সরিয়ে এগোয়। ওর হাত বেয়ে শিরশিরে অনুভূতি বয়ে যায়। সত্যি যদি নাফের তীরের উড়িঘাসের মধ্যে জুলেখার দেহ আটকে থাকে? মাথা কেমন করে, লাগিটাও বুঝি ঠিকমতো ধরা হয় না। ও ঘাসের বনে

ডিঙি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। এখনো হাঁটুসমান পানি। লগি পুঁতে ও লাফিয়ে নাফে পড়ে। কানের কাছ দিয়ে বড়ো কালো ভোমরা চক্কর খায়। ও এগোয়, ইতস্তত খোঁজে, জলকাদায় মাখামাখি হয়ে যায় শরীর। ওর ভ্রূক্ষেপ নেই, নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেন জুলেখাকে এখনই পাওয়া যাবে, এমন একাগ্রতা নিয়ে ও ঘাস হাতড়ায়। এগোতে-এগোতে বেশ খানিকটা ভেতরে এসে থমকে দাঁড়ায়। নিজের অজান্তেই একটা আর্তধ্বনি বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। ও ছুটে কাছে যেতে পারে না, কাদায় পা আটকে যায়। জুলেখা চিত হয়ে শুয়ে আছে, মুখটা একপাশে হেলানো। চোখের পাতা বোঁজা, সর্বত্র নিবিড় প্রশান্তি। কোথাও মৃত্যুর ছাপ নেই, মনেই হয় না যে জুলেখা এখন আর শাহপরি দ্বীপের কেউ না। মালেক এক পা-দু পা করে এগিয়ে যায়। খুব কাছ থেকে ওকে একটা বিশাল শুয়োপোকার মতো মনে হয়, বিশাল এবং কুৎসিত। মালেকের কান্না পায়। বসির আলির মুখ মনে পড়ে। ও দুহাতে জুলেখাকে উঠিয়ে নেয়। এত ভারি যে নৌকা পর্যন্ত পৌঁছতে ওর কষ্ট হয়। এক সময় ইচ্ছে করে লাথ্থি দিয়ে নদীতে ফেলে দিতে। জলকাদায় পোকার মতো মরে পড়ে থাকাই যদি নিয়তি, তবে জন্ম কেন? কেন বেড়ে ওঠা, মা হওয়া? ধুত্, সবকিছুই মাটি! সমিতির মধ্য দিয়ে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে হবে, যা বর্ম হয়ে ওদের রক্ষা করবে। কারো খেয়ালখুশির কাঠগড়ায় আরেক-জনকে আত্মহত্যা করতে হবে না। ও জুলেখার শরীর ডিঙির ওপর রাখে। সালেকের মুখ মনে পড়ে। শুয়োরের বাচ্চা; গালি দিয়েও আশ মেটে না। প্রয়ো-জন কুচিকুচি করে কাটা। বিচার-আচার নেই বলেই এমন হয়। কে কার বিচার করবে? ও হেঁচকা টানে লগি ঠেলে তুলে ডিঙি ভাসিয়ে দেয়। ও এই মৃত মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? শাহপরি দ্বীপ নামের একটা দারুণ নরকে কি? ওই নরকটাকে ও প্রবালফুলের স্বর্গ বানানোর স্বপ্ন দেখে। মালেকের পেশি ফুলে ওঠে, ও দ্রুত নৌকা বায়। এই মেয়েটিকে ও ওর বাবার কাছে পেঁৗছে দিতে পারলে স্বস্তি পাবে।

[ক্রমশ

আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

শংকর ঘোষ

আমাদের সংবিধানের চেয়ে দীর্ঘতর সংবিধান সম্ভবত কোনো দেশের নেই। স্বভাবতই এই সংবিধানের ৩৯৫টি ধারা আর নয়টি তফশীলকে চূড়ান্ত রূপ দিতে সংবিধান-সভার সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই বছর। এই দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে যে বিষয়টি সম্পর্কে কোনো দ্বিমত দেখা যায় নি সেটি আমাদের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো। আমাদের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিতান্ত্রিক হবে, না ব্রিটিশ ধাঁচে মন্ত্রিসভাভিত্তিক হবে—তা নিয়ে মতভেদ ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের মূল চরিত্র নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না।

গণতন্ত্রের রকমভেদ আছে। গণতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সব গণতান্ত্রিক দেশে সমান পরিস্ফুট নয়, কিন্তু তার জন্য এই দেশগুলির গণতান্ত্রিকতাকে কেউ অস্বীকার করেন না। গণতন্ত্রের অপরিহার্য লক্ষণ একটি —বহুদলের, বহুমতের অস্তিত্ব। যে ব্যবস্থায় বহু-দলের অস্তিত্ব নেই বা সম্ভব নয়, সে ব্যবস্থাকে নির্ভেজাল, খাঁটি গণতন্ত্র বলে স্বীকার করা যায় না। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন দলহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে একটি বক্তৃতায়—সম্ভবত ইংল্যানডের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইনটারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস-এ—বলেছিলেন, তাঁর এক নির্বাচনী সফরের সময় এক বৃদ্ধ কৃষক তাঁকে প্রশ্ন করে-ছিলেন, এতগুলি পার্টির কী দরকার, দেশ শাসনের জন্য একটি পার্টি থাকলেই কি যথেষ্ট নয়? ইন্দিরা গান্ধী কী উত্তর দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত কী, তা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি, কিন্তু ঘটনাটি তাঁর উল্লেখ করা থেকেই বোঝা যায় যে উক্তিটির যৌক্তিকতা তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন নি। রাজীব গান্ধী তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় যখন বলেছিলেন যে কেন্দ্রে আর রাজ্যে একই দলের ক্ষমতায় থাকা বাঞ্ছনীয়, তখন তার ব্যাখ্যা হয়েছিল যে তিনি বহুদলের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, এবং সংগত কারণেই তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, এই ব্যাখ্যার তিনি প্রতিবাদ করেন নি, যদিও মার্চ মাসের বিধানসভা নির্বাচনে দেশের সাধারণ মানুষ তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য

করে তিনটি রাজ্যে অকংগ্রেসি মন্ত্রিসভার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধানের ৩৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও দলহীন বা একদলীয় গণতন্ত্রের কথা উঠছে, কারণ আমাদের দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ঠিক-মতো গড়ে ওঠে নি। গান্ধীজী কংগ্রেসকে ভেঙে দুটি দল গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি জীবিত থাকলে হয়তো সত্যিকারের দুটি সর্বভারতীয় দলের আবির্ভাব ঘটত, কিন্তু তাঁর হত্যায় সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। তারপর শুনেছি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবার কিছুদিন পরে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের সমর্থনে নেহরু নীতি ও নেতৃত্বের বিরোধী কংগ্রেসিদের নিয়ে একটি বিকল্প দল গঠনের চেষ্টা হয়েছিল, দলের নেতা হওয়ার কথা ছিল সরদার প্যাটেলের, এবং তাঁর প্রধান সহযোগী হতেন শ্যামাপ্রসাদ আর ড আম্বেদকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সরদার পিছিয়ে যান।

সরদার প্যাটেলের মৃত্যুর পরে কংগ্রেসে নেহরুর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়। তখন থেকে নেহরু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নেহরু নেতৃত্বের বিরোধীরা দলীয় সম্পর্ক ছিন্ন না করে তাঁর বিরোধিতায় সাহসী হন নি, তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করেছেন। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা গান্ধীবাদী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের একটি গোষ্ঠী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, আর একটি গোষ্ঠী আচার্য কৃপালনির নেতৃত্বে গঠন করলেন কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি। পরে এই পার্টি সোস্যালিসট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলে সংযুক্ত পার্টির নাম হয় প্রজা সোশ্যালিসট পার্টি।

নেহরু-আমলে নেহরু-নেতৃত্বের বিরোধীরা দলত্যাগ করে নতুন দল গঠন করতেন। ইন্দিরা-নেতৃত্বের কালে এই রীতির পরিবর্তন হয়। নেহরুকে হটানো অসম্ভব জেনেই সম্ভবত তাঁর বিরোধীরা নতুন নামে, নতুন পতাকা নিয়ে তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেন। ইন্দিরা-বিরোধীরা তা করেন নি, কারণ ইন্দিরাকে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ তাঁদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হত না ; তাঁরা মনে করতেন দলে থেকেই ইন্দিরা নেতৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। কাজেই ইন্দিরা-আমলে যে দুবার কংগ্রেস ভাগ হয়েছে কোনোবারই বিরোধীরা দলত্যাগ করেন নি, অন্য নাম গ্রহণ করেন নি, বরং দাবি করেছেন তাঁরাই প্রকৃত কংগ্রেস, আর ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী কংগ্রেস নাম গ্রহণের অযোগ্য। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের কালে নানা বিশেষণে ভূষিত কংগ্রেসের আবির্ভাব। কংগ্রেসের এইসব প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীরা বারবার তাদের পরম্পরবিরোধী দাবি নিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রতিবারই সাধারণ মানুষের রায় ইন্দিরার অনুকূলে গেছে—১৯৭১-এ তাই, ১৯৭৮-এও তাই, ১৯৮০-তেও তাই। প্রতিবারই দেখা গেছে, সাধারণ মানুষের বিচারে কংগ্রেসের যে গোষ্ঠীর নেতা ইন্দিরা গান্ধী সেই গোষ্ঠীই কংগ্রেস।

কংগ্রেসের ভিতর থেকে যেমন কংগ্রেসের বিকল্প একটি সর্বভারতীয় দলের গঠন সম্ভব হয় নি, তেমনি অকংগ্রেসি কোনো দলও এই দীর্ঘ কালে জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে নি। নির্বাচন কমিশনের সংজ্ঞা অনুসারে কংগ্রেস ছাড়াও আমাদের দেশে কয়েকটি জাতীয় পার্টি আছে ; তাদের নির্বাচনী প্রতীক সংরক্ষিত। সাধারণ নির্বাচনে এইসব দলের প্রার্থীরা সারা দেশে ওই সংরক্ষিত প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, অন্য কোনো দল বা প্রার্থীর ওই প্রতীক ব্যবহারে অধিকার নেই। জনতা পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি, লোকদল, দুই কমিউনিসট পার্টি এবং কংগ্রেস(স) এই হিসাবে সর্বভারতীয় দল, কিন্তু লোকসভায় এইসব দলের প্রতিনিধিরা কটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, এই দলগুলির কারও সবকটি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব নেই, বেশ কিছু রাজ্যে কেবল সাইনবোর্ড আর কর্মকর্তারা আছেন, কর্মী এবং সমর্থক নেই।

১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনের পরই যে অকংগ্রেসি তথাকথিত সর্বভারতীয় দলগুলির এই অবস্থা তা নয়, বরাবরই তাই ছিল। লোকসভার ৩৫ বছরের ইতিহাসে মাত্র দুবার সত্যিকারের সর্বভারতীয়-অস্তিত্ববিশিষ্ট বিরোধী দলের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমবার ১৯৬৯ সালে যখন কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়, এবং সংগঠন কংগ্রেস বিরোধী পক্ষে আসন গ্রহণ করে। দ্বিতীয়বার ১৯৭৭ সালে যখন জনতা ক্ষমতা লাভ করে, এবং কংগ্রেসকে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখা যায়। এই

দুইবার ছাড়া কখনই লোকসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা ৫০-এ ওঠে নি। কাজেই লোকসভায় প্রকৃত অর্থে বিরোধী দল প্রায় ছিল না বললেই চলে ; যা ছিল তা একটি বিরোধী পক্ষ।

বর্তমান লোকসভাও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারের লোকসভায় বৃহত্তম বিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা ২৮। ইতিপূর্বে সবকটি লোকসভাতেই বৃহত্তম বিরোধীগোষ্ঠী ছিল কোনো-না-কোনো তথাকথিত সর্বভারতীয় দল, এবারের লোকসভার বৈশিষ্ট্য—এখনকার বৃহত্তম বিরোধী গোষ্ঠী একটি আঞ্চলিক দল, এবং এই গোষ্ঠীর ২৮জন সদস্যই একটিমাত্র রাজ্য—অন্ধ্রপ্রদেশ—থেকে নির্বাচিত। বর্তমান লোকসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল সি পি এম। সি পি এম-এর সদস্যসংখ্যা ২২, তার মধ্যে ১৮ জনই পশ্চিম বাঙলা থেকে নির্বাচিত, বাকি চারজনের দুজন ত্রিপুরার, একজন অন্ধ্রপ্রদেশের, একজন কেরলের। তৃতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী আবার একটি আঞ্চলিক দল, অল ইনডিয়া আন্না ডি এম কে। এই গোষ্ঠীর ১৩জন লোকসভাসদস্য সকলেই তামিলনাড়ু থেকে নির্বাচিত। বিরোধী পক্ষের চতুর্থ বৃহত্তম গোষ্ঠী জনতার সদস্যসংখ্যা ১০। তাঁদের মধ্যে চারজন জনতা-শাসনাধীন রাজ্য কর্ণাটক থেকে নির্বাচিত, বাকি ছয়জন নির্বাচিত ছয়টি রাজ্য থেকে—অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাত, কেরল, মহারাষ্ট্র আর ওড়িশা। সি পি আই-এর ছয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজন পশ্চিম বাঙলা থেকে নির্বাচিত, দুজন বিহার থেকে, একজন অন্ধ্রের। কংগ্রেস (সমাজতন্ত্রী)-র চারজন সদস্যের দুজন মহারাষ্ট্র থেকে, অন্ধ্রপ্রদেশ আর কেরল থেকে একজন করে। মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত দুজন সদস্যের একজন ছিলেন কংগ্রেস(স) নেতা শারদ পাওয়ার। তিনি মহারাষ্ট্র বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর লোকসভায় তাঁর শূন্য আসনে নির্বাচিত হয়েছেন একজন জনতা প্রার্থী। ফলে এপ্রিল মাসের উপনির্বাচনের পর লোকসভায় জনতার সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১, আর কংগ্রেস(স)-র তিন। বাকি দুটি তথাকথিত সর্বভারতীয় দলের মধ্যে চরণ সিং-এর দলিত মজদুর কিষাণ পার্টির (পরে নামান্তরিত লোকদলের) আসনসংখ্যা তিন—দুটি উত্তর প্রদেশে আর একটি বিহারে—আর ভারতীয় জনতা পার্টির আসনসংখ্যা দুই—একটি অন্ধ্রপ্রদেশে আর একটি গুজরাতে।

উপরের সংক্ষিপ্ত নির্বাচনী ফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র দলিত মজদুর কিষাণ পার্টি বা লোকদল ছাড়া আর সব তথাকথিত সর্বভারতীয় দলই অন্ধ্রপ্রদেশে একটি করে আসন পেয়েছে। এই আসনগুলি তারা অন্ধ্রের শাসক দল এবং একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাধিকারী তেলুগু দেশম্-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পায় নি, তার সমর্থন আর সহযোগিতায় কংগ্রেসকে পরাস্ত করে পেয়েছে। অন্ধ্রে তেলুগু দেশম্-এর সঙ্গে যদি সর্বভারতীয় বিরোধী দলগুলির কোনো নির্বাচনী সমঝোতা না হত তাহলে তারা এই আসনগুলি পেত কিনা সন্দেহ। লোকসভা নির্বাচনে তথাকথিত সর্বভারতীয় দলগুলি শুধু যে অতি অল্পসংখ্যক আসন পেয়েছে তাই নয়, সে-আসনগুলিও পেয়েছে কয়েকটি মাত্র রাজ্যে। জনপ্রিয়তা এবং প্রভাবের গভীরতা আর ব্যাপ্তি—কোনো বিচারেই এই দলগুলি সর্বভারতীয় বা জাতীয় দল নয়, জনতাকে সামান্য ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে, কেননা লোকসভায় তার আসনসংখ্যা মাত্র ১১ হলেও সেগুলি সাতটি রাজ্য থেকে সংগৃহীত।

ডিসেমবরের লোকসভা নির্বাচনে যে-ভোটার আচরণ দেখা গিয়েছিল মার্চ মাসে ১১টি রাজ্য আর একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেল তার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর যাঁরা বলেছিলেন, ইন্দিরাহত্যায় সাধারণ মানুষের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তার উপর নির্ভর করে নির্বাচনে জেতবার চেষ্টা রাজীব গান্ধী করছেন এবং নির্বাচনে সেগুলির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর যাঁরা বলেছিলেন, এ-বিজয় সহানুভূতি-ভোটের জন্য, বিধানসভা নির্বাচনের পর তাঁরা স্বভাবতই দাবি করলেন, তাঁদের বিশ্লেষণ অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে, সহানুভূতিতে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কংগ্রেসের ভোটও কমেছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তিন মাসের ব্যবধানে এই দুই নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট বেশ কমেছে। যাঁরা সহানুভূতি-ভোট-তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা ভেবে দেখছেন না তাঁদের তত্ত্বে সাধারণ ভোটারের উপর অবিচার করা হয়, ধরে নেওয়া হয় যে সাধারণ ভোটার আবেগের বশে,

তাৎক্ষণিক বিচারে ভোট দেন, সুচিন্তিত রাজনৈতিক বিচারে নয়। অথচ আমাদের সংবিধানের ৩৫ বছরে আটটি লোকসভা নির্বাচনে দেখা গেছে যে এদেশের ভোটারদের শিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনার স্তর যাই হোক না কেন, তাঁরা প্রতিটি নির্বাচনে বহুদলের মধ্যে একটিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে লোকসভায় পাঠিয়েছেন। সাতবার কংগ্রেস এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে, একবার জনতা। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসি কোনো দল বা একাধিক অকংগ্রেসি দলের সমষ্টি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। তার অর্থ, আমাদের দেশে এমন অনেক ভোটদাতা আছেন যাঁরা লোকসভা নির্বাচনে এক দলকে ভোট দেন, বিধানসভা নির্বাচনে আর-এক দলকে। ভোটের এইরকম বদলের একমাত্র সম্ভাব্য কারণ লোকসভায় কাকে ভোট দেবেন তা তাঁরা স্থির করেন এক বিচারে, বিধানসভায় আর-এক বিচারে।

আটটি লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যেকবারই যে একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় বসেছে, তার কারণ সাধারণ ভোটার চান কেন্দ্রে একটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সুস্থিত সরকার। এবং সাধারণ ভোটারের ধারণা আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় বহুদলীয় সরকার সুস্থিত হতে পারে না। কোনো দেশেই সম্ভবত হয় না। দুটি বা বড়ো জোর তিনটি দলের কোয়ালিশন সরকার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দলের কোয়ালিশন সরকার পশ্চিমের অগ্রসর গণতন্ত্রগুলিতেও বেশি দিন টেকে না। আমাদের দেশের সাধারণ ভোটার নিশ্চয়ই ফ্রানসের চতুর্থ রিপাবলিক বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইতালির রাজনৈতিক অ-স্থিতির খবর রাখেন না, রাজনৈতিক সাধারণ বুদ্ধির বশেই তাঁরা সার্ধ তিন দশক এইভাবে ভোট দিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের কোনো সত্যিকারের বিকল্প না থাকার জন্য কেন্দ্রে একদলীয় সুস্থিত সরকার গঠনের জন্য তাঁরা বারবার কংগ্রেসকেই মনোনীত করেছেন। একবারই মাত্র সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের বিকল্প একটি দলের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সেবার দেশশাসনের সনদ সেই দলেরই মিলেছিল। জনতার ঐক্য স্থায়ী না হওয়ায় ১৯৭৭-এর সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে, কিছু ভোটার অনন্যোপায় হয়ে কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে আসছেন, এবং যতদিন দেশে কংগ্রেসের সত্যিকারের বিকল্প কোনো রাজনৈতিক দল দেখা না দেবে, ততদিন তাঁরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে যাবেন।

এই ধরনের একদলীয় গণতন্ত্র সে সাধারণ ভোটারের মনঃপূত নয় তার পরিচয় পাওয়া যায় রাজ্যস্তরে বিধানসভা নির্বাচনে। রাজনৈতিক স্থিতির জন্য যে-ভোটার কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ভোট দেন, তিনিই আবার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসবিরোধী কোনো দলকে ভোট দেন। এই প্রবণতা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করা যাচ্ছিল, গত মার্চ মাসের নির্বাচনগুলিতে তা খুব প্রকট হয়ে পড়েছে। ডিসেমবর মাসে লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটকের ২৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ২৪টি, আর জনতা চারটি। সেই হিসাবে মার্চ মাসের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাধিক্য পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। বিধানসভা নির্বাচনে ২২৪টি আসনের মধ্যে ১৯৩টি আসন দখল করে জনতা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, আর কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৬৬টি আসন—১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে ১৬টি আসন কম। কর্ণাটকে লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের বেশ একটি বড়ো অংশ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট না দিলে কংগ্রেসের এই বিপর্যয় হত না। কর্ণাটকের ভোটাররা ডিসেমবর মাসে জেনে-বুঝে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন, আবার ঠিক সেইভাবেই তাঁরা মার্চ মাসে তাঁদের রাজ্যে কংগ্রেসের বিকল্প জনতাকে ভোট দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় নি বটে, কিন্তু লোকসভার তুলনায় অনেক খারাপ ফল করেছে। মহারাষ্ট্রে লোকসভার ৪৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৩টি আসন, কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে ২৮৮টি আসনের মধ্যে পায় ১৬২টি আসন। এক্ষেত্রেও লোকসভায় যাঁরা কংগ্রেসি ভোটার, বিধানসভায় তাঁদের অনেকে কংগ্রেস-বিরোধী ভোটার। গুজরাতই সম্ভবত একমাত্র রাজ্য যেখানে কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনেও লোকসভার মতোই ভালো ফল করেছে।

কর্ণাটকের মতো আরও দুটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছে—অন্ধ্রপ্রদেশে আর সিকিমে। তবে কর্ণাটকের সঙ্গে এই দুটি রাজ্যের তফাত

এই যে সিকিমে আর অন্ধ্রে লোকসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল। সিকিম ক্ষুদ্র রাজ্য, তার রাজনীতিও স্বতন্ত্র। লোকসভায় সিকিমের আসন একটিমাত্র এবং সেই একটি আসনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কোনো বৃহত্তর অর্থ নেই। অন্ধ্র সম্পর্কে এ-যুক্তি খাটে না। অন্ধ্রে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে তেলুগু দেশম্ পেয়েছিল ২৮টি আসন আর তার সহায়তায় পাঁচটি অকংগ্রেসি দল পেয়েছিল আরও পাঁচটি আসন। কংগ্রেস পায় মাত্র ছয়টি আসন। বিধানসভা নির্বাচনে তেলুগু দেশম্ পেয়েছে ২৯২টি আসনের মধ্যে ২০২টি আসন, আর কংগ্রেস ৪৯টি আসন। কর্ণাটক আর অন্ধ্রের তফাত এই যে, কর্ণাটকে ভোটাররা লোকসভা নির্বাচনে একরকম ভোট দিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচনে আর-একরকমে। অন্ধ্রে ভোটাররা দুটি নির্বাচনেই এক রকমে ভোট দিয়েছেন, কেন্দ্রে যাতে সুস্থিত সরকার নির্বাচিত হতে পারে তার জন্য লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দেন নি। বরং যে-দলের কেন্দ্রে ক্ষমতালাভের কোনো সম্ভাবনা নেই, লোকসভায় যার পূর্বনির্দিষ্ট স্থান বিরোধীপক্ষে, তেমন একটি দলকে তাঁরা ভোট দিয়েছেন।

সব রাজ্যেই কিছু ভোটার আছেন যাঁরা আদর্শগত কারণে ভোট দেন, তার মধ্যে যে-দলের পরাজয় অনিবার্য সে-দলকে ভোট দিতেও তাঁরা পশ্চাৎপদ হন না। এ'দের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ অ-রাজনৈতিক ভোটারের যে দল জয়ী হবে সেই দলকে ভোট দেওয়ার একটি প্রবণতা থাকে। অন্ধ্রে লোকসভা নির্বাচনে সেই প্রবণতাও কাজ করে নি, অন্ধ্রের সাধারণ ভোটার যে দলের কেন্দ্রে ক্ষমতা লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই সেই দলকে জেনেশুনে ভোট দিয়েছেন। সেই দল তথাকথিত জাতীয় দলও নয়। তার কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী বা লক্ষ্যও নেই। এহেন একটি দলকে অন্ধ্রের সাধারণ মানুষ ১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে, ১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে, এবং আবার ১৯৮৫-র বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী করিয়েছেন এই প্রত্যাশায় যে তেলুগু দেশম্ অন্ধ্রকে কেন্দ্রের অবহেলা আর বঞ্চনা থেকে রক্ষা করবে, অন্ধ্রের লাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বকে আবার পুরনো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। এইসব অভিযোগের কোনটি সত্যি, কতটা সত্যি এবং সত্যি হলেও শুধু অন্ধ্রের প্রতি এই অন্যায় আচরণ, না অন্য অনেক রাজ্যেরও অনুরূপ অভিযোগের কারণ আছে, তা না ভেবেই অন্ধ্রের সাধারণ মানুষ এক বছরের নবজাতক একটি পার্টিকে ১৯৮৩ সালে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। তার পরে একটি লোকসভা আর আর-একটি বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁরা অনন্যচিত্তে সেই দলকে সমর্থন করেছেন। এই সমর্থনের বনিয়াদ এতই দৃঢ় যে ডিসেমবর মাসে লোকসভা নির্বাচনে যখন সারা দেশে বিরোধী দলগুলি পর্যুদস্ত, তখনও অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশম্ অটল থেকেছে।

আঞ্চলিক দলের ক্ষমতা অধিকার অন্ধ্রপ্রদেশেই প্রথম ঘটে নি। এ-ব্যাপারে পথিকৃৎ তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজঘম, সংক্ষেপে ডি এম কে। ডি এম কে ১৯৬৭ সালে ক্ষমতা লাভ করে, কিন্তু ডি এম কে-র আন্দোলন এবং প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল অনেক দিন ধরে। ডি এম কে পরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ডি এম কে এবং আন্না ডি এম কে—দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তামিলনাড়ুতে ক্ষমতা আর কংগ্রেসের করায়ত্ত হয় নি। এই দুটি দলের কেন্দ্র-বিরোধিতাও তেলুগু দেশম্-এর মতো তীব্র নয়, দুটি দলই কোনো-না-কোনো সময় কংগ্রেসের সহযোগী হয়ে নির্বাচনে নেমেছে। দ্রাবিড় আন্দোলন মূলত ছিল ভাষা-ও সংস্কৃতি-ভিত্তিক, এবং তার দ্বন্দ্ব ছিল হিন্দি সম্প্রসারণবাদের সঙ্গে। এই আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদের আকার নিতে পারে, এ-আশঙ্কা যে কখনও দেখা দেয় নি তা নয়, কিন্তু তামিলনাড়ুর প্রথম ডি এম কে মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাইয়ের নেতৃত্বগুণে এই আশঙ্কা অল্প দিনেই দূর হয়।

তামিলনাড়ু আর অন্ধ্রপ্রদেশে তফাত এই যে, তামিলনাড়ুতে দীর্ঘ সংগ্রামের পর কংগ্রেস আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে কোনো সংগ্রামই হয় নি। ১৯৮৩ সালের বিধানসভার নির্বাচনে যোগ দেওয়ার জন্য তেলুগু দেশম্-এর সৃষ্টি, এবং প্রথম নির্বাচনেই তার সাফল্য। তামিলনাড়ুর মতোই শুধু কংগ্রেস নয়, সব তথাকথিত সর্বভারতীয় দলই এখন সেখানে বিপর্যস্ত। রাম রাও কেন্দ্রের হাতে অন্ধ্রের লাঞ্ছনার অবসান ঘটাবেন, অন্ধ্রের অপমানিত ব্যক্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, এই প্রতিশ্রুতির জোরে শুধু রাজ্যস্তরে ক্ষমতা দখলই করেন নি, লোকসভা নির্বাচনেও তাঁর রাজ্যের সাধারণ মানুষকে তাঁদের চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা করে কেন্দ্রে এক-

দলীয় সুস্থিত সরকার গঠনের পরিপন্থী আচরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

অন্ধ্রে রাম রাও-এর এই অনায়াস সাফল্য আমাদের রাজনীতিতে একটি নতুন ভাবনা আমদানি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, ক্ষমতালাভের এত সহজ আর নিশ্চিন্ত উপায় থাকতে সংগ্রাম আর সংগঠনের দীর্ঘ এবং অনিশ্চিত পথে ক্ষমতালাভের চেষ্টার প্রয়োজন নেই। জাতীয় দলগুলির যদি সত্যিই সর্বভারতীয় অস্তিত্ব থাকত তাহলে এই ভাবনা তত প্রশ্রয় পেত না। জাতীয় দলগুলি অন্ততঃ এই ভাবনা থেকে মুক্ত থাকত, এবং ভোটারদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসবিরোধী কোনো দলকে ভোট দিতে চান, অথবা লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে দুটি ভোট দুই দলকে দিতে চান, তাঁদের সামনে একটি বিকল্প থাকত। দীর্ঘকাল সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের বিকল্প একটি দলের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যভিত্তিক, আঞ্চলিক কোনো দলকে সমর্থন করবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অন্ধ্রে ১৯৮৩ সালে যা ঘটেছিল তা এই প্রবণতার চরম প্রকাশ, কিন্তু অন্য অনেক রাজ্যও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়।

আঞ্চলিক দল এবং আঞ্চলিকতার রাজনীতির ক্রমাবির্ভাব এদেশের সাধারণ মানুষের একাংশের কেবল কংগ্রেসকে বর্জনের পরিচায়ক নয়, সব-কটি জাতীয় দলকে বর্জনেরও পরিচায়ক। কিন্তু এই দলগুলি কংগ্রেসের পরাজয়ে এতই উৎফুল্ল যে তারা ভেবে দেখছে না যে আঞ্চলিকতাবাদের প্রসারে তাদের বিপদ কংগ্রেসের চেয়ে বেশি। কংগ্রেসের তবু হারানোর মতো কিছু প্রভাব, কিছু আসন আছে ; কংগ্রেস কিছুদিন যুঝতে পারবে। আর তাদের যা সামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, আঞ্চলিকতার প্রথম ধাক্কায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অন্ধ্রে তাই হয়েছে। সেখানে রাম রাও-এর সঙ্গে লড়াই করে বিধানসভায় অস্তিত্ব বজায় রাখবার ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে, আর সব দলকে, মায় তেলেঙ্গানার বিপ্লবী দলকেও রাম রাও-এর হাততোলায় বিধানসভায় স্থান পেতে হচ্ছে। এইসব দলের রাম রাও-এর সঙ্গে জোট বাঁধবার কোনো কারণ নেই, তারা শুধু দু-একটি আসনের লোভে তাঁর সমর্থনপ্রার্থী হচ্ছে আর এই রাজনৈতিক উঞ্ছবৃত্তিকে আদর্শের মোড়কে পুরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

যেসব রাজ্যে ইতিমধ্যেই আঞ্চলিকতাবাদী দল প্রভাব বিস্তার করেছে, সেখানে সর্বভারতীয় বিরোধী দলগুলির সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। হয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতায় আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতিকে পরাস্ত করা, না হলে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সহযোগিতায় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে পরাস্ত করা। বিরোধী দলগুলি এই দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে, কেননা কংগ্রেসকেই তারা প্রধান শত্রু মনে করে। আর যেসব রাজ্যে কোনো পরাক্রান্ত আঞ্চলিকতাবাদী দলের আবির্ভাব হয় নি, সেখানে এই দলগুলি যে যার শক্ত ঘাঁটিতে কমবেশি আঞ্চলিকতার রাজনীতি আমদানি করে কংগ্রেসকে পরাস্ত এবং আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব বন্ধ করতে চাইছে।

বিরোধী দলগুলির শক্তিবিন্যাস এই ধারাকে সাহায্য করছে। সি পি এম-এর নেতৃত্বে বামপন্থী শক্তি প্রধানত তিনটি রাজ্যে—কেরল, পশ্চিম বাঙলা আর ত্রিপুরায় সীমাবদ্ধ। শালকিয়া প্লেনাম আর বিজয়ওয়াড়া কংগ্রেসে সি পি এম দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে হিন্দি এলাকায়, তার সম্প্রসারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু সেই চেষ্টার যে বিশেষ কোনো ফল হয় নি, তা নির্বাচনের ফল থেকেই বোঝা যায়। হিন্দি এলাকায়, বিশেষত বিহারে, সি পি আইয়ের বেশ প্রভাব ছিল, কিন্তু এবারের নির্বাচনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেখানেও সি পি আইয়ের শক্তি অনেক হ্রাস পেয়েছে। অন্য সর্বভারতীয় বিরোধী দলগুলিরও এইরকম নিজস্ব এলাকা আছে। ডি এম কে, লোকদল আর বি জে পি-র প্রভাব মোটামুটি হিন্দি এলাকায় সীমাবদ্ধ। এই এলাকায় তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয় নি ; তবে মোটামুটি বলা যায়, বিহার, উত্তর প্রদেশ আর হরিয়ানায় ডি এম কে পি বা লোকদল প্রধান অকংগ্রেসি পার্টি, আর মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান আর হিমাচল প্রদেশে এই স্থান বি জে পি-র। মহারাষ্ট্রে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস(স)। কর্ণাটকে মার্চ মাসের বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জনতা পার্টি তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ১৯৭৭-৮০-র সংযুক্ত জনতার কাল বাদ দিলে বিধানসভায় সর্বভারতীয় একটি বিরোধী দল এই প্রথম একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। অবশ্য সি পি এম-ও এই

কৃতিত্ব দাবি করতে পারত যদি না বামফ্রন্টের শরিক হিসাবে ১৯৭৭ আর ১৯৮২-র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত।

আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি পুরোপুরি গ্রহণ করবার আগে সর্বভারতীয় দলগুলিকে মন স্থির করতে হবে যে তারা জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের বিকল্প হওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে, এবং একটি বা দুটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেই সন্তুষ্ট থাকবে। কেননা এক রাজ্যে আঞ্চলিকতার স্লোগান যেমন দলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে পারে, তেমনি সেই স্লোগান অন্য রাজ্যগুলিতে তার জনপ্রিয়তা কমাবে। কোনো সর্বভারতীয় বিরোধী দলই এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত মন স্থির করে উঠতে পারে নি, তাই তারা একই সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদী স্লোগান তুলছে তাদের নিজস্ব এলাকায়, আবার অন্যত্র তার পরিপন্থী কথাও বলছে। তার জন্য পশ্চিম বাঙলার উপর কেন্দ্রের অবিচার নিয়ে এ-রাজ্যের বাইরে সি পি এম কোনো আন্দোলন গঠনের চেষ্টা করে না, অন্যত্র তার দাবি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের। গত দশকে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিম বাঙলা কেন্দ্রের উপনিবেশ হয়েছিল। এই স্লোগানের তাৎপর্য বোঝবার পর সি পি এম-ই এ-রাজ্যকে ঔপনিবেশিকত্ব থেকে মুক্তি দেয়। কলকাতা মুমূর্ষু, এই উক্তির প্রতিবাদে এই রাজ্যেই আন্দোলন গড়ে তোলা হয়, অন্য রাজ্যে হয় না, কেননা অন্যত্র কলকাতার সার্বিক অবক্ষয় সম্পর্কে দ্বিমত নেই। এই আধা-আঞ্চলিকতাবাদী নীতি অবশ্য বেশি দিন চলতে পারে না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সর্বভারতীয় বিরোধী দলগুলিকে স্থির করে ফেলতে হবে যে তারা জাতীয় দল হিসাবে সংগঠন আর আন্দোলনের দীর্ঘপথ অনুসরণ করে কংগ্রেসের বিকল্প হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী থাকবে, না তাৎক্ষণিক লাভের জন্য তাদের উচ্চাশাকে খর্ব করে আঞ্চলিকতার রাজনীতির সাহায্যে একটি বা দুটি রাজ্যে ক্ষমতা অধিকার করবে, এবং অধিকৃত ক্ষমতা বজায় রাখবে। তাদের সামনে দুটি মডেল—একটি কংগ্রেস আর একটি তেলুগু দেশম্ ; একটিকে তাদের বেছে নিতে হবে। কংগ্রেসি মডেলে সাফল্য সহজে আর শীঘ্র হওয়ার নয়, তেলুগু দেশম্-এর মডেলে দুটিই সম্ভব।

স্বাধীনতা-লাভের প্রায় চার দশকে কংগ্রেসের বিকল্প কোনো সত্যিকারের সর্বভারতীয় দল গঠনে অপারগতা আমাদের রাজনীতির আর রাজনীতিকদের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা। কেন্দ্রে একটি দলের দীর্ঘকালের আধিপত্যে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। অবশ্য এরকম দীর্ঘ একদলীয় নেতৃত্বের নজির পশ্চিমের অগ্রসর গণতন্ত্রগুলিতেও পাওয়া যায়, তবে সেখানকার বিরোধী দলগুলির অবস্থা আমাদের দেশের মতো নয়। সেখানে দীর্ঘকালের ব্যবধানে হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। এবং এই সম্ভাবনা থাকবার জন্য দীর্ঘকালের ক্ষমতাসীন দলও সহসা গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি লঙ্ঘন করে না। আমাদের দেশে কার্যত সে সম্ভাবনা না থাকায় গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি পালিত হওয়া না-হওয়া একান্তভাবেই কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে—একসময় জওহরলাল নেহরুর উপর করেছে, সেদিন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর উপর করেছে, এখন করছে রাজীব গান্ধীর উপর। গণতান্ত্রিক নীতি এবং রীতির প্রতি এঁদের আনুগত্য যদি অবিচল না থাকে, তাহলে তাঁরা গণতন্ত্রের নামে যথেচ্ছাতন্ত্র সহজেই চালু করতে পারেন। যেখানে দল একটি, আর দলের নেতা সমষ্টি নয়—একজন, সেখানে গণতন্ত্রের বিপদ সমধিক।

এই আশঙ্কা নিরসনের যে চেষ্টা চলছে তার কার্যকারিতা সম্পর্কেও সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অদূর ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনে কোনো একটি দলের কংগ্রেসকে পরাস্ত করে ক্ষমতা অধিকারের কোনো সম্ভাবনা নেই, এই রূঢ় বাস্তবটিকে মেনে নিয়ে বিরোধী দলগুলি এখন চেষ্টা করছে নিজ-নিজ এলাকায় রাজ্যস্তরে কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে। সব রাজ্যই যদি অন্ধ্রপ্রদেশকে অনুসরণ করে তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে কেন্দ্রেও ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু তাতে যে কংগ্রেসের বিকল্প সৃষ্টি হবে না, একথা কেউ মনে রাখছেন না। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রে কংগ্রেসের বদলে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এরকম মন্ত্রিসভার সদস্য-দলগুলির পরস্পরবিরোধিতা এতই তীব্র হবে যে সে মন্ত্রিসভা সুস্থিত হবে না। আমাদের সংবিধানে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতিশাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই, কাজেই কেন্দ্রে সুস্থিত মন্ত্রিসভার অভাবে নতুন নতুন কোয়ালিশন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা আর ঘনঘন নির্বাচন অনিবার্য হয়ে উঠবে। সে অবস্থাও গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

এই রাজনৈতিক গণনায় এদেশের সাধারণ ভোটদাতার রাজনৈতিক সচেতনতাকে ধরা হয় নি। অন্ধের সাধারণ ভোটার যেমন ডিসেমবর মাসের লোকসভা নির্বাচনে আর মার্চের বিধানসভা নির্বাচনে—দুয়েতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, তেমনি কর্ণাটকের সাধারণ ভোটার ডিসেমবরে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন কেন্দ্রের শাসকদল হিসাবে, আর মার্চ মাসে নির্বাচিত করেছেন জনতাকে রাজ্যের শাসকদল হিসাবে। অন্ধ্র আর কর্ণাটক দুটি স্বতন্ত্র নজির স্থাপন করেছে। রাজ্যস্তরে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে পারলেই কেন্দ্রেও যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবে, তার কোনো স্থিরতা নেই। তা নির্ভর করবে এদেশের সাধারণ ভোটার কর্ণাটকের নজির অনুসরণ করবেন, না অন্ধ্রপ্রদেশের।

কোনো বিকল্প দলের অভাবে কংগ্রেসের অনির্দিষ্ট কালের জন্য কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাও আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর না হতে পারে। একদলীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিপথগামিতার সম্ভাবনা তো আছেই। নেতৃত্বের গুণে সেই বিচ্যুতি যদি নাও ঘটে, তাহলেও দলের সংহতি নষ্ট হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে সে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে সম্ভাবনা দূর হয় নি। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে গত বছর আবার সেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব বিজয় সত্ত্বেও সে আশঙ্কা দূর হয়েছে বলা যায় না। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বগুণে এখনও পরীক্ষিত হয় নি। এই পরীক্ষায় যদি রাজীব উত্তীর্ণও হন, তাহলেও আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থাকবে যতদিন না কংগ্রেসের বিকল্প একটি সর্বভারতীয়, সত্যিকার জাতীয় দলের আবির্ভাব হয়, একদলীয় গণতন্ত্রের বদলে দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। একাজ একমাত্র বিরোধী দলগুলিই সম্পন্ন করতে পারে। তারা কংগ্রেস শাসনে আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু সত্যিই যদি গণতন্ত্র বিপন্ন হয় তাহলে তার জন্য কংগ্রেসের বিকল্প একটি দল গঠনে তাদের ব্যর্থতাও কিছু কম দায়ী হবে না।

পৃথিবীর অসুখ

উৎপলকুমার দত্ত

পূবদিকের জানলা খোলা পেয়ে একমুঠো নিরুত্তাপ রোদ বালিশের ওপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। নবনীতা ধড়মড় করে উঠে বসে ঘড়ি দেখল। বেলা সাতটা। সুশান্ত চোখের ওপর হাত রেখে এমন করে শুয়ে আছে যে মনে হয় এখনই উঠে পড়বে। কিন্তু তা নয়। না ডাকলে ও উঠবেই না, এমনই গাঢ় ঘুম ওর। তারপর কাল রাত দশটা পর্যন্ত হৈ-হল্লা হয়েছে। সেটা আরো গভীর রাত পর্যন্ত চলতে পারত। সুশান্তর সেরকমই ইচ্ছে ছিল। মেয়েদের আপত্তিতে রয়েল চ্যালেনজের বোতলটা আর শেষ অবধি বার করতে পারে নি সুশান্ত। তাহলে আর দেখতে হত না।

নবনীতা খাট থেকে নামল। আর একটু পরেই ঠিকে ঝি আসবে। কাল রাতের সব বাসনপত্র তো পড়েই আছে। খাবারদাবার যা বেঁচেছে তার থেকে একটু দিয়ে প্রসন্ন করে ওকে কাজ করাতে হবে। আজকাল ওদের যা মেজাজ! মুখটুখ ধুয়ে এসে নবনীতা ফ্রিজ খুলল। ফ্রিজের ভেতরটা নীল। এবং ঠাণ্ডা বরফের ভাপে ঈষৎ অস্বচ্ছ। ভাপটা কেটে গেলে নবনীতার চোখে পড়ল মহার্ঘ সব খাবারে সারা ফ্রিজ ভরতি। মাটন কাটলেট, ডিমের ডেভিল, ঘুগনি, সন্দেশ, আপেলের কাস্টার্ড—সবই বেঁচেছে। এবং সবই বেশি পরিমাণে। সুশান্তর এইরকমই আয়োজন। অপচয়টা গায়েই মাখে না। লোকদেখানো ভাবটা ওর আর গেল না। কাল রাতে কম করে প্রায় সাতশো টাকা বেরিয়ে গেছে ওর। নবনীতা অবশ্য জিজ্ঞেস করে নি। করলেও সুশান্ত সত্যি হিসেবটা দেবে না।

এখন কী করা যায়? এই যে এত সব খাবার বেঁচেছে, তারা দুটি প্রাণীতে কত খেয়ে শেষ করবে? কাল রাতের পর এমনিতেই খিদেটা মরে আছে। এ প্রায় সাত-আটজনের খাবার। ঠিকে ঝি মালতীকে না হয় দুজনের মতো খাবার দেওয়া যাবে, কিন্তু বাকি সব কী হবে!

নবনীতা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। ভিখিরি-টিখিরি গেলেই ডাকতে হবে। ওরা তবু খেয়ে বাঁচে। নষ্টটা গায়ে লাগবে না। আহা! খেতে পায় না সব!

এই পার্টি-টার্টি ব্যাপারটা একদমই ভালো লাগে না নবনীতার। সে সেকেলে ধরনের মেয়ে। ইতিহাসে এম.এ. পাস করলেও ইংরেজিটা তেমন দুড়দাড় বলতে

পারে না। অথচ পার্টিতে দু-চারজন অবাঙালি দম্পতি থাকবেনই। মিঃ মিসেস পুরী, মিঃ মিসেস শ্রীনিভাসন ইত্যাদি। তা ছাড়া পার্টি মানেই দু-চারটে বস্তাপচা জোকস, হো হো করে হেসে ওঠা, ছাবলামি—নবনীতার আদৌ ভালো লাগে না। সে সেকেলে ধরনের মেয়ে, বিয়েও হয়েছিল তার অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত সুশান্তর সঙ্গে। গত পাঁচ বছরে সেই মানুষটাই কেমন পালটে গেল, কত অন্যরকম হয়ে গেল! তরতর করে প্রোমোশনের সিঁড়ি বেয়ে যেখানে উঠে এল, সেখানে নবনীতা নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সুশান্ত স্বভাবতই বিরক্ত হয়। নবনীতা বুঝতে পারে।

পাঁচ-দশ মিনিট গেল। একটাও ভিখিরিগোছের কাউকে দেখা যায় না। মালতীও এখনও পর্যন্ত কাজে এল না। ব্যাপারটা কী? সুশান্তকে এইবার ডাকতে হবে। চায়ের জল চাপিয়ে দিল নবনীতা। আজ শনিবার। সুশান্তর অফ। তবে কী-সব জরুরি কাজে ওকে আজ অফিস যেতেই হবে।

কাল রাত দশটায় অতিথিরা যাবার পর ওরা উপহারের সামগ্রী নিয়ে বসেছিল। কাল ছিল ওদের বিয়ের তারিখ। এই কলকাতা শহরে সুশান্তর নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই। মা বাবা অনেক কাল গত হয়েছেন। এক বড়ো দিদি থাকেন পাটনায়। দুই মামা আর তাঁর পরিবারেরাও বাইরে। আর নবনীতার মা বাবা বাড়ির লোকেরা রবিবার সকালে খাবেন। কাল রাতে শুধু অফিসের কয়েকজনকেই বলা হয়েছিল। আজকাল সুশান্তর ধ্যানজ্ঞান হল অফিস। আত্মীয়-স্বজন সামাজিকতার ব্যাপারটুকু সে নবনীতার ঘাড় দিয়ে চালায়। এই যে কাল নবনীতার বাপের বাড়ির লোকেরা আসবেন, তা-ও সুশান্তর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে, সে থাকবে না।

অনেক উপহার পেয়েছে তারা। সবচেয়ে ভালো দিয়েছেন মিঃ মিসেস ব্যানার্জী। ইমপোর্টেড শরবত সেট একটা। ভারি চমৎকার জিনিসটা। আর মিঃ চৌধুরীর দেওয়া গ্যাস লাইটারটাও সত্যি দারুণ। এরকম একটা জিনিসের খুব শখ ছিল সুশান্তর।

জিনিসপত্র, খাবারদাবার সব গুছিয়ে তুলতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় বারোটা হবে। শোবার আগে স্নান করা অনেক দিনের অভ্যাস। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর স্নান সেরে বিছানায় আসতেই চোখটা তাই আঠার মতো জুড়ে এসেছিল নবনীতার। সুশান্ত তখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। তবে একটু পরে ঘুমের মধ্যেও সে বুঝতে পেরেছিল সুশান্ত কী চাইছে, সুশান্ত তার শরীরের কোথায় কোথায় হাত রাখছে।

জড়িতস্বরে সে বলে, এই, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—আজ ছাড়ো।

সুশান্ত কানের কাছে মুখ এনে বলে, আজকে কত তারিখ নীতা? পাঁচ বছর আগে এমনি একরাতে তোমার ঘুম এসেছিল?

সে সলজ্জ স্বরে বলে, জানি না। যাও—

তারপর নবনীতা পাশ ফেরে। সুশান্ত তাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে শরীরটাকে কাঠ-কাঠ করে রাখে। কিন্তু অনুভব করে সুশান্ত তার শরীরে লেপটে রয়েছে, তাকে উত্তেজিত করতে চাইছে, আকর্ষণ করতে চাইছে।

ঘুমজড়ানো স্বরে সে বোধহয় বলেওছিল, এই, আজ থাক। কাল ঠিক—

—কী ঠিক?

—জানি না।

একথায় সুশান্ত হেসেছিল, না বিরক্ত হয়েছিল—তা সে বলতে পারবে না, তবে সে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। অবশ্য সুশান্ত মাঝে-মাঝে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায়ও আদর করে। কাল সেরকম করেছিল কিনা সে বলতে পারবে না। দিনের বেলায় এসব নিয়ে তাদের কোনো কথাবার্তা আজকাল হয় না। অতএব সেটা অজানা থেকে যাবে। আগে অবশ্য এরকম ছিল না।

চায়ের কাপ নিয়ে সুশান্তকে ডেকে তোলে নবনীতা। তারপর ব্যালকনিতে এসে তাকায় দুধারে। না, ভিখিরির চিহ্ন নেই। ভিখিরিরা গেল কোথায়!

মালতীও কাজ করতে এল বেলা করে। এত বেলা করেই না কোনোদিন।

নবনীতা রাগের সুরে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে মালতী—এত বেলা আজ? কত বাসন পড়ে আছে দ্যাখ তো।

মালতী উত্তেজিত স্বরে বলে, আর বোলো না বউদি, ভোরবেলায় বস্তিতে যা কাণ্ড আজ!

—কেন রে, কী হয়েছে?

—আর বোলো না। রেলব্রিজের কাছে হার ছিনতাই হয়েছিল কাল সন্ধেবেলায়। পুলিশ এসে আমাদের বস্তির নিতাই আর সতীশ হালদারের ছোটো ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে, ওরা এই কদিনই জেল খেটে এল সবে—দুদিনও হয় নি।

—ওমা, দাগি চোর নাকি?

—তা নয়তো আবার কী গো? নিতাইয়ের বউ গায়ে কেরাচিন তেল ঢেলে মরতে গিয়েছিল। আমরা সব গিয়ে মিটমাট করি—মনে শান্তি নেই ভাতারের জন্যে যে।

—বস্তিতে তোদের অনেক কাণ্ড হয় দেখছি।

—খুনে গুন্ডাদের সব বাস। দিনে রিকশা চালায়, রাতে ছিনতাই। রেলগাড়ির থেকে মাল চুরি, লাশও ফেলে দেয় কত। সে আর কী বলব তোমায় বউদিদি—

নবনীতা শিউরে উঠে বলে, ইশ মাগো। কাজ করে না কেউ?

—ওইসব করে। আর ফুর্তি লোটে। দামি প্যানট জামা, হাতে ঘড়ি। এই তো আমাদের সামনেই থাকে বটুক। সিনেমার টিকিট বেলাকে বেচে কত রোজগার করে। ওর বউও যায় সঙ্গে রোজ। বউ মানে অবিশ্যি ভাগিয়ে আনা। বটুকের আবার বিয়ে! হি হি—

এসব শুনতে তেমন ভালো লাগে না নবনীতার। পৃথিবীতে অনেক অপ্রিয় অশালীন ব্যাপার ঘটছে রোজ। নবনীতা নিজেকে তার সংস্পর্শ থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চায়। সে চায় ফুলের বাগানের মতো পবিত্র এবং রমণীয় এক পৃথিবীতে বাস করতে। যেখানে নোংরামি নেই, নীচতা নেই। এই যে ভিখিরিদের খাবার-দেবার জন্য সে বারবার ব্যালকনিতে এসে রাস্তার দিকে চাইছে—এর মধ্যে যে মহত্ত্বের অনুভূতিটুকু রয়েছে, তা তার ভালো লাগে। ছেলেবেলায় সে দেখেছে তার দাদু প্রতি রবিবার সকালে খুচরো পয়সা নিয়ে বারান্দায় বসে থাকতেন। প্রতিটি ভিখিরিকে ভিক্ষা দিতেন। দাদু এক শনিবার রাতে মারা যান। তা সেই রবিবার সকালেও ভিখিরিরা তাদের নন্দন রোডের বাড়ির দরজার সামনে এসে যথারীতি হাত পেতেছিল—'বাবা দুটি ভিক্ষে দাও গো'। কিন্তু তাদের সে ডাকে সেদিন আর কেউ কর্ণপাত করে নি।

তবে আজ ভিখিরি একটাও নেই। নবনীতা রান্না চাপিয়ে বারবার এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। সুশান্ত বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়বে, তারপর স্নানটান সেরে আবার বেরিয়ে যাবে। বাড়িতে থাকে কতটুকু?

মালতীকে খাবার দিয়ে দিল নবনীতা। তবুও কত পড়ে আছে। নিজেদের মতো কিছু রেখে দিয়েও অনেক। কাল বাপের বাড়ির লোকেরা আসবে, তাদের জন্য আলাদা আয়োজন। এইসব বাসি খাবার দিলে তাদের অপমান করা হবে। সে হয় না।

ওই একটা বুড়ো ভিখিরি আসছে না! ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে দেখল নবনীতা। না তো। এমনই একটা লোক। গরিব বটে। তবে ভিখিরি নয়। ভোট আসছে সামনে। উলটো দিকের বাড়ির দেওয়ালে কত বড়ো স্লোগান। দেশের দারিদ্র্যের আর সমস্যার নানা খতিয়ান। আর-এক দেওয়ালে আবার লেখা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির হিসেব। আর সব দেওয়ালেই—সব স্লোগান আর সব বৃত্তান্তের নীচেই বড়ো-বড়ো করে লেখা—ভোট দিন। আমাদেরই ভোট দিন। আমরা আপনার ভোটপ্রার্থী।

ব্যালকনিতে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে এইসবই দেখল নবনীতা। তারপর ঘরে এল। সুশান্ত বাথরুম থেকে এসেছে। এখন আর-এক কাপ চা চাই। চায়ের সঙ্গে কাগজটা পড়বে।

নবনীতা চা নিয়ে এলে সুশান্ত গম্ভীরভাবে চাটা নেয়। কাগজটা মেলে ধরে চোখের সামনে। নবনীতা এক মিনিট দাঁড়ায়। যদি সুশান্ত কিছু বলে! কিন্তু না। অথচ আগে এরকম ছিল না মানুষটা!

এর মধ্যে দুবার টেলিফোন এল। দুটোই রং নাম্বার। কাল পর্যন্ত লাইনটা ডেড ছিল। নবনীতা সুশান্তর হাতে ধরা কাগজটার হেডলাইনগুলো দেখে। মানিকতলায় ফ্ল্যাটে ডাকাতির খবর বেরিয়েছে। ছবিও ছাপা হয়েছে। কী হল দেশটার! এই দুদিন আগেই ছিল একটা বড়ো ব্যাঙ্ক ডাকাতির খবর।...

রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে যাচ্ছে। মুখটা চেনা। লাইনের ওধারে থাকে। এ পাড়ায় দু-চারজনের গাড়ি ধোয়। কিন্তু হাতের ঘড়ি আর দামি জামা জুতোর বহর দেখলে সন্দেহ হয়। শুধু গাড়ি ধুয়েই এত স্বচ্ছলতা আসে কোথা থেকে? নবনীতার আবছাভাবে মনে হয় যে এদের চেহারা আর চাহনি ঠিক সহজ সরল নয়।

ঘরে আসতেই সুশান্ত সোজাসুজি প্রশ্নটা করে—কাল পার্টিতে দেবাশিস তোমার সঙ্গে অত কী গল্পসল্প করছিল, বলো তো? তোমাকে তো ছাড়াছিলই না—

প্রশ্নটার ধরনে প্রথমটা নীল হয়ে যায় নবনীতা। তারপর সামলে নিয়ে বলে, গল্প আবার কিসের। এমনি সব নানা কথাবার্তা। কেন, ওর সঙ্গে গল্প করায় দোষের কিছু আছে?

সুশান্ত কাষ্ঠ হেসে বলে, আজকাল অফিসে ও তোমার প্রশংসা প্রায়ই করে।

—বউয়ের প্রশংসা শুনতে তোমার ভালো লাগে না বুঝি?

—লাগে, কিন্তু পরপুরুষের মুখে নয়।

—সে যদি কেউ করেও থাকে, আমি বাধা দেব কেমন করে?

—বাধা দেওয়ার প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল, সাহসটা পেল কোথা থেকে?

—তুমি এত জেলাস? এটা জেনেও ভালো লাগছে যে তুমি আমার জন্য খুব জেলাস। আজকাল তোমাকে একদম বুঝতে পারি না।

—পার না? না চাও না?

—তার মানে?

—কাল রাতে ওরকম বিহেভ করলে কেন?

—কাল ঘুম পেয়েছিল। লক্ষ্মীটি, বিশ্বাস করো। আমার ঘুম তো তুমি জান।

—ওটা তোমার ভাণ। আসলে তুমি হয়তো তখন আমায় চাইছিলে না। লাইক করছিলে না।

সুশান্তর এই কথায় নবনীতার গা জ্বলে গেলেও সে মূক হয়ে রইল। চোখের জল চাপবার জন্য সে কিচেনে গেল। টেবিলে কত খাবার, ক—ত খাবার। সব ফেলা যাবে। কাল একটা পার্টি হয়ে গেছে, তাদের বিয়ের তারিখ, কত লোক এসেছিল। কত শুভেচ্ছা, কত অভিনন্দন। কত রঙ্গ-রসিকতা। কত পয়সার ছড়াছড়ি। সমাজের কেউকেটা লোক বলে নিজেদের মনে হচ্ছিল।

সুশান্ত ঘরে বসে সিগারেট ধ্বংস করছে, সামনে অফিসের ফাইলপত্র। ড্রইং-এর চার্ট খোলা। এরপর তো একটু পরেই সে বেরিয়ে যাবে। নীতার জন্য তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

নবনীতার সেই বিয়ের বছরের দিনগুলো মনে পড়ে। সেই সময়—যখন সুশান্ত যাদবপুরে দু-কামরার একটা ঘরে বাসা ভাড়া করে থাকত। এইট-বি বাসে ঝুলে-ঝুলে অফিস যেত। বাড়ির উঠোনে ছিল একটা পেয়ারাগাছ, জ্যোৎস্নারাতে সেখানে দুটি গোল চেয়ার পেতে বসে তারা আবোল-তাবোল কত কী বকত সে সময়। কলকাতা শহরে সবুজ চোখে পড়ে না। কিন্তু তাদের বাড়িটার পেছনে জমিতে একটা ডোবা ছিল। তাতে কচুরিপানার নীলাভ ফুল ফুটে থাকত। ধপধপে সাদা বক আসত কত উড়ে! তাল-নারকেল গাছের সারি আর সুনীল আকাশ—সব মিলিয়ে একটা ছবি। সে ছবি তারা দুজনে উপভোগ করত। সুখদুঃখে তারা ছিল পরস্পরের মর্ম-সহচর। কোথায় গেল সেদিন!

খেয়েদেয়ে সুশান্ত অফিস বেরিয়ে গেলে ভিখিরি-দের জন্য বারান্দায় উৎসুকভাবে চেয়ে থাকে নবনীতা। এর মধ্যে ধোপাটা এসেছিল, কিন্তু সে-ও বাসি খাবার খায় না ইত্যাদি বলে এড়িয়ে গেল। নেবে না। আসলে সকলেরই এখন খুব টনটনে প্রেসটিজ জ্ঞান।

কেবল সে-ই সব অপমান হজম করে যাচ্ছে। নইলে সুশান্ত আজ সোজাসুজি তাকে যেভাবে আঘাত করল—এরপর...

দরজায় কলিং বেলের শব্দ। নীচের তলার মাসিমা এসেছেন থারমোমিটার চাইতে। নাতির জ্বর। কথায়-কথায় বলেন, রিন্টুটার জ্বর, তার ওপর ভুল বকছে। ওদের ইস্কুলের একটা ছেলে নাকি বাড়ি ফেরার পথে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ছেলেটার বাবা দুটো চিঠি পেয়েছে। দশ হাজার টাকা ক্যাশ দিলে ছেলে ফেরত পাবে। দিনকাল কী হল বলো তো, মা? এসব আজকাল আকছার হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। যা-সব শুনছি, আর কাগজে পড়ছি তাতে হাত পা হিম হয়ে আসে। চলি মা—রান্নার পাট চুকেছে? এসো সময় করে একদিন—

—যাব মাসিমা, সন্ধেবেলাই রিন্টুকে দেখে আসব।

মাসিমা চলে যেতে না যেতেই ভোটপ্রার্থী একদল যুবক আসে। কাগজপত্র দেয়। আর বারবার করে বলে, এই চিহ্নে ছাপ দেবেন কিন্তু। সকাল-সকালই ভোটটা দিয়ে আসবেন বউদি। সুশান্তদা এলেও বলবেন। যদি দরকার হয় গাড়ি নিয়ে আসব। ভোট কিন্তু বউদি আমাদেরই—বুঝেছেন?

দে'তো হাসি আর প্রচ্ছন্ন শাসানির সুর মেশানো কথাবার্তাগুলো শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু শুনতে হয়। এরপর আর-এক পক্ষ আসবে। তারাও একপ্রস্থ অনুনয় বিনয় করে যাবে। শাসানির আর দে'তো হাসির সুর শুনতে হবে আবার।

সুশান্তর সকালবেলার ব্যবহারটা তপ্ত ছুঁচের মতো গায়ে বিঁধছে। ঘটনাটা খুবই আকস্মিক, আর সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তার গুরুত্বটা গভীর এবং ব্যাপ্ত। তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট মারাত্মক।

নবনীতার কান্না পাচ্ছিল, খুব কান্না পাচ্ছিল। তাদের এই পাঁচ বছরের দাম্পত্য জীবনটি খুব সাদামাটা হলেও কখনো সেখানে আজ সকালের মতো এত অপ্রীতিকর এত পীড়াদায়ক ঘটনা ঘটে নি। ইদানীং সুশান্তর ব্যবহারটা কিঞ্চিৎ নিস্পৃহ ঠেকছে। কিন্তু সেটা তার অফিসের কাজের চাপ আর দায়িত্বের জন্যও হতে পারে, ভেবেছে নবনীতা। অফিসে ঝামেলা থাকলে বাবাকেও দিনের পর দিন বাড়ির ব্যাপারে নিস্পৃহ নিরুত্তাপ হয়ে থাকতে দেখেছে নবনীতা। কিন্তু আজ স্পষ্ট বোঝা গেল, সুশান্ত আসলে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। বদলে গেছে বাস্তবিক। যাদবপুরের সেই সদ্য-পরিণীত যুবকটা—যে নবনীতার এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারত না, আদরে-সোহাগে সে মাথামাখি করে রাখত প্রতিটি ঋতু এবং প্রতিটি ক্ষণ—সে অন্য লোক। সে এ নয়। সে কখনো এমন শেল হানতে পারে না। সুশান্তর একটা অভ্যাস ছিল। বিয়ের পর-পর রোজ সে বিভূতিভূষণের মতো চাঁপাফুল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরত সন্ধেবেলা। খাটে বিছিয়ে দিত। এত রোমান্টিক ছিল মানুষটা!

ভালোবাসা যে কত তীব্র এবং কত আবেগময় হতে পারে, কত স্পন্দন তুলতে পারে নারীর মনে, সে একমাত্র নবনীতাই জানতে পেরেছে সুশান্তর কাছে। আজ সেসব স্মৃতির অ্যালবামে ধরে রাখা কতকগুলো ছবি ছাড়া কিছু নয়।

সব শেষ হয়ে গেল অকস্মাৎ।

দিদিমার মুখে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনা আর দাদুর হাত থেকে পাওয়া বাগানের তাজা গন্ধরাজ ফুল—নবনীতার শৈশবটাও ছিল অতি মনোরম। তাই বিয়ের পর স্বামীর কড়ে আঙুল ধরে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় নবনীতা অঝোরে কেঁদেছিল। ভেবে-ছিল সুখের দিন এবার শেষ। এবার এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে অচেনা পথে যাত্রা। কে জানে কেমন হবে সে পথ! কিন্তু নবনীতার সব ভয় আর উদ্বেগ অচিরে দূর করে দিয়েছিল সুশান্ত। সুশান্তকে সেদিন নব-নীতার মনে হয়েছিল ভালোবাসার এক অগাধ সমুদ্র।...

কলিং বেলের শব্দ আবার। বেলা দুটো।

উঠে এসে দরজা খুলতে সুশান্ত ঢোকে। ব্রিফকেস নামায়। নীরবে পোশাক খুলতে থাকে। গম্ভীর। নীরবতা ভঙ্গ করে নবনীতাই, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

—বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে সেজন্য?

—কী যা-তা বলছ?

সুশান্ত ক্ষণকাল নীরব থাকে। চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখে। নতুন গ্যাস লাইটারটা নিয়ে সিগারেট ধরায় একটা। তারপর বলে, আজ দেবাশিস অফিসে আসে নি। বাড়িতে ফোন করেছিলাম, বাড়িতেও নেই। ভাবলাম—

এটা কোনো প্রশ্ন নয়। একটা তথ্য। একটা বিবৃতি। তবু যেন বড়ো বেশি স্পষ্ট আর প্রাসঙ্গিক। প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী।

নবনীতা জবাবদিহির সুরে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। রাস্তা দিয়ে মিছিল যাচ্ছে। ভোটের মিছিল। নবনীতা ব্যালকনিতে পালিয়ে বাঁচে, কত দীন দরিদ্র লোক মিছিলে যাচ্ছে। তবু ওরা কেউ ভিখিরি নয়। মিছিলের মুড়োতে দাঁড়িয়ে একটা লোক ধিক্কার, আক্রোশ আর ঘৃণায় গলা ফাটাচ্ছে, তার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। আবার পরমুহূর্তে সে কাঙালের মতো বলে ওঠে—ভোট দিন। ভোট দিন। দলে-দলে ভোট দিন।

তবে ভিখিরি কোথাও নেই। কোথাও ধ্বনি নেই—দুটি ভিক্ষে দেবে? ও মা। মাগো—সারাদিন কিছু খেতে পাই নি।

নবনীতার এখন ঘরের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না সুশান্তর মুখোমুখি হতে। বস্তুত এত অস্বস্তিকর অবস্থায় সে খুব কম পড়েছে।

সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবে অন্য কথা।

বহুকাল সে রাস্তায় ভিখিরি-টিখিরি দেখে না। কত কাল সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভিখিরিকে পয়সা ছুঁড়ে দেয় নি। হাত নেড়ে হাটিয়েও দেয় নি। কাগজ-বিক্রিঅলা, শেতলাপুজো, হারমোনিয়ামকাঁধে গায়ক, বেহালাবাদক—কত শত লোক যায় এ রাস্তা দিয়ে। যায় না শুধু কোনো ভিখিরি। নিখাদ নির্ভেজাল, খাঁটি ভিখিরি। দেশের অবস্থা এখন ভালো হয়েছে বলতে হয়। আশাহত নবনীতা ঘরে ঢোকে।

সুশান্ত টান-টান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। খালি গা। রোমহীন মাখনের মতো। ভরদুপুরবেলা। বাড়িতে এসময় দ্বিতীয় প্রাণী বলতে আর কেউ নেই। এই লোকটা তার স্বামী।

এই অখণ্ড অবসরটুকু তারা কত আবেগময় করে তুলতে পারে! এই যে অফিস-প্রত্যাগত মানুষটা—একটু সিগারেটের আর একটু স্বেদগন্ধের মধ্যে ওর শরীরে লুকিয়ে আছে প্রবল যৌন আকর্ষণ। আগের মতো তবে সে কেন এখন টেনে নিচ্ছে না নবনীতাকে। হায়! এখন যে কীটের জ্বালায় জ্বলছে সুশান্ত। সংশয় আর অবিশ্বাসের কীট।

তবু নবনীতা এখনও পারে সুশান্তর বলিষ্ঠ শরীরে নিজেকে অসংকোচে সমর্পণ করতে। ওর শরীরের স্বাদ গন্ধ, ত্বক রোমকূপ নিজের শরীর দিয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে। ওর পৌরুষ, ওর আবেগ, ওর জ্বালা আর ওর তৃপ্তি—সব কিছু সে মন্থন করে নিতে পারে এখনও, এই মুহূর্তেও।

থরথর করে কাঁপে তার শরীরের অভ্যন্তর। আবেগ-জর্জর স্বরে নবনীতা শুধোয়, দেবাশিসের কথা কী বলছিলে? স্পষ্ট করে বলো আমায়।

সুশান্ত যেন তৈরি হয়েই ছিল। জ্বালাভরা স্বরে বলে, শুনবে? সহ্য করতে পারবে?

এইটুকুই যথেষ্ট। এই সামান্য কথারই ইঙ্গিতে, বিস্ফোরণে চৌচির হয়ে যায় নবনীতা। নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারে না। সুশান্তর বুকের কাছটা খামচে ধরে বলে, তুমি আমায় ভালোবাস? বলো। আমি আর কিছু শুনতে চাই না। কিছু না।

সুশান্তর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, যদি বলি আমারও ওই একই প্রশ্ন।

—তার জবাব দিতে পারি। বিশ্বাস করবে? আসলে প্রশ্ন তো এইটাই—

—কোন্‌টা?

—বিশ্বাস। তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর?

সিগারেটটা আশট্রেতে গুঁজে দিয়ে সুশান্ত বিরক্ত-ভাবে বলে, বুকটা ছেড়ে দাও। লাগছে।

—ছাড়ব না। আগে জবাব দাও।

—কোন্‌ জবাবটা চাও? ভালোবাসা, বিশ্বাস না দেবাশিস—

নবনীতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবার। স্বামীর বুকে অসহায়ভাবে মাথা গুঁজে দিয়ে সে বলে, আমি কোনো জবাব চাই না, শান্ত। কিচ্ছু চাই না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে চাই। তোমাকে চাই—

কান্নায় তার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুত পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে সে এখনও সন্তানের মুখ দেখে নি। তার খালি বুকটা জুড়ে অঢেল তৃষ্ণা—তবু এমন সংকট-ময় পরিস্থিতি তার জীবনে আগে কখনো আসে নি। নীচের তলার রিন্টুর মতো একটা ফুটফুটে ছেলে থাকত যদি তার, তবে সে আজই তার হাত ধরে বেরিয়ে যেত। কিন্তু সে যে বড়ো অভাগী।

সুশান্ত তার কথার কোনো জবাব দেয় না। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দংশনে সে মুর্খের মতো জ্বলছে। তবু তার এই মূঢ়তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটুকুও যেন আজ হারিয়ে ফেলেছে নবনীতা। খালি মনে হচ্ছে, ভালোবাসার অগাধ সমুদ্র ছিল যে মানুষটা একদিন, সে এখন নিঃশেষিত। এখন সে রিক্ত এক কাঙাল ভিখিরি ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বস্বান্ত।

সুশান্তর হাতের ঠেলায় বিছানার ওপর ছিটকে পড়ে নবনীতা। অথচ তার অপমান লাগে না তেমন, দুঃখ হয় না। অভিমানও নয়। তার মনটা এখন নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো টলটল করছে। এর পর সুশান্তর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোনদিকে মোড় নেবে তা নিয়েও সে এই মুহূর্তে কিছু ভাবে না।

সে ভাবে অন্য কথা। একরাশ খাবার তাহলে ফেলে দিতেই হল! দেশে তাহলে ভিখিরি নেই-ই! নাকি তারাই সব এখন ওয়াগন ভাঙছে? ব্যাঙ্ক লুট করছে, সিনেমার

টিকিট ব্ল্যাক করছে! তারা রোজগারের সত্যি কত রাস্তা পেয়ে গেছে। হয়তো তাই। নবনীতা অবশ্য অতশত তলিয়ে বোঝে না। সে সামান্য মেয়েমানুষ। সে অত জানেই না। তবে পৃথিবী আগের মতো নেই এটুকু অনুভব করে।

রাস্তা দিয়ে এখন আবার আর-এক পক্ষ মিছিল করে যাচ্ছে। ধ্বনি উঠছে। উঠছে স্লোগান। ভোট দিন। ভোট দিন। ইশ! ভোটের জন্য কী কাঙালপনা!...

ভরদুপুর বেলা বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী বলতে কেউ নেই। দুটি নরনারী পাশাপাশি শুয়ে থাকে খাটে দুই বিরোধী পক্ষের মতো। দুদিকে মুখ ফিরিয়ে। আর মহাকাল অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় থমথম করে মুহূর্তগুলি।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দুই

সেই কালো জিন আর শাদা জিনের কাহিনী পরবর্তী সময়ে পল্লবিত হয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে আর যে-পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাজি মৌলানা বদিউজ্জামান জেহাদ করে বেড়িয়েছেন, ক্রমশ প্রকারান্তরে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর ফুঁদেওয়া জল নেওয়ার জন্য বহুদূর থেকে লোকেরা এসে ভিড় জমাতে থাকে। জুম্মাবারে তাঁর পাগড়ি ছুঁয়ে 'তওবা' করার জন্য মসজিদের ভেতর থেকে বাইরে অব্দি একটা কিউ সৃষ্টি হয়। তাঁর পাগড়ির রঙ হয়ে ওঠে সবুজ। কারণ পয়গম্বরের প্রিয় রঙ ছিল সবুজ। তাই তিনি জন-সমাবেশে সবুজ পাগড়ি পরে হাজির থাকতেন। পরে তাঁকে তওবা-অনুষ্ঠানের বহর দেখে পাগড়িটিকে অসম্ভব দীর্ঘ করতে হয়েছিল। মাথায় পরার পর পাগড়িটিকে ঈষৎ বেমানান মনে হলেও উপায় ছিল না। আসলে ইসলামি তওবা খ্রিস্টোনি কনফেসনেরই মতো। পাপ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা। তওবা করার সময় লোকেরা এত জোরে কান্নাকাটি করত যে একদিন মৌলাহাটের দারোগা মুকুন্দ সিং মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ভীষণ চমক খেয়ে থমকে দাঁড়ান এবং ধরেই নেন একটা খুনখারাপি হয়েছে। সাইদা বেগম এই গল্পটা খুব রঙ চড়িয়েই শোনাতেন তাঁর দুপুরের আসরে। জিনদুটির গল্পের চেয়ে মেয়েরা দারোগাবাবুর গল্পটিরই বেশি পক্ষপাতিনী ছিল। কারণ এই দারোগার গল্পে একটা ঘোড়া ছিল, যাকে একবার জিনে ধরেছিল।...

তবে এও ঠিক, কালো জিন আর শাদা জিনের অলৌকিক কাহিনী পল্লবিত হওয়ার মূলে ছিলেন সাইদা এবং খয়রাজোলের সেই অসিমুদ্দিন। দুজনেই কাহিনীর বীজ বুনেছিলেন। সাইদা মেয়েদের মনে আর অসিমুদ্দিন পুরুষদের মনে। তার চেয়ে বড় কথা, বদিউজ্জামান যে সেকেন্ডা-মখদুমনগর যেতে মাঝপথে বাদশাহি সড়কের ধারে মৌলাহাটেই সেবার আটকে যান, তার পেছনেও যেন জিনদুটির কিছু কারসাজি ছিল।

সাইদা আর অসিমুদ্দিন দুজনেই বিশ্বাস করতেন একথা। বস্তুত চৈত্রমাসের সেই দিনটিতে পর-পর দুবার মোজেজা বা দিব্যশক্তির নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। উলু-শরার তৃণভূমি পেরিয়ে সাতখানা গোরুর গাড়ির অদ্ভুত

কারাভাঁ যখন বাদশাহি সড়কে পৌঁছয়, তখন দলের প্রত্যেকটি লোক ছিল চঞ্চল আর হাসিখুশি। এবার যে-কোনো বাধার বিরুদ্ধে জান কোরবান করে শহিদ হতে তারা তৈরি ছিল। শফি হাত থেকে সেই ছিপটিটি ফেলে নি। সে বারবার সন্দিগ্ধভাবে পিছু ফিরে দেখছিল, যদি কোনো জিন তাদের অনুসরণ করে থাকে, সে কালো না শাদা। আর অসিমুদ্দিন চাপা স্বরে সঙ্গী-দের বলছিল, সে খাগড়ির সৌতা পেরিয়ে দাবানলের মতো আঁকা-বাঁকা একটি ভগ্নরেখা আবিষ্কার করে এসেছে। এমন কী তার বিশ্বাস, শাদা জিনটিকে চোখের কোনা দিয়ে যেন আকাশ থেকেই নামতে দেখেছিল সে। আর সে ভেবেছিল, দিনের বেলায় 'তারা খসে পড়া' সম্ভব কি না। স্বর্গ থেকে নির্বাসিত শয়তান যখন আকাশের আনাচে-কানাচে গিয়ে স্বর্গে অনুপ্রবেশের ছিদ্র সন্ধান করে, তখন সতর্ক স্বর্গপ্রহরী ফেরেশতা তার দিকে নক্ষত্র ছুড়ে মারে। শয়তান প্রাণভয়ে পৃথিবীতে পালিয়ে আসে। রাতের আকাশে সেটাই তো দেখা যায়। তারপর অসিমুদ্দিন হাত তুলে বলেছিল, ওই দেখা যায় মৌলাহাট। সেবার শুখার বছর ওখান থেকেই ধান কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। দুনিয়ার কোথাও আবাদ ছিল না। মৌলাহাটে ছিল। ক্যানে কী—অসিমুদ্দিন আবার হাত তুলে বলেছিল, ওই দ্যাখো শেরের দীঘির পাড়। ওই দীঘির পানির থই নাই। সেই পানিতে চাষবাস হয়ে-ছিল। আর ওই দ্যাখো লদী। লদীর নাম বাম্ভনী। যদি বলো এমন নাম ক্যানে—তো সেই কথাটা বলি শোনো।

শফি সঙ্গ ধরেছিল অসিমুদ্দিনের। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছিল এই লোকটি গল্পের জাদুকর। এক ব্রাহ্মণ আর এক পিরের অলৌকিক লড়াইয়ের কথা শুনে সে অবাক হয়েছিল। গল্পটি ঈষৎ অশালীন, কিন্তু হয়তো বা কিছু তাৎপর্য ছিল, যা বোঝার মতো বোধ-বুদ্ধি ছিল না শফির। ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, আমি প্রস্রাবে নদী তৈরি করতে পারি। আর পির বলেছিলেন, আমি সেই নদী রুখে দিতে পারি। নদী তৈরি হল এবং পির দিলেন পাথর দিয়ে রুখে। এই অদ্ভুত লড়াই যখন তুঙ্গে, তখন রফা করতে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র আর হজরত আলি। রফা হল পাথরের বাঁধ থাকবে, তবে নদীর বয়ে যাওয়ার জন্য বাঁধে পাঁচটা ছিদ্র হবে। মৌলা-হাটের ওধারে নদীর ওপর যে জিনিসটাকে এখন সাঁকো বলা হয়, সেটাই সেই পিরের বাঁধ। গল্পটা শুনে সবাই হাসতে লাগল। তখন অসিমুদ্দিন চোখে ঝিলিক তুলে জিগ্যেস করল, তাহলে কে জিতল? বাম্ভন, না পির? ঠিক করতে না পেরে সবাই একবাক্যে বলল, দুজনেই সমান। শুধু শফি বলল, ব্রাহ্মণ। তখন অসিমুদ্দিন হাসতে-হাসতে বলল, আমরা মোছলমানরা চিরকাল বোকা। শুধু গায়ের জোরটুকুন আছে। বুদ্ধি বলতে নাই। তারপর অসিমুদ্দিন পায়ের তলার সড়কটা দেখিয়ে আবার একটা গল্প বলেছিল। সেটা বাদশাহি সড়কের গল্প। সেও হিন্দু-মুসলমানের গল্প।

উত্তরের দেশের বাদশাহ দক্ষিণদেশে গেছেন। দক্ষিণ-দেশে হিন্দুরাজত্ব। একশো মন্দির। বাদশাহ মন্দির ভেঙে ফিরে যাচ্ছেন, মন্দিরের ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দিলেন, বাড়ি ফিরলেই তোমার মরণ। অসিমুদ্দিন বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, বাড়ি ফিরলেই আমার মরণ? বাদশাহ খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। ভাবছেন, খুবই ভাবছেন, ভেবেই যাচ্ছেন। হঠাৎ এল এক ফকির। ফকির মুচকি হেসে বলেল, আই বাদশা! বাড়ি ফিরলেই যদি মরণ, তবে ফেরার পথে সড়ক বানা। কোরেশ-অন্তর দীঘি খোঁড়। সেই দীঘির পাড়ে মসজিদ বানিয়ে দে। মহলে ফিরতে-ফিরতে তুই চুল পেকে দাঁত ভেঙে থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে যাবি। বাম্ভনের অভিশাপ ঝুট হয়ে যাবে। আর বাস্! অসিমুদ্দিন খিকখিক করে হাসতে লাগল। এই যে দেখছ হেঁটে যাচ্ছি আমরা, এই সেই সড়ক। আর ওই নজর হচ্ছে সেই এক দীঘি। দীঘির পাড়ে জঙ্গলের ভেতর ওটা কী দেখছ? গুম্বুজ! মসজিদের গুম্বুজ।...অসিমুদ্দিন শুখার বছর ধান কিনতে এসে দেখে গেছে, সেই মসজিদে শেয়ালের আস্তানা। চামচিকের নাদি পড়ে আছে। দেখে কষ্ট হয়।

অসিমুদ্দিন! হুজুর ডাকছিলেন। জলদগম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর। আগের গাড়িতে তিনি বসে আছেন গাড়োয়ানের পেছনে। হাতে তসবিহ্‌দানা—জপমালা। চোখদুটি অর্ধমুদিত। তাঁকে ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। অসিমুদ্দিন ছাগলছানা দুটি কাদির আলির কোলে দিয়ে লম্বা পায়ে এগিয়ে এল। ডাকছেন হুজুর?

অসিমুদ্দিন! আমরা শেরের দীঘির ঘাটে খানা সেরে নেব। জোহরের নমাজ পড়ব। তারপর রওনা দেব।

প্রধান শিষ্য সেই বার্তা পেঁৗছে দিতে-দিতে পিছিয়ে শেষ গাড়ির কাছে এল। সবাই বলল, ইনশাল্লাহ্। আর গাড়োয়ানরাও বলল যে বলদগুলো মাঠের আল-কাটা লিকে হেঁটে বড় পরিশ্রান্ত। তারা ঠিক একথাই ভাবছিল। কিন্তু সাহস করে বলতে পারছিল না। নকিব নামে এক গাড়োয়ান করুণ হেসে বলল, তাড়াতাড়ি গাড়ি বাঁধতে ধুরিতে তেল দেওয়া হয় নি। তাই গাড়িটা বড় আওয়াজ দিচ্ছে। এবার গাড়ি বেঁধে ধুরিতে তেল দিতে হবে। নৈলে কখন মড়াত্ করে—

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আশংকা সত্যি হয়েছিল। দীঘির শানবাঁধানো ঘাটের শিয়রে এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। সেই বটতলায় সাতখানা গাড়ি এলোমেলোভাবে ঢুকতে না ঢুকতে সত্যিই মড়াত্ করে নকিব গাড়োয়ানের গাড়ির ধুরি ভেঙে গেল। ভাগ্যিস সে-গাড়িতে শুধু গেরস্থালির জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু এ এক বিপদই বলতে হবে। ধুরিটা এমনভাবে ভেঙেছে যে তাপ্পি মেরে কাজচলা গোছেরও করা যাবে না। তাড়াহুড়োয় কেউ বাড়তি ধুরি নিতে ভুলে গেছে। নতুন ধুরি মৌলাহাট থেকে সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু তাতে সময় লাগবে। গাড়ির ধুরি বাঁধা সামান্য কাজ নয়।

আবার মুখগুলি বড় গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। আবার কালো জিনের পাল্লায় পড়া গেছে, তাতে সন্দেহ ছিল না কারুর। খুব ব্যস্তভাবে সবাই নকিবের গাড়িটিকে খালি করে জিনিসপত্র বটতলায় গুঁড়ির কাছে জড়ো করছিল। গাড়ি খালি হলে নকিব আর ফজল গ্রামের দিকে চলে গেল নতুন ধুরির খোঁজে। শফি তার বুজুর্গ পিতাকে লক্ষ্য করছিল। বদিউজ্জামান ছায়ায় একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর পিছনে ঘুরে উঁচু পাড়ের দিকে তাকালেন। ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভেতর বাদশাহি মসজিদের গম্বুজটাকে দেখলেন সম্ভবত। গম্বুজে একটা ফাটল ছিল। তারপর শফি দেখল, তার পিতা ময়রামুখো ছড়িটি নিতে এলেন গাড়ি থেকে। ছড়িটি হাতে নিয়ে তিনি ধীর পদক্ষেপে পাড়ে উঠে গেলেন। ঝোপের ভেতর তাঁর শাদা আলখেল্লা ঝলমলিয়ে উঠছিল। শফির গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। একটা কিছু ঘটতে চলেছে আবার। সে ভাবতে পারছিল না এবারে কী ঘটবে। আব্বা কি শাদা জিনটিকে দেখতে পেয়েছেন? সাইদা আর কামরুন্নিসার গাড়িটা বটগাছের গুঁড়ির আড়ালে বাঁধা হয়েছিল। সেখানে অসিমুদ্দিন শিগগির অন্য একটা গাড়ির টাপরের সঙ্গে একটা শাড়ি আটকে রীতিমতো জেনানা মহল বানিয়ে দিয়েছে। সেই পর্দার ফাঁকে সাইদার পা দেখতে পাচ্ছিল শফি। ছুটে গিয়ে মাকে তার আব্বার ওই রহস্যময় গমনের কথা বলবে ভাবছিল শফি। কিন্তু ঠিক তখনই দীঘির ঘাটের দিকে তার চোখ গিয়েছিল। সে জলের শব্দ শুনে থাকবে। ঘুরে দেখল দুটি মেয়ে ঘাটের সামনে কালো জলে সাঁতার কাটছে। দুজনেরই বুকে দুটি মাটির কলসি উপুড় করা। কলসি আঁকড়ে ধরে তারা উপুড় হয়ে ভেসে পা ছুড়ছে। কালো জল শাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। একজনের গায়ে বেশি জল এসে পড়ায় আপত্তি করতে গিয়েই সে শফিকে দেখল এবং কলসিটিকে ছেড়ে জলের ভেতর দাঁড়িয়ে গেল। অবাক চোখে সে শফিকে দেখছিল। অপর মেয়েটিও এতক্ষণে শফিকে দেখতে পেয়েছে। সেও একইভাবে দাঁড়িয়ে শফিকে দেখতে থাকল। তারপর শফিই অবাক হয়ে গেল। দুটি মেয়ের মুখের গড়ন হুবহু এক। শফি যমজ ছেলে দেখেছিল কুতুবপুরে থাকার সময়। এই মেয়েদুটিও কি যমজ? সে ভাবছিল, কাছে গিয়ে দেখবে সত্যি তাই নাকি। কিন্তু বিশেষ করে অচেনা মেয়েদের—যারা শাড়ি পরে আছে, তাদের কাছে যাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিল না। তারপর তার মাথায় বুদ্ধি খেলেছিল। সে একদৌড়ে মায়ের কাছ থেকে তামচিনির বদনাটা চেয়ে নিল এবং সোজা গিয়ে ঘাটে নামল। ঘাটের ধাপ জায়গায়-জায়গায় ভাঙা। শ্যাওলা গজিয়ে আছে। সে মুখ নামিয়ে ধাপে নামছিল। সেই সময় মেয়েদুটি হেসে উঠল। একজন বলল, পা পিছলে যাবে! অন্যজন ভুরু কুঁচকে তাকাল সঙ্গিনীর দিকে, অচেনা ছেলের সঙ্গে কথা বলায় তার আপত্তি। শফি সাবধানে নেমে জল ভরার জন্য বসল। তখন যে তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, সে বলল, তোমাদের বাড়ি কোথা গো?

শফি বলল, আমরা সেকেন্ডা যাব।

প্রথমা খিলখিল করে হেসে উঠল। শুধোচ্ছি বাড়ি কোথা, বলে কী সেকেন্ডা যাব। দ্বিতীয়াও এবার না হেসে পারল না।

শফি বুঝল তার জবাব ঠিক হয় নি। একটু হেসে সে বলল, আমরা আসছি খয়রাজোল থেকে।

প্রথমা বলল, খয়রাজোলে বাড়ি! আমরা গেছি সেখানে। পীরের থানে মেলা বসে পউষ মাসে—সেই মেলায় গেছি।

শফি বলল, আর মেলা তো বসে না।

দ্বিতীয়া একটু অবাক হয়ে বলল, বসে না? কেন বসে না বলো তো?

শফি গম্ভীর হয়ে বলল, আমার আব্বা পিরের থান ভেঙে দিয়েছেন!

প্রথমা বাঁকা হেসে বলল, কে তোমার আব্বা? ইশ! থান ভেঙে দিয়েছে! ভারি আমার মুরোদ!

মেয়েদুটির বয়স বারো-তেরোর বেশি নয়। তারা শফিকে তুমি-তুমি করায় শফির আত্মসম্মানে লাগছিল। সে মুখ উঁচু করে বলল, আমার আব্বা বড় মৌলানা।

দ্বিতীয়া বলল, মৌলানা বলে থান ভাঙতে হবে? এমন তো শুনি নি কখনও। রুকু, ছেলেটা কী বলছে শোন।

রুকু মুখ টিপে হাসছিল। জল কুলকুচি করে আকাশে ছুড়ে বলল, থান কেউ ভাঙে? ও আমাদের সঙ্গে তামাশা করছে।

শফি জলভরা বদনা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। খুব গম্ভীর হয়ে বলল, আমরা থান-টান মানি না। আমরা ফরাজি।

দুই বোন একসঙ্গে চমকে উঠে বলল, কী বললে?

আমরা ফরাজি।

দুজনে আবার হেসে উঠল। রুকু একটু তেজি। সে সুর ধরে ছড়া কাটল :

ফরাজিদের নমাজপড়া
ঢেঁকির মতন মাথানাড়া॥

শফির কান লাল হয়ে উঠল। অনেক জায়গায় হানাফি সম্প্রদায়ের ছেলেরা এই ছড়া গেয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করত। সে ভীষণ খেপে গিয়ে ঢিল ছুড়ে ভাগিয়ে দিত তাদের। এরা যদি ছেলে হত, সে হাতের বদনাটা ছুড়ে মারত। কিন্তু এরা মেয়ে। তাছাড়া এরা যে যমজ দুটি বোন তা সে বুঝতে পেরেছে। সে তাদের উপেক্ষা করল। আর এইসময় গাড়োয়ানরা বালতি হাতে ঘাটের দিকে আসছিল। তাই দেখে মেয়ে দুটি শাড়ি টেনে মাথা ঢাকল। তারপর ঝটপট কলসিতে জল ভরে দুটি একটা পাশ দিয়ে ভয়পাওয়া ভঙ্গিতে উঠে গেল। তারা ঘাটের মাথায় ভিড় দেখে থমকে দাঁড়াল একটু। তারপর সেদিকে না গিয়ে দীঘির ধারে-ধারে ভেজা শাড়ির শব্দ করতে-করতে পালিয়ে যাওয়ার মতো হেঁটে গেল। তারা মসজিদের ওপাশে ঝোপের ভেতর দিয়ে চলে গেলে তখন শফি ফিরে এল বটতলায়। রাগে দুঃখে অস্থির সে। মেয়েদের কাছে জীবনে এই প্রথম সে অপমানিত।

আর এরপরই হুজুর পির বদিউজ্জামানের দ্বিতীয় মোজেজা দেখা গিয়েছিল। মোজেজা ছাড়া আর কী বলা যায় একে? নকিব আর ফজল গ্রামে নতুন ধুরির খোঁজে গিয়েছিল। ওরা যখন ফিরে এল, তাদের সঙ্গে একশো লোক। লোকগুলির মুখেচোখে ঐশী নিদর্শন অনুসন্ধানের প্রচণ্ড আকুলতা, আর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আকাশে। তারা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো স্থির আর শব্দহীন। সেই জনতাকে দেখে অসিমুদ্দিন কিন্তু প্রথমে ভয় পেয়েছিল, কারণ সে-যুগে ফরাজিমতে দীক্ষিতদের ওপর কোথাও-কোথাও হামলা ঘটত। সে দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে হুজুরকে খুঁজতে গিয়েই চমকে উঠল। অভিভূত হল সে। তার ঠোঁটদুটি কাঁপতে থাকল। তার সারা শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল। দীঘির উঁচু পাড়ে শাহি মসজিদের প্রান্তে একখণ্ড পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন বদিউজ্জামান। ওইখানে কোনো বৃক্ষলতা নেই। চৈত্রের নীলধূসর আসমানের গায়ে আঁকা সাদা আলখেল্লা আর শাদা পাগড়িপরা মূর্তিটিকে দেখে মনে হয় ওই মানুষ দুনিয়ার নন। অসিমুদ্দিন সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারল আবার একটি মোজেজা ঘটতে চলেছে। সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, আলহামদুলিল্লাহ্! হে ঈশ্বর, সকল প্রশংসা শুধু তোমার। আর মৌলাহাটের সেই জনতাও অভিভূত। তারা ঘুম-ঘুম কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনি তুলল, আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! তারপর তারা গাম্ভীর্য আর সম্ভ্রমে এগিয়ে গেল সেই দিকে। পয়গম্বর ইশা মানুষকে মেষপালের উপমা দিয়েছিলেন। বস্তুত মৌলাহাটের এই মানুষগুলি মেষপালের মতো দীঘির পাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছিল। তারা ফারসি-হরফখোদিত কালো গ্রানাইট শিলাটির সামনে গেলে বদিউজ্জামান প্রথমে সম্ভাষণ করলেন, আস্-সালামু আলাইকুম এবং তারা সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে বলল, ওয়া আলাকুম আস্-সালাম। তারপর বদিউজ্জামান তাঁর বিশাল দুই হাত প্রসারিত করে আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে বললেন, বেরাদানে ইসলাম!...

এরপর তিনি যে ভাষণটি দেন, মৌলাহাটের মুসলমানদের কাছে বংশপরম্পরা একটি কিংবদন্তী-ভাষ হয়ে ওঠে। তারা বলত, হুজুর আমাদের কানে গরম সীসার মতো কিছু কথা ঢেলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমরা অন্য কথা শুনতে পাই না। যদি বা শুনতে পেতাম, আমাদের কানের দুয়ার বন্ধ।

কিশোর শফি বটতলায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। পর্দার ফাঁক থেকে সাইদাও উঁকি মেরে দেখছিলেন। তিনিও অসিমুদ্দিনের মতো প্রথমে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, লোকগুলি নিশ্চয় হানাফি মযহাবের এবং তাই তারা ফরাজি ধর্মগুরুকে হয়তো আক্রমণ করতে যাচ্ছে। পক্ষাঘাতগ্রস্তা কামরুন্নিসা জিগ্যেস করেছিলেন, কী হল বউবিবি? অত পায়ের শব্দ হচ্ছে কেন? আমার বদুর কি কোনো বিপদ হল? কামরুন্নিসা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।...বউবিবি! তুমি কথা বলছ না কেন? সাইদার বুক কাঁপছিল। বিরক্ত হচ্ছিলেন শাশুড়ি বিবিজির প্রতি। একই উদ্বেগসংকুল দৃষ্টিতে সাইদা খুঁজছিলেন শফিকেও। শফি পর্দার ভেতর মায়ের কাছে চলে এলে সে নিরাপদ। কারণ ওরা স্ত্রীলোকদের ওপর হামলা করবে না। তিনি শফিকে দেখতে পেয়েই শরিয়তি অনুশাসন তুচ্ছ করে ঈষৎ চড়া গলায় ডাকলেন, শফি! শফি! পর্দাবৃত্তের ফাঁকে তাঁর পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে আর কোমল হাতখানিও নড়তে লাগল। সেই হাতে তিনগাছি করে সবুজ কাচের চুড়ি ছিল। চুড়ির শব্দে বটতলায় আবিষ্ট অসিমুদ্দিনের চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গে সে চাপা স্বরে এবং মৃদু হেসে বলল, আল্লাহ আমাদের। ডর করবেন না মা-জননী! বাছা শফি-উজ্জামান! জলদি যেয়ে দেখুন, আম্মাজান তলব করেছেন।

শফি গ্রাহ্য করল না। সে দীঘির উঁচু পাড়ে শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়েথাকা তার আব্বা আর সামনে বসে-পড়া মেষপালটিকে দেখছিল। দেখতে-দেখতে যমজ বোনদের কথাই ভাবছিল সে। তারা যদি এবার এই দৃশ্যটা দেখতে পেত! রাগ-দুঃখ-অপমান ভুলে শফির মনটা নির্মল হল। সে মনে-মনে বালিকাদুটিকে ক্ষমা করে দিল। আর অসিমুদ্দিন তার উদ্দেশে চাপা গলায় বলে উঠল, কী দেখছেন বাপজান? তামাম মৌলাহাট ফরাজি হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহে রব্বুল আলামিন! এমন কী ঝটপট দুহাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে মুখে ঘষতে থাকল। শুধু গাড়োয়ানদের কোনো দৃকপাত ছিল না। তারা নিঃশব্দে দীঘি থেকে জল এনে বলদগুলিকে জাবনা খেতে দিচ্ছিল। নকিব তার ভাঙা ধুরিটাতে বারবার হাত বুলিয়ে পরখ করছিল। পরে সে বলেছিল, হুজুর-সাহেবের কথা শোনামাত্র আমার ধুরির কথা চাপা পড়েছিল। চান্দিকে অমনি ছুটোছুটি, হাঁকডাক, ওরে সব আয়, বদুপির এসেছেন বদুপির এসেছেন বলতে বলতে সে এক ঝড় বইয়ে দিলে। আর ফজল বলেছিল, নকুর কথা ধরো না। কী হয়, কী বলে! আসলে হাটতলায় একটা শালিশি বসেছিল। অনেক লোক ছিল সেখানে। আমি একজনকে আড়ালে ডেকে কালো জিন শাদা জিনের কথাটা বললাম। হুজুরের কেরামতির কথা বললাম। তবে তো—

একটা কিছু ঘটেছিল, তার প্রকৃত বর্ণনা আর পাওয়া যাবে না। শুধু এইটুকু বোঝা যায়, মৌলানা বদি-উজ্জামান মৌলাহাট অঞ্চলে বদুপির নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু গল্পও পল্লবিত হয়ে থাকবে। যেমন, জিনেরা তাঁর সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতে আসত, গোরস্থানে মৃতেরা তাঁর 'আসসালামু আলাইকুম' সম্ভাষণের জবাব দিত। তবে তার চেয়ে বড় কথা, মৌলাহাটের পায়ের তলায় ব্রাহ্মণী নদীতে পিরের সাঁকোটি পিরতন্ত্রের মহিমা প্রচার করে এসেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। তারা বংশপরম্পরা প্রতীক্ষা করত সেইরকম কোনো অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়ান। আর চৈত্রের সেই দুপুরে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পটে শাদা পোশাকপরা গৌরবর্ণ সুন্দর সেই পুরুষকে দেখামাত্র তারা বুঝতে পেরে থাকবে, এই সেই মোজেজা-সম্পন্ন মানুষ, যাঁর কথা তাদের পিতা-পিতামহ-প্রপিতা-মহরা বলে এসেছে। তারা যখন মিছিল করে তাঁকে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা গেল রাস্তার দুধারে আরও মানুষ সারবন্ধ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। স্ত্রীলোকেরা জানালা-দরজার ফাঁকে বা পাঁচিলে চাষের মই ঠেকিয়ে তাতে সাবধানে উঠে গিয়ে উঁকি মারছিল। কিছু বেহায়া বা স্বৈরিণী স্ত্রীলোক পুরুষদের ভিড়েই দাঁড়িয়ে ছিল। পুরুষেরা তাদের তাড়া করে বাড়িতে ঢোকাল। আরও বহু পুরুষ উঁকি-মেরে-থাকা স্ত্রীলোকদের হাত-ইশারায় সরে যেতে বলল। তারা ভ্রূ কুঞ্চিত করে হুঁশিয়ার নিয়ে আগে-আগে হাঁটছিল।

বস্তুত মৌলাহাটের মুসলমানদের জীবনে সে ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বদিউজ্জামান সোজা গিয়ে মসজিদে ঢুকেছিলেন। মসজিদটি পাকা। প্রাঙ্গণে ইঁদারা ছিল। জোহরের নমাজের সময় এত ভিড় হল যে রাস্তা অব্দি তালাই বিছিয়ে নমাজ পড়তে হয়েছিল।

আর তখন দীঘির ঘাটে বটতলায় শুধু দুটি গাড়ি। একটি সাইদা আর তাঁর শাশুড়ির। অন্যটি বেচারা নকিবের। বাকি গাড়িগুলি লোকেরা এসে নিয়ে গেছে। সাইদার পর্দার অন্যপ্রান্ত বটের ঝুরির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। সাইদা তাঁর প্রতিবন্ধী মেজ ছেলেকে গুড়মুড়ি খাওয়াচ্ছিলেন। শফি নকিবের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি স্ত্রীলোককে চাদর মুড়ি দিয়ে হন্তদন্ত আসতে দেখল সে। স্ত্রীলোকেরা পর্দার আড়ালে সাইদার কাছে গেলে নকিব করুণ হেসে বলল, আম্মাজানদের বেবস্থা হল। এবারে আমার হলে বাঁচি।

একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পর্দা থেকে বেরিয়ে সোজা নকিবের কাছে এল। ঘোমটার আড়াল থেকে সে বলল, বিবিজিদের গাড়িখানা বলদ জুতে নিয়ে এসো তো বাবা!

নকিব বলল, তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু এ গাড়ির ধুরি যে ভাঙা। এত সব জিনিস পড়ে রইল।

স্ত্রীলোকটি শফিকে দেখে মিচ্চি হেসে বলল, এই ছেলেটা থাকবে। তুমি এসো বাপু! বিবিজিরা বললেন, নমাজের অক্ত (সময়) যাচ্ছে। জলদি করো!

সাইদাদের নিয়ে গাড়িটি চলে গেল। ওই গাড়ির আসল গাড়োয়ান তখন গ্রামের মসজিদে নমাজ পড়ছে। শফি তার ওপর বিরক্ত হয়ে বসে রইল। সে এখানে থাকলে অন্তত নকিব তার কাছে থাকত। নির্জন বটতলায় দুটি জীবনাখাওয়া গোরু, একটা ভাঙা গাড়ি আর গেরস্থালির জিনিসপত্রের পাহারায় তাকে একা রেখে সব চলে গেল! অভিমানে গম্ভীর হয়ে রইল সে।

শেষ বসন্তে বটগাছটিতে চিকন কচি পাতা, আর সাতভাই নামে মেটে-ধূসর রঙের পাখিগুলি কলরব করছিল। বাদশাহি সড়কে ধুলো উড়ছিল। মাঝেমাঝে শূন্য মাঠ থেকে ঘূর্ণীহাওয়া খড়কুটো, শুকনো পাতা আর ধুলোর শরীর নিয়ে সড়ক পেরিয়ে যাচ্ছিল। ওপাশে পোড়ো জমিতে কোঙাগাছের নীল-শাদা ঝকঝকে জঙ্গলের ওপর গিয়ে প্রচণ্ড হুলস্থুল। তারপর কোথায় হনুমান ডাকল। শফি তার ছিপটিটা শক্ত করে ধরে হনুমানের দলটাকে খুঁজতে থাকল। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এবার তাকে একা পেয়ে সেই কালো জিনটা যদি হনুমান লেলিয়ে দেয়! দীঘির ঘাটে ততক্ষণে একজন-দুজন করে মেয়েরা স্নান করতে এসেছে। তাকে দেখে তারা ঘোমটা টেনে কিছু বলাবলি করছিল। শফির অস্বস্তিটা তাদের দেখতে পেয়েই চলে গেল। তখন সে পাখিগুলিকে তাড়া করল। একটি কাঠবেড়ালির পেছনে লাগল। আসলে সে আর তত বালক নয় যে প্রকৃতির এইসব ছোটখাট জিনিসগুলি তার আগ্রহের সঞ্চার করে, কিংবা সেগুলি তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে। সে তাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়ার অভিমান এড়াতে চাইছিল। সে অবাক হচ্ছিল ভেবে, তার মাও তাকে কিছু বলে গেলেন না! তার কথা সবাই ভুলে গেল কেন?

হয়তো সেই শেষ বসন্তের দিনটিতে সেই প্রথম শফি এই বিরাট পৃথিবীতে একা হয়ে গিয়েছিল, পিছিয়ে পড়েছিল দলভ্রষ্ট হয়ে—তারপর বাকি জীবন সে একা হয়েই বেঁচে ছিল। জীবনে বহুবার অস্থিরতার মধ্যে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত শফিউজ্জামানের আশ্চর্যভাবে মনে পড়ে যেত মৌলাহাটের দক্ষিণপ্রান্তে শাহি মসজিদের নীচে প্রকাণ্ড বটতলায় একলা হয়ে পড়ার ঘটনাটি। সেদিন যেন সবাই তাকে ভুলে গিয়েছিল। তারপর থেকে ভুলেই রইল।

কিন্তু স্নানার্থিনীরা যখন চলে যাচ্ছে, তখন তাদের একজন শফিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে এক বৃদ্ধা। সে থপথপ করে একটু এগিয়ে এসে শফিকে একটু দেখল। তারপর ফোকলা মুখে হেসে বলল, বড় সোন্দর ছেলে। কে বাবা তুমি?

এক যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠল। দাদি! পছন্দ হয় নাকি দেখো। দেখে—

বৃদ্ধা ঘুরে কপট ক্রোধে মুঠি তুলে বলল, মর হারামজাদি! লোভ হচ্ছে যদি, তুই কর।

যুবতীটিও এগিয়ে এল। বলল, তুমি পিরসাহেবের সঙ্গে এসেছ বুঝি?

শফি গম্ভীরমুখে বলল, আমি পিরসাহেবের ছেলে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ভিজে থানের কাপড় মাথায় টেনে ঘোমটা দিল। যুবতীটি গ্রাহ্য করল না। সে বলল, তুমি

এখানে কী করছ? তোমার আম্মাজানরা তো দরিবুবুর বাড়িতে আছেন। তোমাকে কেউ ডেকে নিয়ে যায় নি?

শফি বিরক্ত হয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছেন না গাড়ির ধুরি ভেঙে গেছে?

যুবতীটি ভাঙা গাড়ি, বলদ দুটি আর জিনিসপত্রের স্তূপটি দেখে নিয়ে বলল, ও। বুঝেছি! তা তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। এসো, এসো। কত বেলা হয়েছে। এখনও হয়তো পেটে কিছু পড়ে নি! এসো।

শফি বলল, না।

সে কী? যুবতীটি হাসল। কিচ্ছু চুরি যাবে না। আমাদের মৌলাহাটে চোর নাই। আর পিরসাহেবের জিনিসে হাত দিলে তার হাত পুড়ে যাবে না? তুমি এসো তো আমার সঙ্গে।

বৃদ্ধাও বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিচ্ছু চুরি যাবে না বাবা। আপনি যান আয়মনির সঙ্গে। আয়মনি, তুই নিয়ে যা বাছাকে। আহা, মুখ শুকিয়ে একটুখানি হয়ে গেছে। আয়মনি, নিয়ে যা ভাই!

আয়মনি নিঃসঙ্কোচে শফির কাঁধে হাত রেখে টানল। তার হাতে একগোছা কাচের রঙিন চুড়ি। তার ভিজে হাতের স্পর্শ শফিকে আড়ষ্ট করছিল। সে পা বাড়াল। আয়মনি তার কাঁধ ছাড়ল না। রাস্তার ওধারে চষা-জমির আলপথে গিয়েও শফির কাঁধটা সে পেছন থেকে ছুঁয়ে রইল।

চষা জমিগুলির শেষে একটা পোড়ো জমি। ঘন কোঙা আর কেয়াবনে ভরা সেই জমির বুক দিয়ে এক-ফালি পথ। শফির আগে তিনজন সদাঃস্নাতা স্ত্রীলোক হাঁটছিল। বৃদ্ধা সবার শেষে। কেয়াবনের ভেতর গিয়ে আগের স্ত্রীলোকেরা বারবার ঘুরে শফিকে দেখে নিচ্ছিল। কেয়াবনের পর মাটির বাড়িগুলি খড়ের চাল মাথায় চাপিয়ে ঠাসবন্দি দাঁড়িয়ে ছিল। সরু একফালি গলিরাস্তায় ঢুকে টিনের চাল চাপানো একটি বাড়ির দরজার সামনে অগ্রবর্তিনীরা থেমে গেল। এবার আয়মনি হালকা পায়ে সামনে গিয়ে বলল, এসো। দরজার ভেতর ছোট্ট উঠোনে একপাল মুর্গি চরছিল। আয়মনি মুর্গি-গুলিকে হটিয়ে দিল। তারপর আবার বলল, এসো।

বারান্দায় তক্তাপোশে এক প্রৌঢ় বসে বাঙলা পুঁথির পাতা ওলটাচ্ছিল। শক্ত সমর্থ এক মানুষ সে। তার শরীরটি তাগড়াই। খালি গা। পরনে শুধু লুঙ্গি। তার মুখে একরাশ দাড়ি। সে অবাক হয়ে তাকাল। তখন আয়মনি মৃদু হেসে বলল, বাপজি, বলো তো এই ছেলেটা কে?

প্রৌঢ় লোকটি একটু হাসল।...কে রে আয়মনি? আমি তো চিনতে পারছি না।

আয়মনি রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের পিরসাহেবের ছেলে। ঘাটের বটতলায় বেচারা একা দাঁড়িয়ে ছিল—না খাওয়া না দাওয়া! ডেকে নিয়ে এলাম।

আয়মনির বাবা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।...আসুন, আসুন বাবা! কী কাণ্ড দেখ দিকিনি! ওদিকে সবাই পিরসাহেবকে নিয়ে মত্ত। কারুর কি খ্যাল নাই এদিকে? এইমাত্র মসজিদ থেকে আসছি। জানতে পারলে তো—

আয়মনি বলল, বাপজি! শিগগির বটতলায় যাও দিকিনি! ধুরি ভেঙে গাড়ি পড়ে আছে। জিনিসপত্র পড়ে আছে। কারুর খ্যাল নাইকো। তুমি যেয়ে দেখো কী ব্যবস্থা হল।

আয়মনির বাবা বারান্দার আলনা থেকে একটা ফতুয়া টেনে ঝটপট পরল। তাক থেকে তালশিরের তৈরি টুপিটাও নিয়ে পরতে ভুলল না। তারপর সে বেরিয়ে গেল। শফিকে তক্তাপোশে বসিয়ে আয়মনি শুকনো কাপড় পরতে গেল ঘরের ভেতর। শফি দেখল, তক্তা-পোশে পড়ে থাকা পুঁথিটা 'কাছাছল আম্বিয়া'। পয়গম্বর এবং বুজুর্গ পুরুষদের কাহিনী। আয়মনি শুকনো শাড়ি জড়িয়ে পেতলের বদনায় জল আনল। বলল, হাতে মুখে পানি দিয়ে নাও ভাই! এবেলা আর গোসল করতে হবে না।'

শফি উঁচু বারান্দায় বসে হাত পা মুখ ধুয়ে ফেললে আয়মনি তাকে একটা গামছাও দিল। একটু পরে সেই তক্তাপোশে মাদুর আর তার ওপর ফুল-লতা-পাতার নকশাওয়ালা একটুকরো দস্তরখান বিছিয়ে আয়মনি তাকে খেতে দিল। আয়মনি পাখা নেড়ে হাওয়া দিতে দিতে বলল, তোমাকে খাওয়াবার কপাল হবে সে কি জানতাম? তাহলে তো মুর্গি জবাই করে রাখতাম। সে কথা বলতে-বলতে বারবার হাসছিল। তার কোনোরকমে আটকে রাখা ভিজে চুল থেকে টপটপ করে জল ঝরে পিঠের দিকের কাপড় ভিজে যাচ্ছিল। আয়মনি বল-ছিল, আম্মাজানের জন্য ভেবো না। ওঁরা দরিবুবুর বাড়িতে আছেন। ওই যে দেখছ তালগাছ, ওটাই দরি-বুবুর বাড়ি। দরিবুবুরা বড়লোক। কোনো অযত্ন হবে না। দরিবুবুর বাড়িতে এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি—তোমার নাম কী ভাই?

শফি আস্তে আস্তে বলল, শফিউজ্জামান।

আয়মনি আবার হেসে উঠল। অত খটোমটো নাম আমার মনে থাকবে না। আমি শফি বলব। কেমন?

সফি একটা তরকারি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইল, এটা কী। আবার হাসিতে ভেঙে পড়ল আয়মনি। মোলান খাও নি কখনও? রূপমতীর বিল থেকে বেচতে এসেছিল আজ। বিলের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে তো! বিলে খালি পদ্ম আর পদ্ম। তুমি দেখে অবাক হবে দুনিয়ার সব পদ্ম কি রূপমতীর বিলেই পুঁতে দিয়েছিল খোদা? সেই পদ্মের শেকড়ের ভেতর থাকে মোলান। বেউ কেউ বলে মুলান। চিবিয়ে দেখো, কী মিষ্টি, কী তার স্বাদ! আমি তো কাঁচাই খেয়ে ফেলেছি। আর শফি, তুমি ভাই এগুলো খাচ্ছ না। খাও। খেয়ে বলো তো কী জিনিস? হুঁ—পারলে না তো? চ্যাং মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে মাসগুলান মসুরির ডালের সঙ্গে বেঁটে বড়া করেছি। তুমি আমিল খাও তো? আমিল-দেওয়া পুঁটি মাছ পেলে আমার তো আর কিছু রোচে না।

আমিল বা তেঁতুল কিভাবে সংগ্রহ করেছে আয়মনি, সেই গল্প বলতে থাকল। ওদিকে একটা পুকুর আছে। তার নাম জোলাপুকুর। ওদিকটায় জোলাদের পাড়া—সেই যারা তাঁত বোনে। তো সেই পুকুরের পাড়ে অনেক তেঁতুলগাছ আছে। হনুমানের পাল এসে তেঁতুল খায়। যদি তুমি ঢিল ছোড়, হনুমানগুলান কী করবে জান? তোমাকে তেঁতুল ছুড়ে মারবে। তখন তুমি আঁচল ভরে কুড়োও যত খুশি। হাসামতী আয়মনির ভিজে চুল খুলে গেল হাসির চোটে। বলল, শফি, তুমি তো পিরসাহেবের ছেলে। কত ভালোমন্দ খেয়েছ। আমরা সামান্য চাষা-ভূষো মানুষ। তোমার সম্মান করার মতো কীই বা আছে?...বলে আয়মনি আবার ভাত আনতে গেল। শফির খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড। আর আমিল-দেওয়া পুঁটিমাছটাও ছিল সুস্বাদু। তার আর কোনো অভি-মান ছিল না। সে শুধু আয়মনিকে দেখছিল। একটু শৌখিন মনে হচ্ছিল যুবতীটিকে। তার কানে সোনার বেলকুঁড়ি ঝিলমিল করতে দেখে মনে পড়ছিল, তার মায়ের কানেও এমন বেলকুঁড়ি নেই। সামান্য পাথর-বসানো দুটো দুল আছে, তা হয়তো সোনার নয়। সাইদার হাতের চুড়িগুলিও তাঁর শাশুড়ির জেদে পরা। নৈলে বদিউজ্জামান মৃদু নসিহত করতেন। তাঁর মতে, অলঙ্কারকে ভালোবাসলে শয়তান হাসে। শয়তানকে হাসবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। আর হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে পয়গম্বরের বালিকাবধূ বিবি আয়েশার শৌখিনতায় পয়গম্বর তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, ওই বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনো সৌন্দর্য নয়। কারণ তা তোমাকে মৃত্যুর পর আর অনুসরণ করবে না। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পর যা তোমার অনুগামী হবে, তা হল তোমার আত্মার সৌন্দর্য। বিবি আয়েশা একবার কানের দুল হারিয়ে ফেলে কী বিপদে না পড়েছিলেন! দুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এদিকে পয়গম্বর সদলবলে রওনা হয়ে গেছেন। যে উটের পিঠে চাপানো তাঞ্জামে আয়েশার থাকার কথা, তা পর্দা-ঢাকা। ফলে উটচালক বুঝতে পারেন নি বিবি আয়েশা কোথায়। শেষে এক ব্যক্তি সেখানে দৈবাৎ এসে পড়েন এবং হুজুরাইনকে দেখে সসম্ভ্রমে নিজের উটে চাপিয়ে পয়গম্বর সকাশে পৌঁছে দেন। পরিণামে বিবি আয়েশার নামে কলঙ্ক-রটনা-কারীরা কলঙ্করটনার ছিদ্র পায়। আর ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ ঘোষিত হয়। কলঙ্ক-রটনাকারীদের জন্য লানৎ (অভি-সম্পাত) বর্ষিত হয়। পবিত্র কোরানে একটি সুরা আছে এ-বিষয়ে। সাইদা, তুমি হুঁশিয়ার! আমার হুজুর পয়গম্বর সাল্লেলাহ আলাইহেস্‌সাল্লাম বিবি আয়েশাকে একটু শিক্ষা দিয়েছিলেন মাত্র।...

শফি শেষ গ্রাস মুখে তুলে থমকে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। উঠোনে যারা এসে দাঁড়িয়েছে এবং শফির দিকে মিটিমিটি হেসে তাকিয়ে আছে, তারা সেই যমজ বোন! শফির শরীর মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল। আর আয়মনি বলল, আয় রুকু! রোজি আয়! এই দ্যাখ, কাকে ধরে এনেছি। আর ও শফি, এই দেখ দরিবুবুর দুই বেটি। দিলরুখ আর দিলআফরোজ। আমরা বলি রুকু আর রোজি।

রুকু বারান্দায় উঠল। রোজি রান্নাঘরে আয়মনির কাছে গেল। আর রুকু একটু হেসে শফিকে বলল, তখন তুমি রাগ করেছিলে?...

[ক্রমশ

আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১২

লাল-নীল হলদে-কাগজ

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে যাওয়া। মেজোমামার সেই ছবিটাই মনের মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেনে চড়ার আগে বাবা পই-পই করে বলবেন, জানলা দিয়ে ঝুঁকো না।

এসব যাতায়াতপর্বে বাবা তো আর সঙ্গে থাকেন না। মা-র কাছে সব সাতখুন মাপ। জানলার পাশে বসা নিয়ে দাদার সঙ্গেই যা একটু খুনসুটি হয়।

লাইনের ধারের গাছপালা আর লোহার খাম্বাগুলো কেন যে পেছনে ছোটে, আয়নায় ডানবাঁয়ের উলটো ছাপ পড়ার মতোই আজও সেটা যে রহস্য সেই রহস্যই থেকে গেছে। কিংবা রেললাইনের স্লিপারে দাঁড়িয়ে দূর-দিগন্তে সমান্তরাল দুটো রেখার ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা।

বড়ো-বড়ো সব ইস্কুলেই ম্যাগাজিন বেরোয়। ঢোল-গোবিন্দ সেসব ম্যাগাজিনের পোকা। বিশেষ করে, ভ্রমণকাহিনীগুলো সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। একটা লোকের কথা সব লেখাতেই থাকে। সে হল পানি-পাঁড়ে। যে স্টেশনই আসুক, পাঁড়েজী হাজির। একই সঙ্গে এতগুলো স্টেশনে একই লোক থাকে কেমন করে?

এইসব ভ্রমণকাহিনীর লেখকরা সবাই ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে হাওয়া বদলাতে যেত পশ্চিমে। শিমুলতলা দেওঘর মিহিজাম ঝাঁঝাঁ গিরিডি মধুপুর। এইসব নামের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ইস্কুল ম্যাগাজিনের পাতায়।

ঢোলগোবিন্দ জানত অসুখ করলে তবেই লোকে হাওয়া বদলাতে যায়। ঢোলগোবিন্দর অসুখ করে না কেন?

পম্পা ছিল তার কাছে যেন ব্যাডমিনটনের একটা নেট। ঠুকুস-ঠুকুস করে তার ওপর দিয়ে একবার সান্তাহার আর একবার দর্শনা। এই তার রেলভ্রমণের দৌড়।

সাড়া ব্রিজ এলেই ধুম পড়ে যাবে পয়সা ফেলার। মা জপ করতে থাকবেন দুর্গানাম।

ঈশ্বরদিতে পেঁছে সোরাবজীর চা। সত্যি, সে চায়ের তুলনা ছিল না।

নাটোরে এসে কাঁচাগোল্লা।

মাঝে কোথাও মাটি দাবড়ে হাওয়ায় ঝড় খেলিয়ে সাঁইসাঁই করে ছুটে চলে যাবে দারজিলিং মেল।

যে বড়োপিসিমাকে কখনও দেখি নি, বনগাঁ থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর এল। বড়োপিসিমা ছিলেন ঠাকুরদার প্রথম সন্তান। বাবা ছিলেন দ্বিতীয়।

ঠাকুমা না থাকায় বিয়ের পর থেকেই মা-র ওপর এসে পড়েছিল ছোটোদের মানুষ করার ভার। সেজোকাকা ছোটোকাকাও মারই আওতায় বড়ো হন।

যৌথ পরিবার থাকা অবস্থায় আমার যেসব খুড়তুতো ভাইবোনেরা জন্মেছিল, তারা সবাই আমার মা-র কোলেই মানুষ হয়।

মেজোকাকার বড়ো ছেলে মন্টুই আমার মা-কে 'আম্মা' বলা শুরু করে। মুসলিম প্রতিবেশীদের প্রভাবে নয়, কথাটা ছিল 'আমার মা'-র সংক্ষিপ্ত রূপ। ভাই-বোননির্বিশেষে ওরা সবাই সেই থেকে আমার মা-কে 'আম্মা' বলে আসছে।

অনেক পরিবারেই দেখেছি এই রকমের বিশেষ একেকটা ডাক চালু হয়ে যায়।

মন্টু হওয়ার পর আমি আর দাদা গেলাম ছিটকে। তারও আগে অবশ্য মা-র শূন্য কোল কিছুদিন জুড়ে বসেছিল মঞ্জু। দীনেশ জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে।

বড়োপিসেমশাইয়ের ছিল চার ছেলে তিন মেয়ে। সবার বড়ো বুলিদি। তারপর বোদনদা আর হরিদা। তারপর দুই বোন লিলি আর কেষ্ট। শেষ দুভাই ভন্তু আর নিতু।

বাড়িতে দেখার লোক নেই বলে লিলি, কেষ্ট আর ভন্তু চলে এল আমার মা-র কাছে। নিতুর ভার নিলেন বুলিদি। নিতু এখন লা মার্টিনিয়ারে পড়ায়। ওর বউ শুভা কদিন আগে রাত্তিরে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়িচাপা পড়ে মারা যায়। শেষ জীবনে বোদনদা সংসার-ত্যাগী হয়ে মারা গেছেন সাধুদের এক আশ্রমে।

বাবার ছিল অদ্ভুত স্বভাব। সবার সব ভার নিজে যেচে ঘাড়ে নিতে বাবার জুড়ি ছিল না। সংসার কিভাবে চলবে সে হিসেব বাবার মাথায় আসত না। বাবার ভরসা ছিল মা টেনেবুনে কোনোরকমে চালিয়ে দেবেন।

মা-র হাতে ছিল কি হরিদাদার দইয়ের ভাণ্ড? তাহলে?

এই তাহলেটাই ঢোলগোবিন্দর জীবনের বিস্ময়। বাবা যে জীবনে এক কানাকড়িও ঘুষ নেন নি, লোকে কি মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করত?

দিদির বিয়ের আগে অবধি সংসারটা ঠেলাগোঁজা করে চলত। দিদির বিয়ের পরই যা মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থা হয়েছিল। বিয়েতে মা যা সোনাদানা পেয়ে-ছিলেন তার সবটাই চলে গিয়েছিল দিদির বিয়ে দিতে। তাও তো পুরো পাওনা মেটানো যায় নি। তাই নিয়ে দিদির শ্বাশুড়ির কিটিয়ে-কিটিয়ে লেখা কত চিঠি।

বড়ো ধার ছিল দুর্গাঠাকুরের কাছে। মাড়োয়ারি মহাজন হয়েও মানুষটি ছিলেন হৃদয়বান। আস্তে-আস্তে মাসে-মাসে ওঁর টাকা যেমন শোধ হচ্ছিল হচ্ছিল, তার জন্যে কখনও তাড়া দেন নি।

মুদিখানায় মাসকাবারির টাকা শোধ করা নিয়েই হচ্ছিল জ্বালা।

বাইরের লোকে এসব জিনিস জানতও না। আমি হওয়ার পর দাদা হয়ে যায় সাবালক। দুধ ছাড়িয়ে তাকে চা ধরানো হয়। মন্টু হওয়ার পর সাবালক হয়ে যাই আমি।

ঢোলগোবিন্দদের বাড়ির এই ছিল ধারা।

মা-র সাদাসিধে চেহারায় সেই দৈন্যদশার বিলক্ষণ ছাপ থাকলেও, বাবাকে দেখে সেসব বোঝবার জো ছিল না। পোশাকি হোক বা আটপৌরে হোক, বাবা যাই পরতেন কোনোটাই খেলো জিনিস হত না। জামা-কাপড় সংখ্যায় কম। কিন্তু বাড়িতে কাচা হত বলে বাবা সব-সময়ই থাকতেন ধোপদুরস্ত। এদিক থেকে বড়ো হয়ে দাদা পেয়েছিল বাবার স্বভাব, আমি পেয়েছি মা-র।

এর মধ্যেই কলকাতা থেকে বাবা শখ করে কিনে আনলেন একটা নতুন সাইকেল। অবশ্যই ধারের টাকায়।

নতুন সাইকেল পেয়ে বাবাকে এত খুশি হতে কখনও দেখি নি। রোজ ধুয়েমুছে সাইকেলটাকে বাবা ঝকঝকে তকতকে করে রাখেন।

অদৃষ্টের চোখে বাবার এই সুখ বোধহয় সয় নি। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি আস্তে-আস্তে বাবার

ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেছে। রোজই সাইকেলের একটা না একটা খুঁত ধরা পড়ছে। হঠাৎ এক জায়গার রঙ চটে গিয়ে ধরা পড়ল একটা লম্বা চিড়-ধরা দাগ।

বাবাকে সেই প্রথম ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে দেখেছিলাম।

সেদিন সকালেই মুদির দোকানের কেউ এ-বাড়ির কাউকে বোধহয় কড়া করে কিছু বলেছিল। আমরা ইস্কুল যাবার আগে খামে একটা চিঠি এসেছিল। তাতে ছিল জয়রামপুরের পোস্টাপিসের ছাপ। নিশ্চয় দিদির শ্বাশুড়িঠাকরুনের চিঠি।

আমরা বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি হৈ-হৈ কাণ্ড। কাকারা বাবাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে সামলাচ্ছে। কাকিমার হাতে কেড়ে-নেওয়া একটা ছুরি।

বাবা নাকি ছুরিটা নিজের গলায় বসাতে গিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িটা তখন কামাখ্যা-থেকে-ফেরা মা-র হাত ধরে নওগাঁ শহরে বেশ খানিকটা নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে।

মেসবাড়িতে লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কেউ থাকেন সপরিবারে অল্প মেয়াদে। কেউ-কেউ ক্ষণিকের অতিথি।

বাইরের লোকদের বেশির ভাগই বদলির চাকরি। আমাদের লাইন বরাবর কোয়ার্টারগুলোও অনবরত এই খালি এই ভরতি।

আজ ভেবে অবাক লাগে, সেকালে সাধারণ গ্রাজুয়েট হওয়াকে লোকে যেখানে তিনটে পাশ দেওয়া বলত—সেই সময়ও এম-এ পাশ করে শুধু নয়, ডকটরেট হয়েও কোন্ হিসেবে লোকে আবগারি দারোগার চাকরিতে ঢুকত?

কলেজ তখন কটাই বা ছিল? কিছু সরকারি, কিছু বেসরকারি আর কিছু মিশনারি। কলেজের চাকরির চেয়ে সরকারি কাজে কি মাইনে বেশি ছিল? নাকি বেশি ছিল চাকরির নিরাপত্তা?

স্কটিশে ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী। ছেড়ে দিয়ে কোন্ দুঃখে তিনি হতে গেলেন আবগারির ইনসপেকটর? কিংবা ইতিহাসে ডকটরেট পাওয়া যোগেন কাকাবাবু? তিনি তো হয়েছিলেন সামান্য দারোগা। এঁরা কেউই ঘুষ নেওয়ার পাত্র ছিলেন না।

এটা আজও আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না।

কিংবা রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপণ্ডিত সমবায়ের রেজিস্ট্রার সুকুমার চাটুজ্জে? কিংবা তাঁর ভাই অঙ্কের বাঘা ছাত্র খদ্দরধারী অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল বসন্ত চাটুজ্জে?

আবগারিতে আর-একজন ছিলেন, নাম ভুলে যাচ্ছি। বাবা তাঁকে দাদা বলতেন। মাঝে-মাঝে উদয় হতেন মেস-বাড়িতে। ভোরবেলায় তাঁর বাজখাঁই গলার 'রমেশ, চা কর' ডাকে আমাদেরও ঘুম ভেঙে যেত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ছিল তাঁর প্রাণ। তখন বোধহয় মহাস্থানগড় নিয়ে খুব কাজ চলছিল। একেকবার আসতেন আর গদগদ হয়ে বলতেন পুরনো সেইসব দিনের কথা। সরকারি চাকুরে হয়েও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন গবেষক। চাকরির ছুতো করে একবার রাজশাহী একবার মালদহ ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর কাজ।

দেশের প্রতি এঁদের ভালোবাসার অন্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও কেন তাঁরা সাধ করে সরকারি চাকরির শেকলে নিজেদের বেঁধেছিলেন, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। নাকি আমাদের স্বদেশী আন্দোলনেই মাথামোটা ভাবটা এত প্রবল ছিল যাতে জ্ঞানবুদ্ধির চর্চা আর সূক্ষ্ম চারুবোধ রাজনীতির দিকে তেমন ঘেঁষে নি। একজন নজরুল আর একজন মুকুন্দদাসকে ঠেকিয়ে দিয়ে এঁদেরকে মস্ত ঘাটতিটা ঠিক পূরণ হয় না।

যোগেনকাকাবাবু ছিলেন কিছুদিন আমাদের প্রতিবেশী। ঘরকুনো মুখচোরা গোছের ভালোমানুষ। বইয়ের পাহাড় দেখে লোকে বুঝত পণ্ডিতমানুষ। তার ওপর অবিবাহিত বলে পারলেই লোকে ওঁর পেছনে লাগত। কারো সাতেপাঁচে থাকতেন না বলে কারো মনে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেন নি।

পরে এলেন নিখিলকাকাবাবু। ওঁর ছোটো ছেলে খোকা। লোকে যাকে সিনেমার অভিনেতা দিলীপ রায় বলে জানে। সেই খোকা তখনও হয় নি। বড়ো ছেলে শিবু ছিল আমার সমবয়সী।

পাশাপাশি থেকে আমাদের দুটো পরিবার আত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। তার পেছনে ছিল মা আর কাকিমার হলায়-গলায় বন্ধুত্ব।

কাকিমা আর মা-র চেহারার মধ্যেও বেশ খানিকটা মিল ছিল। দুজনেরই রঙ ছিল কালো। পরনে লাল-পাড় সাদা শাড়ি। প্রায় শাঁখাসর্বস্ব হাত। কাকিমার কপালের লাল সিঁদুরের টিপটা শুধু হত মা-র টিপের চেয়ে আকারে বড়ো।

নিখিলকাকাবাবুর সঙ্গে বাবারও খুব ভাব হয়ে গেল। যদিও দুজনের দু-রকমের স্বভাব। নিখিল-কাকাবাবু ছিলেন দিলদরাজ ফুর্তিবাজ মানুষ। খরচও করতেন দুহাতে।

ও-বাড়িতে ভালোমন্দ যা হত, আমরাও তার ভাগ পেতাম।

শিবুর দুই মামা ছিলেন। একজন বোধহয় অমূল্য-মামা। ক বছর আগে শেষ দেখা হয় আনন্দবাজারে। তার আগে একবার হঠাৎ শেয়ালদায়। বানপুরের ট্রেনে তাঁর জ্যাঠতুতো দাদাকে তুলে দিতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত আর বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের বাবা। আলাপ হয়ে কী ভালো যে লেগেছিল বলার নয়। ফিরে এসে সেদিন খালি কাকিমার কথা মনে হয়েছে।

পরে যখন কলকাতায় আবার দেখা হয়, কাকিমা মা-কে একটা বড়ো টেবিল ফ্যান দিয়েছিলেন। সেও কি আজকের কথা? বছর বাহান্ন আগে। খোকা তখন কাকিমা-র কোলে। টুলু, পরিতোষ, খুকী—সবাই তখন ছোটো। বড়ো হয়ে ক্যারিকেচারে নাম করেছিল পরিতোষ।

কলকাতায় ছেলেবেলায় বাড়িতে আমরা কখনও পাখার হাওয়া খাই নি।

তাতে খুব একটা কষ্ট হত বলে তো মনে পড়ে না। তার হয়তো দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, কলকাতায় তখন এত বাড়ি হয় নি। চারপাশে গাছপালা ডোবা-পুকুর খোলা জায়গা তখন বিস্তর। অন্তত দক্ষিণ কলকাতায় তো বটেই। ফলে, রোদেপোড়া এত ইঁট আজকের মতন এভাবে শহরের মানুষকে দগ্ধে মারত না। দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান কলকাতায় অন্তত ভবানীপুর পর্যন্ত মশার কোনো উপদ্রবই ছিল না।

আমাদের বাড়িতে খানিকটা মোটার ধাত ছিল বলে মা-ই যা একটু গরমে হাঁসফাঁস করতেন। কাকিমাদের বাসাটা ছিল লেক প্লেস আর সরদার শঙ্কর রোডের মোড়ে ও-অঞ্চলের শেষ বাড়ি। কাকিমাদের বাড়িতে গিয়ে পাখার নীচে বসেই মা বলতেন 'আঃ, বাঁচলাম।' কাকিমা-র সেটা নজর এড়ায় নি।

কাকিমা-র দেওয়া সেই টেবিল ফ্যান খুলে ক বছর আগেও দিদিকে হাওয়া খেতে দেখেছি। পুরনো সেই-সব জিনিসের কী জান ছিল!

নওগাঁয় কাকিমা-র কাছে এসে থাকা শিবুর ছোটো-মামার কথাও মনে পড়ে। কী যেন ভালো নাম? নাঃ, মনে পড়ছে না। ছোটোমামার বয়স বেশি ছিল না। লেখাপড়া বেশিদূর না হওয়ায় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মেয়ে-ইস্কুলের বাস চালাবার একটা কাজ। তাই নিয়ে পাড়ায় কেউ-কেউ হাসাহাসিও করত। তার কারণ, ছোটোমামাকে প্রায়ই দেখা যেত, ঘুরেফিরে প্রায়ই গোঁফ ঠিক করার ছল করে আরশিতে নিজেকে দেখছেন।

মেসবাড়ির উত্তরদিকের যে ফ্ল্যাটে দীনেশ জ্যাঠামশাইরা থাকতেন, সেখানে পরের পর কত পরিবার এল গেল।

যাঁদের বাড়িতে একজন বাঁদী ছিল, যে হয় রসুই পাকাত নয় রান্নার যোগান দিত, অসম্ভব ময়লা শাড়ি আর নোংরা গায়ে সব সময় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, ফেলে-দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খেত—তাঁদের কথা সম্ভবত আগেই বলা হয়ে গেছে।

পরে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা পশ্চিমবাঙলার মুসলমান। তাঁদের চালচলনে একেবারেই কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। আমার বাবাকে বলতেন দাদু। দাদা কথাটাতে আরেকটু আদর মাখিয়ে। ওঁর মেয়ে ডলিদি।

হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুব ভালো গান গাইতেন ডলিদি।

একদিনের কথা মনে আছে। ওঁদের বাড়িতে গিয়েছেন স্বামী বাসুদেবানন্দ। একটা ঘরে স্বামীজীর পাশে আমি বসে আছি। ডলিদি হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন। কিছু রবীন্দ্রনাথের গান। কিছু মীরার ভজন। গানগুলো স্বামীজীর যে কী ভালো লেগেছিল বলার নয়। রেকাবিতে করে স্বামীজীকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তিনি তার পুরোটাই চেঁছেপুঁছে খেয়ে নিয়েছিলেন।

একদিকে যেমন হিন্দুয়ানির গরম, তেমনি উচ্চজাত নীচুজাত—এই জ্ঞানটা বড়োদের মধ্যে ছিল তখন টনটনে।

তুলসীদাস-কবিরের অতসব উদার মনের দোঁহা আওড়ালেও ঠাকুরদাকে দেখেছি এসব ব্যাপারে একটু টুসকি দিলেই কেন্নোর মতন গুটিয়ে যেতেন। বাবা অত মাটিরমানুষ হয়েও এসব ব্যাপারে একটু ঠোকা লাগলেই ভেতরের খড় বেরিয়ে পড়ত।

আচ্ছা, ঢোলগোবিন্দ বলেছে কি ছেলেবেলা থেকেই চুলকাটাকে কেন ও যমের মতো ভয় করে?

গোড়ায় মাঝে-মধ্যে বাড়িতে এসে যিনি আমাদের চুল কেটে দিয়ে যেতেন, তাঁর চেহারায় ছিল একটা রুক্ষ কড়া ভাব। কথার মধ্যেও তাঁর একবিন্দু রসকষ থাকত না। এক তো অনন্তকাল ঘাড় হেঁট করে বসে থাকো, চড়-চাপড় দিয়ে মাথা ঘোরানো। সেইসঙ্গে লোহার চিরুনি আর কাঁচির খোঁচা দিয়ে বাপের নাম ভোলানোর তাঁর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা।

কিছুদিন পরে শুনি বাড়ি বয়ে আর তিনি চুল কাটতে আসবেন না। চুল কাটতে হবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে।

তার কারণ, তপশিলী হওয়ায় তাঁর ছেলে তখন বি-এ পাশ করে ডেপুটির চাকরি পেয়েছে। ছেলের মান রাখার জন্যেই তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

ওঁদের বাড়ি ছিল ট্রেজারি পেরিয়ে বাজারের কাছাকাছি এক পাড়ায়। চুল সামান্য একটু বড়ো হলেই বাবা আমাদের সেখানে ঠেলে পাঠাবেন। একে তো অতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে যাওয়া। তার ওপর ছেলে পদস্থ হওয়ার পর ওঁর গজগজানিও বেড়ে গিয়েছিল তেমনি। নাকের জলে চোখের জলে হয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে মনে হত —এত বড়ো শহরে আর কি কোনো নাপিত নেই?

ছেলেবেলায় চুল কাটতে যাওয়ার সেই ভয়টা আজ এই বুড়ো বয়সেও ভূত হয়ে ঢোলগোবিন্দর ঘাড়ে ভর করে রয়েছে। নাপিত দেখলে সাধে সে ডরায়?

বসিরসাহেবের বাড়িটা ছিল আরও একটু এগিয়ে। উনি ছিলেন ও-অঞ্চলের ভোটে-জেতা নতুন এম-এল-সি। এখন যেমন বলা হয় এম-এল-এ। ওঁর বাবা ছিলেন গ্রামের এক বিরাট ধনী চাষি। গাঁজার খেতাল তো বটেই, তার ওপর পাটচাষের পয়সা। শহরে বড়ো পাকা বাড়ি। উঠোনে বিস্তর মুরগি।

বাবা কী একটা কাজে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। বসিরসাহেবের বাবা এসে খুব খাতির-যত্ন করে আমাদের বসালেন। কামানো গোঁফ, সেইসঙ্গে বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। লুঙ্গির ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে পায়ের ডিম অব্দি নামানো। পান-দোক্তায় কালো হওয়া দাঁত। খুব বিনয়ী স্বভাব। আদর করে আমার থুতনিটা একটু নেড়ে দিলেন।

উঁকি দিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। বাড়ির আষ্টে-পৃষ্টে খড়খড়ি, চিক আর পরদা।

বাবার সঙ্গে ব্যবহার আবগারির লোকের সঙ্গে গাঁজার খেতালের যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি।

বসিরসাহেবের বাবা ভেতরে যেতে বসিরসাহেব ঘরে ঢুকলেন। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। পরনে সাদা সুট। গলায় লাল টাই। পায়ে সাহেববাড়ির চকচকে প্লেজকিডের দামি জুতো। বাবার সঙ্গে আদাব-বিনিময় হল।

ক্লাস এইট অব্দি পড়া বিদ্যে হলেও বসির সাহেবের চলনে-বলনে ছিল বেশ একটা শানদার ভাব। রাজধানীর মানজায় এই দু-বছরেই চোখে-পড়ার মতন কাজ হয়েছে।

খেতালের ছেলের সামনে বরং বাবাকেই কেমন যেন আড়ষ্ট-আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল। ছেলেমানুষ হলেও দু-পক্ষেরই অস্বস্তি আমি যেন আন্দাজ করতে পারছিলাম। বসির সাহেব চাইছিলেন ঘাড়টাকে চেষ্টা করে একটু শক্ত করে রাখতে। বাবা চাইছিলেন নিজের শক্ত ঘাড় একটু নরম করতে। দুপক্ষেরই ভয় কোনো একটা দিক পাছে বেশি হেলে যায়। যে দেখে তার পক্ষে খুব মজার।

কথার মাঝখানে ভেতর থেকে এসে গেল চা, বিস্কুট আর ডিমভাজা। বাবা কেন ডিমভাজা খেলেন না আমি বুঝেছিলাম। ডিমটা মুরগির বলে। তখনও মুরগি কিংবা মুরগির ডিম খাওয়া হিঁদুয়ানিতে বাধত। বাবা একবার আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে ডিমটা ভেঙে আমি মুখে পুরে দিলাম। আমি তো ছেলে-মানুষ। কোনটা কিসের ডিম আমি কি ছাই অত বুঝি?

ঢোলগোবিন্দ-র গুণের ঘাট নেই। এক তো কিছুই তার মনে থাকে না। না নাম, না দিনতারিখ। তবে আর কিসের স্মৃতিকথা কপচায় সে? তাছাড়া উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়া তো আছেই। ইদানীং আবার গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে তার একটা কথা ফিরে-ফিরে বলবার ঝোঁক। আর তার চেয়েও মারাত্মক, একই কথা দুবার বলতে গিয়ে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়া।

বয়েস হলে এসব মামুল তো দিতেই হবে।

হ্যাঁ, ভালো কথা। বেলুড় মঠে গিয়ে ওর বাবা মা-র দীক্ষা নিয়ে আসার কথা ঢোলগোবিন্দ বলেছিল কি?

মা-র ইচ্ছেয় আর তাগাদাতেই ব্যাপারটা ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। এর সূত্রপাত হয় মা-র সম্পর্কিত মামা পশুপতি দাদামশাইয়ের নওগাঁয় মুনসেফ হয়ে আসার পর। পশুপতি দাদামশাই ছিলেন স্বামী বাসুদেবানন্দের দাদা। এমন আত্মভোলা ভালোমানুষ বড়ো একটা দেখা যায় না।

বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে। বাবামা কে দাদুদিদিমা বললেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের আমরা দাদা-দিদিই বলতাম। বড়ো ছেলে পান্টুদা ছিলেন আমার ছোটো-কাকা-সেজোকাকার বয়সী। গোপালদা আমার দাদার সমবয়সী। জগন্নাথ ছিল আমার বন্ধু। ওঁদের সারা বাড়ি ছিল আমার আর দাদার গান আর আবৃত্তির ভক্ত।

স্বামী বাসুদেবানন্দের ডাকনাম ছিল পটল মহারাজ। বাগবাজারের আশ্রমে থাকতেন। 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক ছিলেন। বেদ-উপনিষদে তাঁর ছিল অসাধারণ দখল। ওঁর আরেক দাদা থাকতেন কলকাতায়। গৃহী হলেও তাঁর মধ্যেও ছিল প্রবল ধর্মভাব। কলকাতায় ফিরে এসে ছেলেবেলায় তাঁর মুখেই প্রথম লেনিনের নাম শুনেছিলাম।

ঠাকুরদেবতায় ভক্তি মা-র বরাবরই ছিল। একটু বয়স হলেই কারো না কারো কাছে মন্ত্র নেওয়া সে সময়ে ছিল রেওয়াজ। বাবা কেন, ঠাকুরদার মধ্যেও ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের কোনো টান দেখি নি। লক্ষ্মীপুজো, ব্রত-উপবাস—এসব করলেও কারো শিষ্য হওয়ার ইচ্ছে মা-র মধ্যে খুব প্রকট ছিল না।

মা হঠাৎ বাবাকে নিয়ে বেলুড় মঠে মন্ত্র নিতে কেন ছুটলেন তার কারণটা খুলে বলতে কখনও দ্বিধা করেন নি।

"মন্ত্র নিলে মাছ মাংস ছাড়তে হয় বলেই তো এতদিন কোনো গুরু পাকড়াতে চাই নি। পশুপতি মামাই বললেন ও সবের কোনো বালাই থাকে না বেলুড় মঠের শিষ্য হলে। সেইজন্যেই তো—"

বাবা তাঁর বন্ধুমহলে বেশ একটু গর্বের সুরেই বলতেন—

"এ তো তোমার গিয়ে ধুনী-জ্বালানো হেঁপ্জি পেঁপ্জি বাবাজী নয়। আমাদের গুরু হলেন মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ। মহাপুরুষ মহারাজ। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ শিষ্য। এমন ভাগ্য কজনের হয়?"

কিছুদিন এই চলল।

মেজোকাকা তখন জুট আপিসে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন কলকাতায়। বাইরের ঘরের বদলে ওঁদের ঘরটা হয়েছে এখন মাবাবা-র শোবার ঘর। এক কোণে আগে যেখানে ভিড় করে ছিল দেবদেবীর ছবি, সেখানে এসে জায়গা জুড়ে বসেছেন রামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী আর স্বামী বিবেকানন্দ।

বাবা প্রাতঃস্নান সেরে মালা জপতে বসেন। আমাদের চোখে কেমন যেন বেমানান লাগে।

বাবার মতন অস্থির মানুষ কতদিন চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে মালা জপ করেন সেটা দেখবার।

ভক্তির ভাব না কমলেও আসলে বসে থাকার মেয়াদটা আস্তে-আস্তে কমে গিয়ে বাবার মালা জপার পাটটাই শেষ পর্যন্ত উঠে গেল। বাবার ধাত যাঁরা বুঝতেন, মা বা পশুপতি দাদামশাই, তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন—ওতে কিছু হয় না। আসলে নাম করা নিয়ে কথা। ঠাকুর বলেছেন, যারা দিনে একবার মনে-মনে তাঁকে স্মরণ করে, তাদেরও সমান পুন্যি হয়।

অর্ধাঙ্গিনী তো। মা তাই নিজের পুজোপাট বাড়িয়ে দিয়ে বাবার এই ঘাটতি পুরণে বেশি-বেশি করে মন দিতে শুরু করলেন।

এসে গেল হৈ-হৈ করে পুজো।

সেবার আর দেশের বাড়িতে আমাদের যাওয়া হল না। সামনেই নদীতে দুরপাল্লার সাঁতার। করোনেশন থিয়েটারে আসছে কী এক অপেরা কোমপানি। গণপতির ম্যাজিক। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুক। বায়োস্কোপ দেখানো হবে 'আঁধারে আলো'।

ঘোড়ার গাড়িতে ব্যানড বাজাতে-বাজাতে বিলি হবে বিজ্ঞাপনের লাল-নীল হ্যানডবিল।

মন্টু চলে গিয়ে এখন মা-র কোল জুড়ে বসেছে

আমার মা-মরা পিসতুতো ভাই ভন্তু। লিলি আমার বয়সী। ও কেমন যেন একটু কাঠ-কাঠ। ছোটোবেলায় তেমন আদর পায় নি বলে সবার আদর কাড়তে চায়। কেষ্ট ধীরস্থির মেয়ে। বড়োপিসিমা কেন মেয়ের নাম কেষ্ট রেখেছিলেন জানা হয় নি। রঙ একটু ময়লার দিকে বলে কি? অথচ কেষ্টকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলাম।

মা-র কামাখ্যা-ফেরত ছেলেবন্ধুরা আর তস্য বন্ধুতে মিলে আমাদের বাড়ি রীতিমত আড্ডাখানা। তার ফল হল এই যে, আমার সেজোকাকা-ছোটোকাকা বিস্তর সমবয়সী বন্ধু পেয়ে গেল।

সে আড্ডার মধ্যমণি আমার মা।

একদল ছিল গানজন্ত প্রাণ। বাকিরা খেলাধুলো সমাজসেবা আর দস্যিপনা নিয়ে থাকত। মা-র গলায় সুর ছিল না বলে শেষের দলটার সঙ্গেই ছিল বেশি ভাব। মা ছিলেন তাদের রুগীর সেবায় রাত জাগার সঙ্গী। প্রথম দলে চিত্তকাকা-বিশুকাকারা। দ্বিতীয় দলে ন্যাদনদা-আলুদারা।

চিত্তকাকা কাজ করতেন ব্যাঙ্কে। ও'র ছিল গানের একটা বাঁধানো খাতা। সেই খাতায় লেখা থাকত গোটা-গোটা সুন্দর অক্ষরে রবিঠাকুরের গান। ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়তেন সাঁওতাল পরগনার দিকে। গানের খাতাটাই ছিল ও'র ডায়রি। তাতে থাকত নানা জায়গার নাম। গিরিডি ডোরান্ডা তারগণ্ডা।

কেষ্টঠাকুরের মতো ছিল তাঁর গায়ের রঙ। সাদা খদ্দরের ধুতি পানজাবি। তার ওপর থাকত সাদা খদ্দরের একটা চাদর। ফলে, বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড়ো দেখাত। কথা বলতেন খুব নীচু গলায়। চালচলনে ছিল কবি-কবি ভাব। পাশ থেকে আঁচড়ানো লম্বা চুল হাঁ-মুখে এসে পড়ত। সেই চুল দাঁতে কামড়ানো ছিল তাঁর মুদ্রাদোষ। মাঝে-মাঝে চোখদুটো ওপর দিকে তুলে উদাস হয়ে তাকাতেন।

সব বাড়িতেই চিত্তকাকার ছিল অবারিত দ্বার। আর সেই সঙ্গে অন্দরমহলে ঢোকার অবাধ অধিকার।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে চিত্তকাকার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। খদ্দরটা ছিল তাঁর কাছে শুধু শুচিশুভ্রতা আর শুশ্বাচারের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য আর রবীন্দ্রসংগীত ছিল ও'র পরম প্রিয়। সেসব গান উনি কার কাছে শিখেছিলেন ভগবান জানেন। পরে পদে-পদে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সুরগুলো ভুল ছিল। হোক ভুল। তবু সেই ভুল সুরেই মনে-মনে সেইসব গান গেয়ে আজও যারপরনেই আমাদের সুখ।

দুটো ছুটিতে লোকনাথপুরে থেকে দুটো জবর জিনিস হারিয়েছি।

এক তো গান্ধীজীর নওগাঁ সফর। ঠাকুরদা বলতেন গাঁধী। ফুটবলের মাঠ নাকি লোকে ভরে গিয়েছিল। ফিরে এসে ওই ভিড় হওয়ার কথাটুকুই যা শুনেছি। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে গেছেন। ব্যাস, ওই পর্যন্ত।

আর এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর 'চা পান না বিষপান' তখন সারা শহরে লোকের মুখে-মুখে ঘুরছিল।

আমাদের পাড়ায় তখন নবাগত অনেকেই। যেমন, সান্টারা। মেসবাড়িতে সুশীল গুপ্ত। সুশীলদার বউ বি-এ পাশ। বিয়ের আগে ছিলেন মাস্টারনি। নিঃসন্তান বলে বৌদির কাছে আমাদের আদরের শেষ ছিল না।

পুকুরের পুবে যে দোতলা কুঠিতে মবিনুদ্দিনসাহেব থাকতেন সেখানে এসেছেন রঞ্জিত চৌধুরী। ও'র মেয়ে করুণা তখন এইটুকু। ওর কী একটা বড়ো অসুখে মা রাত জেগে সেবা করেছিলেন। সেই থেকে ও'রা হয়ে গেছেন আমাদের আত্মীয়ের মতো।

মফসসল জীবনে এইরকম হয়। আলাপ থেকে আত্মীয়তা জন্মাতে দেরি হয় না।

সুশীলদার বাড়িতেই প্রথম খেয়েছিলাম ভাজা স্নাইপ পাখি। ঠাকুরদা কখনও 'স্বাদ' বলতেন না। বলতেন 'তার'। সেটা এখনও আমার মুখে লেগে আছে।

সান্টা আমার চেয়ে সামান্য বড়ো। কিন্তু পড়ে আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে। সান্টা আর আমি ছিলাম বউদির সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমার মা-র মতন বউদিকে তো আর হে'সেল ঠেলতে হত না আর নিজের পরের মিলিয়ে একগাদা ছেলেপুলে মানুষও করতে হত না। কাজেই আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করবার সময় ছিল অঢেল।

আমরা ছুটির শেষে ফিরতেই বউদি ডেকে পাঠালেন সান্টাকে। বললেন, আচ্ছা, এবার তোমরা শোনো আচার্য পি. সি. রায়ের বক্তৃতা।

সান্টার বক্তৃতা দেওয়ার সেই ভাবটা আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। ওর একটা হাত হাফ প্যানটের বাঁ-পকেটে ঢোকানো। মাথাটা এমনিতেই ওর একটু হেলানো থাকত। একবার শুনে টানা অত বড়ো বক্তৃতা কী করে ও মনে রেখেছিল, আশ্চর্য! শুনতে-শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে সে বক্তৃতা কিভাবে নাড়া দিয়েছিল বলার নয়।

বাঙালিকে বড়ো হতে হবে। হ্যাঁ, ব্যাবসাতেও। অন্যেরা যা পারে কেন বাঙালিরা তা পারবে না? কেন বাঙালি চাকরিচাকরি করে মরবে?

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম বড়ো হয়ে সান্টা নেতা-গোছের কিছু হবে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবে। ওদের পরিবারে স্বদেশিয়ানার একটা ঐতিহ্যও ছিল। নিদেন পক্ষে হবে একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী।

হয় নি। শেষ পর্যন্ত সারা জীবন সরকারি চাকরি করে রিটায়ার করার পর হয়েছিল হোমিওপ্যাথ ডাকতার। তারপর একদিন হঠাৎ মারা যায়।

বউদি ছিলেন ঢাকার মেয়ে। আমার মা-কে 'মাসিমা' বলতেন। বউদির 'স'টা ছিল একটু হিন্দিঘেঁষা। তালব্যের চেয়ে দন্ত্য বর্ণের দিকেই বেশি ঝোঁক পড়ত। এই নিয়ে বউদির পেছনে লাগতে আমরা ছাড়তাম না।

বউদি ছিলেন 'প্রবাসী'র গ্রাহক। বিয়ের আগে থেকে। আলমারিতে ছ-মাস ছ-মাস করে পুরনো সব সংখ্যা বাঁধানো অবস্থায় থাকত। পত্রিকার জন্যে মানুষ যে কী অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে বউদির বেলায় তা দেখেছি।

তখনও আমার ঠিক পত্রিকা পড়ার বয়স হয় নি। তবু নতুন কাগজ এলেই পাতা উলটে-উলটে দেখতাম। প্রথম পৃষ্ঠায় রবিঠাকুরের একটা লেখা থাকবেই।

রোজই বউদির কাছে গিয়ে আমার পড়বার কথা থাকত। পড়া শুরু করে বউদিকে গল্পে ফাঁসিয়ে দিতাম। কিংবা অঙ্ক ধরিয়ে দিতাম। বউদি ছিলেন অঙ্কে কাঁচা। কাজেই পড়া ভন্ডুল হতে দেরি হত না।

কোনো-কোনোদিন সান্টাকে ডেকে নিয়ে এসে আমরা বসতাম প্ল্যানচেটে। বউদির ছিল একটা তিন-পায়া টেবিল। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতেন সুশীলদার বেকার ভাগনে মণিদা।

প্ল্যানচেট নিয়ে খেলাটা আমাদের বেশিদিন টেঁকে নি। পরলোকের মানুষদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগার সেটা বয়স নয় বলেই বোধহয় ও-ধরনের পাকামিতে মন সায় দিত না।

মণিদা ছিলেন আড়ালের মানুষ। খুব চুপচাপ। একটিপ নস্যি নিয়ে বসে থাকতেন। মাঝে-মধ্যে দু-একটা মোক্ষমধরনের ফোড়ন কাটতেন।

ওই বয়সেরই ছিলেন আরেকজন। কালুমামা। বাবার কোন্ এক যেন বন্ধুর শালা। খুব পান খেতেন। সেই জন্যেই বাড়ির গিন্নিদের সঙ্গে খুব ভাব জমাতেন। বাড়ি ছিল বোধহয় মদন বড়াল লেনে। কলকাতার ঘটি বলতে যা বোঝায়। সবাইকে বাঙাল ঠাউরে খুব রাজা-উজির মারতেন। পরে কলকাতায় এসে একবার দেখা হয়েছিল। সরুসা সরু এক এঁদো গলিতে হাড়জিরজিরে একটা বাড়ির পৈঁঠেয় গায়ে কোঁচার খুঁট জড়িয়ে বসে পাড়ার ধাড়ি ছেলেদের টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলা। আমি 'কালোমামা' বলে ডাকতেই কেমন যেন চুপসে গিয়ে দূর থেকে হাতটা উঁচু করে ক্ষীণ গলায় বললেন, "সব ভালো তো?" মুখটা নামিয়ে নেওয়ায় আমি আর উত্তর দেবার জো পেলাম না।

সে যাই হোক, এই বউদিদিই কিন্তু প্রথম আমাকে লেখার কথা বলেছিলেন।

এই জায়গায় ঢোলগোবিন্দকে একটা জিনিস একটু সমঝে দেওয়া দরকার। দেখো ঢোলগোবিন্দ, এ নিয়ে আদিখ্যেতা করে অনেক জায়গায় তুমি অনেক কিছু বলেছ। দেখা গেছে, সেগুলো হুবহু এক নয়। এখানে আবার বেশি তালিবালি কোরো না।

ঢোলগোবিন্দ কোনো কথা দেয় না। ঢোঁক গেলে। কেন আমি জানি। ওর স্মৃতিটা ওর কাছে জ্যান্ত জিনিস। সেটা বাড়ে কমে, রোগা মোটা হয়। যেমন মনে রাখে, তেমনি ভুলেও যায়।

আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। আমাদের ডেকে বউদি একদিন ছুটির সকালে বললেন, "আচ্ছা, আজ তোরা একটা দেশপ্রেম নিয়ে পদ্য লিখে আন তো।"

পদ্য। হ্যাঁ, সে সময় 'কবিতা' কথাটার মোটেই চল ছিল না।

আমি তো সারাটা দিন বসে-বসে মাথার চুল ছিঁড়লাম। মাথায় কিচ্ছু এল না। শেষ অব্দি বউদির কথা রাখতে পরের পর কয়েকটা লাইন সাজিয়ে তাতে আকাশ বাতাস জল মাটি বৃষ্টি শিশির এই গোছের চক্ষু-গোচর মোটা-মোটা কথা লিখে দিলাম।

কাগজটা উলটে-পালটে বউদি বললেন—এর মধ্যে দেশপ্রেম কোথায় রে? তা ছাড়া এ তো পদ্যও হয় নি।

সেই যে দমে গেলাম। তারপর ছ-সাত বছর আর পদ্য কেন, লেখালিখিরই ধারপাশ মাড়াই নি।

এদিকে এক কাণ্ড হল।

নওগাঁয় এলেন এক নতুন এস-ডি-ও। অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে দুটি মেয়ে ছিল ইস্কুলে পড়ার যুগ্যি।

এস-ডি-ও রায়সাহেব মানুষটি খুব ভালো। কিন্তু তাঁর একটা বায়না কে-বি ইস্কুলের হেডমাস্টারকে এমন ঝামেলায় ফেলল বলার নয়।

রায়সাহেবের দুই মেয়েকে ইস্কুলে ভরতি করে নিতে হবে। তা কী করে হয়? এটা তো ছেলেদের ইস্কুল।

মহকুমা হাকিম বলে কথা। তদুপরি রায়সাহেব। উপরোধে শেষ অব্দি ঢেঁকি না গিলে উপায় রইল না।

ঠিক হল, মেয়েদের জন্যে সামনে বসবার আলাদা ব্যবস্থা হবে।

ঢি-ঢি পড়ে গেল সারা শহরে। ঘোর কলি না হলে এমন হয়? ছেলে-ইস্কুলে মেয়ে পড়বে?

হৈ চৈ থেমে যেতে দেরি হল না। যত যাই হোক, মহকুমা হাকিমের মেয়ে। অত যে কড়া হেডমাস্টার, তাঁকেও নরম হতে হল।

কিন্তু গুজবের মুখে হাত চাপা দেবে কে? আজ এই গল্প। কাল সেই গল্প।

ক্লাসের যে ফার্স্টবয়, জান তো তার খাতা চেয়ে নিয়েছে মহকুমা হাকিমের মেয়ে!

শুধু কি তাই? বাড়িতেও নাকি একদিন ডেকে নিয়ে গেছে।

শুনেছ কাণ্ড? ওই ইস্কুলের একটা ছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে? ওদের মধ্যে নাকি চিঠি-চালাচালি হয়েছিল। মেয়েটা বেঁকে বসাতেই ছেলেটার মন ভেঙে গিয়েছিল।

আরে, এ খবর জানেন না! ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবার ফেল করেছে? তাহলেই বুঝুন।

এতদিনে একটা মেয়েঘটিত ব্যাপার পেয়ে শহরের মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গাঁজাগোলায় তখন মন-মন গাঁজা পোড়ানো হচ্ছে। এক কাহনকে তিন কাহন করতে গিয়ে রাস্তাঘাটে নাকে কাপড় দেবার কথাও তখন আর কারো মনে রইল না।

আর ঠিক এই সময়েই আমাদের বাড়িতে ঘটল একটা নিদারুণ শোকের ব্যাপার।

মাত্র একদিনের টাইফয়েড জ্বরে আমাদের বড়ো আদরের কেষ্ট হঠাৎ মারা গেল।

যে রাত্তিরে ওর খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা, আমাকে সে রাত্তিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুভালালদের কোয়ার্টারে।

আমাকে ঘুমোতে হয়েছিল গাঁজার ধোঁয়ায় দমবন্ধ-হওয়া সেই ঘরে। অনেক রাত অব্দি আমি শুধু ভগবানকে ডেকেছিলাম। বলেছিলাম—যা চাও তাই দেব, হে ভগবান, তুমি শুধু কেষ্টকে বাঁচাও।

ভগবান সে কথা কানে তোলে নি। উলটে ধাড়ি বয়সে বিছানাটা ভিজিয়ে দিয়ে আমার মাথাটা লজ্জায় হেঁট করে দিয়েছিল।

তারপর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রঞ্জিত কাকাবাবুদের বাড়ি। রঞ্জিতকাকাবাবুর মা আমাকে খুব আদর-যত্ন করে খাইয়েছিলেন।

একবাটি ঘন দুধ খুব তারিয়ে-তারিয়ে খেয়েছিলাম।

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল কেষ্টর কথা।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে-চাটতে আমি সেদিন মরমে মরে গিয়েছিলাম।

[ক্রমশ

পানজাবের ভবিষ্যৎ

সনাতন মিত্র

গ্রীক থেকে ধার করা একটি ইংরেজি শব্দ গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আমাদের দেশের খবরের কাগজের সম্পাদকীয় লেখক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা খুব ব্যবহার করছিলেন। শব্দটি হল 'ইউফোরিয়া'। মূলত শব্দটির অর্থ সুখবোধ; 'বেশ ভালো আছি', 'শরীরমন বেশ চাঙ্গা'—এইরকম একটা ভাব। কিন্তু ইংরেজিতে কথাটার মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—এমন একটা ফূর্তির ভাব যার কোনো বাস্তব কারণ নেই, যা ভ্রান্ত এবং ক্ষণস্থায়ী।

২৪শে জুলাই রাজীব গান্ধী সংসদে পানজাব-চুক্তির সংবাদ দেওয়া মাত্র সারা দেশে ইংরেজি সংবাদ-পত্রে ওই একটি ইংরেজি কথা নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। নানা সাংবাদিক নানা কথা বললেন, প্রায় সবাই যদিও পানজাব-চুক্তি মোটামুটি সমর্থনই করলেন। তবে এ কথাও পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না—চুক্তিটা ভালো বটে, তবে আপনারা এবং অন্যান্য অজ্ঞ লোকেরা যত ভালো মনে করে লাফালাফি করছেন, অতটা ভালো নয়।

তাঁরা বললেন, দেশে একটা বাড়াবাড়ি রকমের ফূর্তি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সাধু সাবধান—এ নিছক ইউফোরিয়া।

২০ অগসট সন্ত্রাসবাদী শিখের গুলিতে সন্ত হরচন্দ সিং লঙ্গোয়ালের মৃত্যু হল। ইউফোরিয়া-বিরোধীরা বললেন, "কেমন কিনা! দেখলেন তো?" তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার রাজীব গান্ধীকেই দায়ী করলেন এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে। তাঁদের মতে, প্রধানমন্ত্রী যদি ইউফোরিয়ার বশবর্তী হয়ে, 'সব ঠিক হ্যায়' মনে করে পানজাবে নির্বাচন করতেই হবে—এমন অন্যায় জিদ না ধরে বসতেন, লঙ্গোয়াল বেঘোরে প্রাণ হারাতেন না। কেউ বললেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী অপরিপক্কবুদ্ধি, অপরিণামদর্শী; কেউ বললেন, তিনি রাজনৈতিক-স্বার্থান্বেষী, কেবলমাত্র কংগ্রেসের স্বার্থে, এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে বেকায়দায় ফেলবার মতলবে তিনি এমন কাজ করেছেন যা প্রায় লঙ্গোয়ালকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার শামিল। কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় এ বিষয়ে সম্পাদকের নিজের লেখা নিবন্ধ বেরোল; বড়ো-বড়ো অক্ষরে তার হেডলাইন হল: লঙ্গোয়ালের মৃত্যুর জন্যে রাজীবই দায়ী।

খ্রীষ্টীয় মতে, কৃত পাপের জন্যে শুধু অনুশোচনাই

যথেষ্ট নয় ; অন্যায়ভাবে যা-কিছু লাভ করেছি, তা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করতে হবে। মনে হয় না, রাজীব গান্ধী প্রায়শ্চিত্তের তাগিদে পানজাব-চুক্তি কিংবা নির্বাচনের বর্তমান কর্মসূচী বিসর্জন দিতে চাইবেন।

প্রথমে চুক্তিটার কথাই ধরা যাক। অবশ্য, বাড়াবাড়ি কিছুরই ভালো নয়, তবে আজ, লঙ্গোয়ালের মৃত্যুর সপ্তাহ দুই পরেও বলতে কোনো বাধা নেই—চুক্তি নিয়ে দেশব্যাপী স্বস্তিবোধের যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ ছিল। আরও বলা যায়, পানজাব-চুক্তি বিশে অগসটের রক্তক্ষরণের পরেও অম্লান। তা যদি না হত, লঙ্গোয়ালের জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়কে বলতে হত নিরর্থক। শুধু নিরর্থক নয়—ভ্রান্তিপূর্ণ, ধ্বংসাত্মক। একটু আগে যে সংবাদপত্রের কথা বলা হল, সেটিতে নয়, কলকাতার অন্য এক বাঙলা দৈনিকে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে লঙ্গোয়ালের মৃত্যুর তুলনা করে একজন লিখেছেন, গান্ধীজী দেশবিভাগ রোধ করতে পারেন নি, কিংবা করেন নি, অতএব তাঁর মৃত্যুকে 'শহীদের মৃত্যু' আখ্যা দেওয়া ভুল। কিন্তু লঙ্গোয়াল দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে শহীদের মৃত্যুই বরণ করেছেন। গান্ধীজী যদি মনে করতেন—যেহেতু দেশবিভাগ আমি রোধ করতে পারলাম না, অতএব এর পরে দেশের ভাগ্যে কী ঘটুক না ঘটুক আমার তাতে কিছু এসে যায় না ; মানুষে-মানুষে হানাহানি করে শেষ হয়ে যাক—আমি খালি দর্শক হয়ে থাকি ; আমার চোখের সামনে হিংসারই জয়জয়কার হোক, আমি দেখেও দেখব না—তা হলে আরও কয়েক বছর তিনি বাঁচতে পারতেন, তাঁকে মেরে নাথুরাম গড়সে গুলির অপচয় করত না। তেমনভাবে তিনি বাঁচতে চান নি। তাঁর চেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু আর কে বরণ করেছে?

লঙ্গোয়ালও পানজাব-চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন—এর পর ডেমোক্রিসের তরোয়াল তাঁর মাথার ওপর অতি ক্ষীণ সুতোয় ঝুলতে আরম্ভ করবে। জেনেশুনে তিনি চুক্তিতে সই দিলেন। কেন? তার কারণ, শিখদেরকে, পানজাবকে, এবং দেশকে চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাবার সেটাই ছিল একমাত্র পন্থা। তাঁর মৃত্যুর সামনেও মাথা নত করতেই হয়।

পানজাব-চুক্তি চোখের পলকে পানজাব সমস্যার সমাধান করে দিল, তার মনের যত আবিলতা, যত সন্দেহ-অবিশ্বাস-ভয়, চিত্তের গভীরে যার যত হিংসাবৃত্তি, যত আত্মবোধের সংকট, সব নিমেষে ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেল—এমন কথা কেউ যদি ভেবেও থাকে, সেটা ধর্তব্য নয়। কিন্তু চুক্তির খবর পেয়ে সারা দেশে যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল, তা ছিল অতি স্বাভাবিক আর বাস্তবসম্মত। অপারেশন ব্লুস্টার এড়ানো যেত কিনা, এড়ালে ভালো হত না মন্দ—এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। (একটা কথা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায়—সেই অপারেশন নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত সরকারি ঢক্কা-নিনাদ মারাত্মক ভুল হয়েছিল। তবে, আমাদের সরকারের প্রচার যত উচ্চগ্রামে ওঠে, নির্বুদ্ধিতার অতলের দিকে তত নেমে যায়, এ তো সকলের জানা কথা।) কিন্তু স্বর্ণমন্দিরের গায়ে সরকারি ফৌজের গোলাগুলি যত না ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তার চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক গভীর ক্ষত যে সৃষ্টি করেছিল বহুসংখ্যক শিখের চেতনায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার পরে এল দিল্লির দাঙ্গা—দাঙ্গা না বলে তাকে উন্মত্ত হিংসা-মহোৎসব বলাই ভালো। এর পর উগ্র, এমনকি হিংসাত্মক শিখ বিচ্ছিন্নতাবোধকে বাগে আনা যে নরমপন্থী অকালি নেতাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! 'শহীদ' ভিনদ্রানওয়ালের শূন্য বেদীতে 'শহীদ'-পিতা বাবা যোগীন্দর সিংকে এনে বসানো হল, যাতে মধ্যপন্থাকে আরও কাবু করা যায়। তত দিনে সন্ত লঙ্গোয়ালও বুঝতে আরম্ভ করেছেন—বাঘের পিঠে যে সওয়ার, নামলেই তার মৃত্যু। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে, যেমন সারা দেশের পক্ষে, তেমনি শিখদের পক্ষে এবং তাদের বাসভূমি পানজাবের পক্ষেও, আলাপ-আলোচনার পথে সম্মানজনক মীমাংসার দিকে এগোবার চেষ্টা করাই ভালো।

রাজীব তাঁকেই আঁকড়ে ধরলেন। চুক্তি হল। সারা দেশ দেখল—দেশের সংবিধানের মধ্যে থেকেই, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে বিপন্ন না করেই, শিখেরা রাজি হল তাদের আন্দোলন তুলে নিতে। বাবা যোগীন্দর সিং কিংবা জগদেব সিং তালওয়ান্দি যে এই মীমাংসা সহজে মেনে নেবার পাত্র নন, তা তো জানাই ছিল। সরদার প্রকাশ সিং বাদলের কাছে কিন্তু লোকের অন্যরকম আশা ছিল। তিনিও দেখা গেল অসন্তুষ্ট। তবু, দেশের লোক জানত, লঙ্গোয়ালই শিরোমণি অকালি দলের নেতা ; তারা লক্ষ করে আসছিল—উগ্রপন্থী শিখেরা, এমনকি বাবা যোগীন্দর সিং-এর নেতৃত্বে 'সংযুক্ত অকালি দল' গঠনের পরেও, লঙ্গোয়ালের অকালি দলে বিশেষ চিড় ধরাতে পারে নি, টলে ওঠে নি তাঁর নেতৃত্বের আসন। সেই সন্ত লঙ্গোয়াল, যিনি মার্চ মাসের শেষে কলকাতার 'সানডে' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "শিখেরা ভাবতে আরম্ভ করেছে এদেশে তারা থাকতে পারবে কিনা, তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে," তিনিই পানজাব-চুক্তির পর বললেন, "কনফ্রনটেশনের কাল শেষ হল, আমরা এই বোঝাপড়ায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট," তখন দেশের লোক যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল, তাকে অযৌক্তিক মনে করাটাই সন্দেহবাতিকের বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

সন্ত লঙ্গোয়াল চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যেমন দূরদর্শিতার, তেমনি সাহসেরও পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সেই সাহস যা মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও কর্তব্যসম্পাদনে এগিয়ে যাবার সাহস জোগায়। এব্রাহাম লিঙ্কনকে কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নি, কেউ ঠেলে দেয় নি গান্ধীজীকে। রাজীব গান্ধীও বিলক্ষণ জানেন—হাজার নিরাপত্তা সত্ত্বেও যে-কোনো জীবনবীমা কোম্পানির চোখে তাঁর জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ব্যবসায়িক বিবেচনায় অসমীচীন।

লঙ্গোয়ালের মৃত্যুর জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর দাবি খুব ব্যাপক হবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু পানজাব-চুক্তি দল-মত-রাজনৈতিক-স্বার্থ-নির্বিশেষে সকলের অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করে নি, তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মসমিতি এক প্রস্তাবে স্বীকার করেন, "রাজীব-লঙ্গোয়াল মেমোরানডাম অব আনডারস্ট্যানডিং সংঘর্ষের অবসানের আশা যতটা এনেছে ততটা তা জনগণের স্বস্তির কারণ," কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রস্তাব এও বলেছে, "সাতটি পৃথক-পৃথক কারণে এই চুক্তি জাতীয় কর্মসমিতির দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছে।" তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর—আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারের মতের আমূল পরিবর্তন। যে প্রস্তাব সরকার প্রথম থেকে বিবেচনার অযোগ্য মনে করে আসছেন, এমনকি, যে প্রস্তাবের প্রতি প্রশ্রয়দানের অন্যায় অভিযোগ করে বিরোধী দলগুলির সমালোচনা নির্বাচনী সভায় অহরহ করেছিলেন, সেই প্রস্তাবকেই চুক্তিতে স্বীকার করা হল, এবং সারকারিয়া কমিশনের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। এ কেমন কথা? বিজেপি কর্মসমিতির অভিযোগ, সরকার আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবের এমন একটা ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন যা বিভ্রান্তিকর, অসত্য।

এই একই অভিযোগ অন্য অনেক তরফ থেকেও শোনা গেছে। চুক্তিতে যে আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে, এ কি সেই আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব যা নিয়ে অকালি দল এত দিন লড়াই করে আসছিলেন? এ যদি সে-ই হয়, তাহলে অনেক আগেই তো এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেত! এর মধ্যে সেই রাষ্ট্রীয় সংহতি ধ্বংসের বীজ কোথায়, যার কথা রাজীব গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে বারে-বারে বলছিলেন?

প্রশ্নটা অতি সংগত বটে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির দুশ্চিন্তার একটু লাঘব হতে পারত এ কথা বিবেচনা করে যে, আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবের বিবর্তন প্রায় ডারউইনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী টিকে থাকবার প্রয়োজনে আগেই অনেক দূর এগিয়েছিল। আরেকটু এগিয়ে সে প্রস্তাব যদি পানজাব-চুক্তিতে উল্লিখিত রূপটিই পরিগ্রহ করে থাকে, তাতে দেশের লাভ বই লোকসান কেন হবে? যে ব্যাখ্যায় তার মধ্যে জাতীয়-সংহতি-বিনাশের বীজ লুপ্ত হয়ে যায়, সেই ব্যাখ্যাটাই 'অফিসিয়াল', 'অথরিটেটিভ'। ব্যস—আমেরিকানরা যাকে বলে 'পীরিয়ড'। সারকারিয়া কমিশনের কাছে যে আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব গিয়েছে, সেইটাই প্রামাণ্য। এতে ভারতীয় জনতা পার্টির তো খুশি হওয়ারই কথা। আপত্তি অবশ্যই উঠবে উগ্রপন্থী শিখেদের তরফ থেকে, কিছু গোলমালের সৃষ্টি অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু গোলমালের অভাব আগেই কি ছিল? এখন বরং সরকারিভাবে অকালি দলের কাছ থেকে গোলমাল নিরসনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এটাই কি কম?

লঙ্গোয়ালের অকালি দল ২৬ জুলাইয়ের যে সভায় চুক্তি অনুমোদন করে তাতেই, সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, সরদার প্রকাশ সিং বাদল এবং শিখ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির প্রেসিডেনট সরদার গুরুচরণ সিং তোহরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তোহরা বলেছিলেন, শিখ সংগত যে আকারে আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাব পাশ করেছিল, সে আকারে তাকে সারকারিয়া কমিশনে পাঠানো হয় নি। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আপত্তির

পরও অকালি দল পানজাব-চুক্তি অনুমোদন করে, তাতেও কোনো ভুল নেই। এর পরে আর বাইরের কারও পক্ষে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন খুঁচিয়ে না তোলাই ভালো। ভারতীয় জনতা পার্টি যদি সেটা হৃদয়ংগম করেন তাহলেই যথার্থ শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবেন। কেননা, এখনও অনেক বারুদ জায়গায়-জায়গায় জমা হয়ে আছে। লঙ্গোয়াল-নিধন এখনও কোনো-কোনো মহল থেকে অভিনন্দন পাচ্ছে. ১১-১৭ অগসটের 'সানডে' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে জগদেবসিং তালওয়ান্দি বলেছেন, "লঙ্গোয়াল নিজেকে সরকারের কাছে বিকিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তিনি শিখ পন্থকেও সরকারের কাছে বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি শিখদের প্রতিনিধি নন।" তিনি আরও বলেছেন, "রাজীব যা করেছেন তাতে শিখদের ভালো হবে না। কয়েকজন ব্যক্তিকে তিনি কিনে নিতে পেরেছেন, কিন্তু গান্ধী-লঙ্গোয়াল চুক্তি শিখ পন্থের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।" সানডের ওই সংখ্যাতেই বাবা যোগীন্দর সিংকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি আপনারা আপনাদের অধিকার আদায় করে নিতে না পারেন, অস্ত্রগ্রহণ করবেন কি?" উত্তরে তিনি বলেন, "সময় হলেই দেখতে পাওয়া যাবে।"

কিন্তু পানজাব থেকে যা খবর আসছে তাতে মনে হয় শিখদের ওপর বাবা যোগীন্দর সিং-এর 'সংযুক্ত অকালি দলে'-র নিয়ন্ত্রণ যৎসামান্য। অকালি দলেও সরদার প্রকাশ সিং বাদলের মতো ব্যক্তি, আজ না হোক কাল, আশা করা যায়—বুঝবেন যে, লঙ্গোয়াল-প্রদর্শিত পন্থাই শিখ পন্থের বর্তমান কুম্ভীপাক থেকে বেরিয়ে আসবার একমাত্র পথ। তোহরা এবং তালওয়ান্দির কথা অবশ্য আলাদা, তাঁদের পক্ষে এ লড়াই হয়তো বাঁচার লড়াই। অন্যের রক্তের শেষবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে তাঁরা, মনে হয়, লড়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

তোহরা বড়ো সামান্য লোক নন। যে শিখ গুরুদ্বার কমিটির তিনি প্রেসিডেনট—তার বার্ষিক আয় বারো কোটি টাকার মতো, তাঁর হাতে পানজাবের সমস্ত গুরুদ্বারের নিয়ন্ত্রণ, অকালি দলের ক্যাশ বাক্সর চাবি-কাঠিটিও তাঁর হাতে। কিন্তু তোহরার প্রেসিডেনটপদ এখন একটু নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। গত প্রেসিডেনট নির্বাচনে তিনি জিতেছিলেন মাত্র ১৯ ভোটে। গুরুদ্বারের গ্রন্থী এবং প্রচারকদের অনেকের মধ্যেও নাকি তাঁর সম্পর্কে অসন্তোষ জমা হচ্ছে। কারণ, তাঁদের মতে, তিনি নরমপন্থী, এবং তাঁরা নিজেরা চরমপন্থী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তোহরা শিখ বিচ্ছিন্নতাবোধকে উশকে দিয়েই কার্যসিদ্ধি করতে চান। শোনা যাচ্ছে, তিনি এবং বাদল দুজনেই পানজাবে ব্যাপক জনসংযোগ এবং প্রচারের অভিযানে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। বাদল অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান নেতা, একদা পানজাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তোহরার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার কথা তো বলাই বাহুল্য। এঁদের প্রচার এবং জনসংযোগ কোন্ রাস্তায় অভীষ্টসিদ্ধি খুঁজবে, তাঁদের অভীষ্টই বা ঠিক কী, এখনই অনুমান করা কঠিন। তবে, বাদল কিছু দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেবেন, এ আশা অনেকেরই। তোহরার কথা, আগেই বলা হয়েছে, আলাদা।

এই অবস্থায়, অশান্তির সম্ভাবনা—উগ্রপন্থার, এমনকি সন্ত্রাসবাদের থেকে-থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সম্ভাবনা যখন প্রবল, পানজাবে সামনের সেপটেমবরে নির্বাচনের ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? এই একটা বিষয়ে দেশের ছোটো-বড়ো বিরোধী দল অনেক দিন পর একমত হতে পারল : "আদৌ নয়।" নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই এ বিষয়ে আপত্তি শোনা যাচ্ছিল, লঙ্গোয়ালের হত্যার পর প্রতিবাদের সে ঐকতান উচ্চতর গ্রামে উঠল। এক সরকারপক্ষ ছাড়া সবাই উচ্চগ্রামে প্রশ্ন তুললেন, "এই যখন অবস্থা, লঙ্গোয়ালকেও উগ্রপন্থী আততায়ীর হাত থেকে বাঁচাতে সরকারি প্রশাসন অক্ষম, তখন নির্বাচনের পরিস্থিতি যেখানে বিদ্যমান, এ কথা সরকার বলেন কোন মুখে?"

তাঁরা আগেও বলেছিলেন, এবার আরো জোর দিয়ে বললেন, বেশ তো, পানজাব-চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, পানজাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ ভালোভাবে শুরু করার রাস্তা খুলেছে, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার মনোভাব, উগ্রপন্থার অভিশাপ থেকে পানজাবকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, হিন্দু-শিখ বৈরিতার অবসান করে আগেকার সম্ভাব ফিরিয়ে আনবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ; বেশ তো, এখন সে কাজই আগে করা হোক না কেন? সংবিধান তো আগেও বদলানো হয়েছে, না-হয় আরেকবার হল, তাতে ক্ষতি কী? তার বদলে এখন

নির্বাচন করলে হানাহানি আরো বাড়বে, যেসব পারস্পরিক বিদ্বেষ, উগ্রপন্থার দিকে আকর্ষণ শান্ত হয়ে আসতে পারে, তা আবার উগ্র হয়ে উঠবে।

তা ছাড়া, তাদের আশঙ্কা, এখনকার এই সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষদুষ্ট আবহাওয়ায়, আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে যে আবহাওয়া মালিন্যমুক্ত হতে পারত, এখন নির্বাচন করলে তাতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রভাব পড়তে বাধ্য।

এইসব আশঙ্কাকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পানজাব-সমস্যার সমাধানের ভিত্তিটাই শুধু স্থাপন করে দিয়েছে পানজাব-চুক্তি, সমাধান করে দিয়েছে মনে করা ভুল। উগ্রপন্থা এখনও সেখানে বেশ সক্রিয়, লঙ্গোয়ালের মৃত্যুই তার প্রমাণ। নির্বাচন উপলক্ষে তা অবশ্যই, অন্তত সাময়িকভাবে, মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। নির্বাচন যে সাম্প্রদায়িক কলুষমুক্ত হবে, তেমন আশাও বাতুলতা।

কিন্তু নির্বাচন কত দিনের জন্যে পিছিয়ে দিলে ভালো হত? পানজাব কত দিনে সম্পূর্ণ রেহাই পাবে বর্তমান অশান্তি আর বিপথগামী রাজনীতির হাত থেকে? ধর্ম আর রাজনীতির বিস্ফোরক মিশ্রণ কবে বন্ধ হবে সেখানে, কে বলতে পারে? সুস্থতার দিকে একটা যাত্রা শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতুবি রাখলে, সে যাত্রার পথ সংক্ষিপ্ত হবে, সুগম হবে, না দীর্ঘতর, দুর্গমতর হবে—এ প্রশ্নও উড়িয়ে দেবার নয়।

খবর যা পাওয়া যাচ্ছে, এর মধ্যেই জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধের, উগ্রমনোভাবের প্রকোপ কমে আসছে। আনন্দপুর সাহেবে অকালি দলের সভায় লঙ্গোয়াল পানজাব-চুক্তির পক্ষে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছিলেন, প্রকাশ সিং বাদল এবং গুরুচরণ সিং তোহরা যেভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাতেই আঁচ পাওয়া গিয়েছিল, এবারে অকালি এবং শিখ জনমত কোনদিকে ঝুঁকবে। তারপর সে ঝোঁক আরও জোরালো হয়েছে। লঙ্গোয়ালের হত্যার পর তার জোর আরও বেড়েছে বই কমে নি।

লঙ্গোয়ালের ওপর আততায়ীর আঘাত উগ্রপন্থার শক্তিবৃদ্ধি প্রমাণ তো করেই না, বরং সে যে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে, তারই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর মৃত্যু প্রশাসনিক যন্ত্রের পক্ষে লজ্জাকর তো বটেই, কিন্তু উগ্রপন্থার পক্ষেও যে বিশেষ আশার কারণ, তাও মনে করা ভুল। এর মধ্যেই সেইসব অশুভ শক্তি হয়তো বুঝতে আরম্ভ করেছে, মৃত্যুর পরে লঙ্গোয়াল আরও শক্তিমান।

এখন নির্বাচন থেকে পেছিয়ে গেলে সেটা সরকারের পক্ষে অকারণে পরাজয় স্বীকার করার মতো দেখাত। বরং আশা করা যাক—সুস্থ, স্বাভাবিক, সভ্য নাগরিক জীবন যাপনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে এই নির্বাচন। সেও তো একটা লড়াই। সে লড়াইয়ে যে দেশের লোকের অরুচি আছে, এ পর্যন্ত তার কোনো প্রমাণ আমরা পাই নি।

গ্রাহকদের প্রতি

অকটোবর সংখ্যা আমরা যথারীতি গ্রাহকদের কাছে আনডার সার্টিফিকেট অব পোসটিঙ-এ পাঠাব। যাঁরা আমাদের দপ্তর থেকে হাতে-হাতে নিতে চান তাঁরা সেকথা অনুগ্রহ করে ৩০ সেপটেমবরের মধ্যে জানালে সুবিধা হয়। যাঁরা রেজিসটি ডাকে নিতে ইচ্ছুক তাঁরা ৭ অকটোবরের মধ্যে তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাঠাবেন—এই অনুরোধ।

একদেশদর্শী বিশ্লেষণ

রামমোহন রায় : এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা—প্রদীপ রায়। বুক ট্রাস্ট, কলকাতা-৯। পৃ ১৬৮+গ্রন্থপঞ্জী। ষোলো টাকা।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকা যখন নবপর্যায়ে বেরুতে শুরু করে, তার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই বর্তমান সমালোচক ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে একখানি অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন (মে, ১৯৮৪, পৃ ১০০-১০৫)। দেশে বিদেশে, ১৮৩৩ সনে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর সময় থেকে অদ্যাবধি রামমোহন-চর্চার নানা ধারার উল্লেখ করার পর সেখানে এ-রকম একটি মন্তব্য ছিল : "রামমোহনের প্রয়াণের অর্ধশতবর্ষ-পূর্তির কালে তাই অধ্যাপক দিলীপ-কুমার বিশ্বাস যখন সবিস্তারে রামমোহনের চিন্তার সমগ্ররূপটি আবিষ্কারের পর আমাদের সামনে তুলে ধরেন তখন সেই গবেষণার ফসলকে রামমোহন-চর্চায় অমূল্য এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সংযোজন বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে দ্বিধা দেখি না।" গত কয়েক বৎসরে প্রকাশিত রামমোহন-সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ-প্রবন্ধের মধ্যে 'রামমোহন সমীক্ষা' শীর্ষক গ্রন্থটি বিপুল সমাদর লাভ করে বাঙালি সমাজে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার- প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারও উল্লেখ্য। ঠিক এক বছর পরে এই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাতেই রামমোহন-বিষয়ক এমন একখানি গ্রন্থ সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি যার তুল্য নিম্নমানের গ্রন্থ খুব কমই পড়েছি। এই গ্রন্থটি রামমোহন চর্চায় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় সংযোজন, কেননা গ্রন্থটির প্রায় প্রতিটি বক্তব্যই অসত্য, অসার এবং আপত্তিকর। একদিকে তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং নানা সমসাময়িক দলিল ও প্রাথমিক আকর সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখকের ধারণার অভাব যেমন প্রতি পদে পদে প্রকট, তেমনি মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে লেখকের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব এবং ফলত অপ-প্রয়োগ, মিলে-মিশে বদহজমে আক্রান্ত গবেষণা-গ্রন্থটি সেই ইংরিজি প্রবাদ-বাক্যটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে অশিক্ষার চেয়ে অল্প-শিক্ষা অনেক বেশি ভয়ংকর।

আমাদের এই শ্রেণীসচেতন আত্ম-কেন্দ্রিক গরিমাসর্বস্ব দেশে তথাকথিত

গ্রন্থসমালোচনা

বুদ্ধিজীবী মানুষেরা সার্টিফিকেট দেবার জন্য সর্বদাই কলম উঁচিয়ে থাকেন। তাই দেখি অরবিন্দ পোদ্দারের মতো প্রবীণ অধ্যাপককেও (যিনি নিজেও পেশাদার ঐতিহাসিক নন) 'ভূমিকা' লিখতে, যিনি অনায়াসে মন্তব্য করেন "রামমোহনের ব্যক্তিত্বের একটি সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে বিশ্লেষণে তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।" বস্তুত, আলোচ্য গ্রন্থটিতে রাজা রামমোহনের সামগ্রিক পরিচয় তো নেই-ই, কিছু-কিছু দিকে যে আলোচনা আছে তা এমন একদেশদর্শী যে মনে হয় আগে সিদ্ধান্ত ঠিক করে পরে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। রামমোহন বিষয়ে ইতিহাসচর্চার দুটি সার্থকতা এখনও থাকতে পারে। এক, রামমোহন সম্পর্কে আমরা যা জানি না, তেমন তথ্য আবিষ্কার এবং সূত্রনির্দেশ ; এবং দুই, নতুন তথ্যাবিষ্কার না করেও পুরানো জানা তথ্যগুলিকে নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে নতুন যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্ত হাজির করা। দুর্ভাগ্য-বশত লেখক এর কোনোটিই করতে পারেন নি এবং সেই কারণেই গ্রন্থটি অপ্রয়োজনীয়। প্রদীপ রায় নিজেই লিখেছেন, "একথা অনস্বীকার্য যে ঐতিহাসিক পুরুষ হিসাবে রামমোহনের মূল্যায়ন ইতিহাসভিত্তিক এবং নৈর্ব্যক্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়" অথচ নিজেই লেখার সময় এই মহৎ সাধ্‌ব্যাক্যটি মেনে চলেন নি।

লেখক একটি 'উপক্রমণিকা' দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, যার নাম 'বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে রামমোহন'। প্রথম নিবন্ধেই ধাঁধা ; লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে যেহেতু উত্তরকালে ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড, যা মার্শম্যানের ইংরিজি বইয়ের অনুবাদ) লিখতে গিয়ে রাম-মোহন সম্পর্কে উল্লেখ করলেও তাঁর সমাজসংস্কারপ্রচেষ্টার বিষয়ে কিছু লেখেন নি, সুতরাং "একথা ভাবা কি অযৌক্তিক হবে যে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে সমাজ-সংস্কারকরূপে যে-অগ্রচারীর ভূমিকায় রামমোহন এতাবৎকাল নির্দিষ্ট তার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।" পুনর্মূল্যায়ন করা যেতেই পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগরমশাই যেহেতু লেখেন নি, সুতরাং রামমোহনের সমাজসংস্কারে যে 'অগ্রচারী'র ভূমিকা তা বাতিল, এমন ভাবার কী কারণ থাকতে পারে? আর বিদ্যাসাগর তো রামমোহনের জীবনী লিখতে বসেন নি, তিনি লিখেছিলেন বাঙলার ইতিহাস। ওই ইতিহাসেই বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন "রামমোহন রায় এদেশের একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন সন্দেহ নাই" এবং অসাধারণ গুণাবলীর মধ্যে সমাজ-সংস্কার (তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও) অন্তর্গত।

'ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন চারটি বিষয়। ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার, ধর্মমত ও তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা, বাঙলা গদ্য-সাহিত্য ও ইংরাজি শিক্ষা এবং সংবাদ-পত্র ও রাজনীতি। রামমোহনের 'ধর্ম-ও সমাজ-সংস্কার' বিষয়ে এত ভালো লেখা আছে এবং এ-বিষয়ে প্রদীপ রায়ের লেখা এতই নগণ্য যে তা আলোচনার অযোগ্য। কলকাতায় রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা' ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউনিটারিয়ান কমিটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর উঠে যে যায় নি, তা সমসাময়িক পত্রিকা থেকেই জানা যায় (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'আত্মীয়সভার কথা' গ্রন্থে, কলকাতা, ১৯৮১)। রামমোহনের ধর্মচিন্তা 'রহস্যাবৃত' বলে যে মন্তব্য করেছেন লেখক, তার পিছনে কোনো যুক্তি দেখান নি। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনের যে মন্তব্য 'ইনডিয়ান মিরর' (১/৭/১৮৬৫) থেকে উদ্ধার করেছেন তা নিতান্তই অর্বাচীন, কেননা কেশব-চন্দ্র সেনের নিজেরই ওই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। সতীদাহ উচ্ছেদ বিষয়ে বেন্টিংকের সঙ্গে রাম-মোহনের শেষ মুহূর্তের প্রভেদ যে পদ্ধতিগত, তাও লেখক বুঝতে পারেন নি, তাঁর সুরের মধ্যে প্রয়াত রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রতিধ্বনি। তফাত এই যে, রমেশচন্দ্র করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতিতে, প্রদীপবাবু প্রগতিশীলতার মুখোশ এঁটেছেন। ইংলন্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রক্ষিত বেন্টিংকের কাগজপত্রের মধ্যে (Duke of Portland Collection, MSS. PWJF/2616/VI) ১৪ই জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের রামমোহনের লেখা অপ্রকাশিত চিঠি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে সতীদাহ নিরোধক আইন পাশ হবার পর রক্ষণশীল হৈ-চৈ শুরু হলে রামমোহনই ছিলেন বেন্টিংকের পরামর্শদাতা। রামমোহনের ধর্মমত এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা অংশটি অসম্পূর্ণ, লেখক একে-একে নানা ব্যক্তির মতামত দিয়েছেন। নিজে কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন নি। বিশ্বভারতী পত্রিকার ২৮ বর্ষ ২ সংখ্যায় 'রামমোহন রায় ও বেদান্ত' এবং ১৬ বর্ষ ৪ সংখ্যায় 'রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র' শীর্ষক দুখানি অতি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লিখেছিলেন দিলীপ-কুমার বিশ্বাস। লেখক সেগুলি আদৌ দেখেছেন বলে মনে হল না। 'বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও ইংরাজী শিক্ষা' বিষয়ে লেখক একই রকম অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ (V .C. Joshi (ed.), Rammohan Roy and the Process of Modernization in India, New Delhi, 1974) কিংবা আরো অনেকের লেখা—যেমন প্রমথ চৌধুরী, সুকুমার সেন, কিংবা শিশির দাস বা ভূদেব চৌধুরী, লেখক ব্যবহার করেন নি কেন বোধগম্য হল না। একই ভাবে 'সংবাদপত্র ও রাজনীতি' শীর্ষক অধ্যায়ে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় Indian Society : Historical Probings শীর্ষক গ্রন্থে (সম্পাদনা R. S. Sharma, New Delhi, 1976) সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান রচনা "The Social Implications of the Political Thought of Raja Rammohan Roy" প্রদীপ রায় দেখলে উপকৃত হতেন।

'অবাধ বাণিজ্য, কলোনাইজেশন ও নীলকর' শীর্ষক অধ্যায়টি বিষয়ের কারণে কৌতূহল-উদ্দীপক, কিন্তু এখানে লেখকের ব্যবহৃত উপাদানগুলি দেখে অবাক হতে হয়। সমস্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর আকর (সেকেন্ডারি সোরসেস)। অথচ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার আলোচনার জন্য প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার এবং উনিশ শতকের গোড়ার যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং শিল্প-পুঁজি-বাদের বিকাশ, ভারতে উপনিবেশনীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন সামাজিক বিন্যাস, সামাজিক শ্রেণী-সম্পর্ক প্রত্যেকটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং রামমোহনের সামাজিক অবস্থান এবং তাঁর কর্ম ও চিন্তা বিষয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ। যেমনি বলা যায় যে 'বৈষয়িক জীবন' বিষয়ে আলোচনায় প্রদীপ রায় যেভাবে ধর্মীয় মতামত ও তার ফলে বিরোধিতার সৃষ্টি থেকে বৈষয়িক কারণকে আলাদা করেছেন, তাও সমর্থনযোগ্য নয়। রামমোহনের 'ভূটান যাত্রা প্রসঙ্গে' লেখক গমনের উদ্দেশ্য, অবস্থান এবং সমস্ত ব্যাপার-টিই 'রহস্যাবৃত' বলেছেন, অথচ তথ্য-প্রমাণসহযোগে সেই রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করেন নি। 'বিলাতে রাম-মোহন' অধ্যায়ে নতুন কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যা কিছুই নেই।

রামমোহন রায় ১৮৩১ সনে ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমনস-নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির সামনে তদানীন্তন ব্রিটিশভারতের ভূমিরাজস্বব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিয়ে-ছিলেন, ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সে তথ্য সুবিদিত। এ প্রসঙ্গে অনেক-গুলি উচ্চমানের রচনা অদ্যাবধি প্রকা-শিত—যেমন সুশোভনচন্দ্র সরকার -সম্পাদিত Rammohan Roy on Indian Economy, কলকাতা, ১৯৬৫, এর 'ভূমিকা' এবং তাঁর বাঙলা প্রবন্ধ, ('অর্থনীতিচর্চায় রামমোহন', তত্ত্ব-কৌমুদী, মাঘোৎসব সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ ৩৮-৪৩), B. N. Ganguly "Rammohan Roy on India's Contemporary Economic Problems" (in *Economic and Social Developments : Essays in Honour of Dr. C. D. Deshmukh*, pp. 281-87),

ভবতোষ দত্ত, "রাজা রামমোহন রায় ও ভারতীয় অর্থনীতি" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১১৯-২৩)। তা ছাড়া, ড. জ্ঞানচাঁদ, সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং অশোক সেনের লেখা আছে। সেগুলির পাশে প্রদীপ রায়ের লেখা 'সিলেক্ট কমিটিতে রামমোহনের সাক্ষ্য' নিতান্তই তুচ্ছ। স্বিতীয়ত লেখক এ বিষয়েও অজ্ঞ যে সম্প্রতি নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেন্টিংকের কাগজপত্রের মধ্যে রামমোহনের হস্তলিখিত ব্রিটিশ ভারতের ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত একখানি নয় পৃষ্ঠার স্মারকলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে (দ্র রামমোহন সমীক্ষা, পৃ ৫৫৮) যা রামমোহনের সাক্ষ্যদানের আগেকার রচনা এবং যা তাঁর অর্থনীতিচিন্তা বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করে।

'ঐতিহাসিক পুরুষ রামমোহন' শীর্ষক উপসংহারটি সমগ্র গ্রন্থটির সঙ্গে সংগতি রেখেই অতিসরলীকরণ-দোষে দুষ্ট। এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতে হলে যে গভীর অধ্যয়ন, তীব্র ইতিহাসবোধ, মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, বিপুল তথ্যচয়ন এবং সঠিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ প্রয়োজন লেখকের তার প্রত্যেকটিরই অভাব। গ্রন্থপঞ্জীটিও অসম্পূর্ণ এবং বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-প্রবন্ধের নাম সেখানে নেই। গ্রন্থটি অপ্রয়োজনীয় হলেও ছাপা ভালো এবং দাম কম।

গৌতম নিয়োগী

এখনো স্মৃতি নয়

নরেশচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য—শ্যামাপ্রসাদ দাস। প্রকাশক শান্তি দাস, কলকাতা-৪৫। কুড়ি টাকা।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে (১৮৮২-১৯৬৪) অনেকে ভুলে গেছেন। তবু তাঁকে একেবারে বিস্মৃত লেখক আখ্যায়িত করা যায় না। কারণ, তাঁর লেখায় এমন কিছু গুণ ছিল যা বিস্মৃতির অতীত। তবে নানা কারণে সাময়িকভাবে তাঁর নাম অনেকের স্মৃতির অবচেতনায় লুকিয়ে থাকতে পারে। কেননা, সাহিত্যের যে ঘাতপ্রতিঘাত গত অর্ধ শতাব্দীতে তরঙ্গায়িত হয়েছে, তাতে নরেশচন্দ্র কেন, আরো অনেকের নাম স্মৃতির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আজ যাঁদের তারুণ্যকে আমরা প্রাণচাঞ্চল্য বলে আখ্যায়িত করছি তা যে আগামী কাল নির্জলা চাঞ্চল্যে পর্যবসিত হবে না, একথা কে বলতে পারে? উপরন্তু, কোনো শিল্পীসাহিত্যিককে অমরতা লাভ করার জন্যে বহু স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়। এসব স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের খাত থাকে। এসব খাত এত গভীর যে, একমাত্র কবিরাই স্বচ্ছন্দে এগুলো অতিক্রম করে অমরতার শিরোপা অর্জন করতে পারেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে নরেশচন্দ্রের বিস্মৃতি তেমন অস্বাভাবিক নয়। অতএব তার জন্যে আক্ষেপ করা অর্থহীন। এই গোষ্ঠীর লেখকের উপর গবেষণাকে শুধু সময়োপযোগীই বলা যায় না, বরং প্রতিভার পুনর্মূল্যায়নও বলা যায়। কারণ, লেখকের সমকাল বলতে যেটুকু বুঝি, এখন আমরা তার থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি।

শ্যামাপ্রসাদ দাসের 'নরেশচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য'কে সেই হিসেবে একটি মূল্যবান গবেষণাকর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। এতে লেখক নরেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের পটভূমিকা বর্ণনা করে তাঁর জীবন এবং সাহিত্যের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন, যার ফলে পাঠকের পক্ষে নরেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ মানসধর্ম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। শ্যামাপ্রসাদ দাস তাঁর গবেষণাকর্মকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করেছেন, (১) জীবন ; (২) সাহিত্যসাধনার প্রেক্ষাপট ; (৩) কথাসাহিত্য ; (৪) প্রবন্ধ ; (৫) নাটক ; (৬) প্রকরণ-প্রসঙ্গ ; (৭) সাহিত্য-বিতর্ক ও নরেশচন্দ্র ; এবং (৮) উপসংহার। এই শিরোনামকে আরো সংকুচিত করলে দাঁড়ায়—(ক) জীবনী ; (খ) পটভূমিকা ; (গ) সাহিত্যসাধনা ; এবং (ঘ) সাহিত্য-বিতর্ক। কোনো লেখককে জানতে হলে আমাদের আর এর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই কাঠামোতে ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ অবয়বসহ বিধৃত। একারণেই আমি প্রথমেই গবেষণাকর্মটি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে নরেশ সেনগুপ্তের জীবনী আলোচনার পর লেখক তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। তিনটি বিশিষ্ট ধারায় এই প্রেক্ষাপট বিস্তারিত : (ক) সমাজ ; (খ) সাহিত্য ; এবং (গ) রাজনীতি। লেখক এই তিনটি ধারা পর্যালোচনা করে নরেশ-মানস তৈরি করেছেন। এতে যে মানুষটি আত্মপ্রকাশ করেন "তিনি পেশাদার লেখক ছিলেন না, তাই তাঁকে পাঠকের মনোরঞ্জনের সহজ চেষ্টা করতে হয় নি। জনপ্রিয়তা লাভ করা ও হারানোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রায় নিরাসক্ত অর্থাৎ তিনি অর্থ উপার্জন বা পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সাহিত্য রচনা করেন নি। তিনি লিখেছেন মনের তাগিদে—যার পেছনে ছিল সমসাময়িক মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিজস্ব কিছু বক্তব্য জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস। উপরোক্ত কারণে সাহিত্যের আসরে নতুন পদক্ষেপ নিতে তিনি বিদ্রূপাত্মক শিল্পাগ্রহণ হন নি—একক অভিযান চালিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আগামী দিনের দুঃসাহসিক লেখকদের জন্য নতুন ও পাকা সড়ক নির্মাণের কাজে ছিলেন আত্মনিবেদিত।" (৩১-৩২ পৃ)

পরবর্তী তিন অধ্যায়ে (কথাসাহিত্য—৬১-১৫৫ ; প্রবন্ধ—১৫৬-১৬৭ ; নাটক—১৬৮-১৭৪) গবেষক প্রধানত তাঁর সেই দুঃসাহসিক অভিযানের সঠিক বিবরণী দিয়েছেন। এই বিবরণীর একটা বৈশিষ্ট্য হল, লেখক শুধু ধারাবাহিক সমালোচনা না করে বহু গ্রন্থের কাহিনীসূত্র তুলে ধরেছেন, যা পাঠকের রসসম্ভোগে সহায়ক হয়েছে। এই গবেষণাগ্রন্থের পাঠক, সেজন্যে, মূল গ্রন্থ সামনে না থাকা সত্ত্বেও আলোচনাটি আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে 'কথাসাহিত্যে' ঢালাওভাবে গল্প ও উপন্যাস আলোচনা না করে এগুলোকে আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল। তা হলে উভয় রূপকল্প নির্মাণে লেখকের কৃতিত্ব আরো স্পষ্ট হত। নরেশ সেনগুপ্তের সৃষ্টিশীল আলোচনার ক্ষেত্রে আরো একটি ত্রুটি হল, এতে লেখকের শিল্পরসচেতনা যথাযথ ধরা পড়ে নি। 'প্রকরণ-প্রসঙ্গ' (১৭৫-৮১) নামে একটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা হলেও, তা পর্যাপ্ত নয়। আমার মতে, এই অধ্যায়টিতে আরো জমাট এবং তথ্যপূর্ণ করার সুযোগ ছিল।

এই গ্রন্থের একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল 'সাহিত্য-বিতর্ক ও নরেশচন্দ্র' (১৯০—২০৪)। এই অধ্যায়টির গুরুত্ব নানামাত্রিক। এতে তৎকালীন সাহিত্যরথীদের নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী ধরা পড়েছে। এই তৎপরতার এক প্রান্তে রয়েছে তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীসাহিত্যিকদের দুঃসাহসিক সাহিত্যকর্ম ; অন্য প্রান্তে এই প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল তথা রক্ষণশীল চক্রের অভিযান। এর মাঝখানে রক্ষণশীল চক্রের নিরপেক্ষ ব্যক্তি—যাঁদের কাছে শিল্পটাই বড়ো। এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, প্রমথ চৌধুরী, নরেন্দ্র দেব, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-এর মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয় একবার তার একটা মীমাংসা করে দেওয়ার জন্যে "নিরপেক্ষ অধ্যাপক সাহিত্যসেবীর দল" রবীন্দ্রনাথকে ধরেছিলেন। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে ৪ চৈত্র ও ৭ চৈত্র ১৩৩৪ সালে এই আপোস-সভা বসে। এ সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত 'কল্লোল-যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন, "কথাকাটাকাটি আর হট্টগোল হয়েছিল মন্দ নয়, এর কি কোন ডিক্রি, ডিসমিস আছে, না এ নিয়ে আপোষ নিষ্পত্তি চলে? দল করে যদি সাহিত্য না হয়, তবে সভা করেও তার বিধিবিধান হয় না। চরম কথা বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন 'এদের লেখা যদি খারাপ তবে তা পড় কেন বাপু? খারাপ লেখা না পড়লেই হয়। শুধু নিজেরা পড়েই ক্ষান্তি নেই অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে পড়ানো চাই।" (আলোচ্য গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) সেদিনের এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের পক্ষেই তাঁর মতামত প্রদান করেছিলেন। এ কারণে "অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় আছে মনে করে 'শনিচক্র' তাঁকে আক্রমণ করতে কসুর করলেন না। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন 'বসন্ত' গীতিনাট্য (১৯২৩)। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতির রচনাশক্তির প্রশংসা করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। 'বিচিত্রা' ভবনের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ নবীন সাহিত্যিকদের বলেছিলেন, "তাদের সঙ্গে তাঁর মতের কোন পার্থক্য নেই এবং তিনি এটি জানতেন বলেই তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।" (জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ২০১-২০৩ পৃষ্ঠা।)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেশ সেনগুপ্তের বিরোধের স্বরূপ অন্বেষণের জন্যে শ্যামাপ্রসাদ দাস তাঁদের ভেতর লিখিত চারখানা পত্র এই অধ্যায়ে সংযুক্ত করেছেন। শত্রুপক্ষের উশকানিমূলক প্রচারণা মানুষের সম্পর্ককে কখনো কখনো কোন্ স্তরে নিয়ে যেতে পারে, এসব পত্রে তার স্পষ্ট ছায়া রয়েছে। যদি উভয়ে এ ব্যাপারে লেখালেখি না করতেন, বিশেষত নরেশচন্দ্র যদি সাহসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে প্রতি-আক্রমণ না করতেন তাহলে তাঁদের মধ্যে বিরোধ থেকেই যেত। এই পত্র-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আপনার কাছ থেকে যে চিঠিখানা আমার হাতে এসে পৌঁছল সেটিতে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল এই কথাটা আমি অনুভব করেছি। কোথাও বেদনার কারণ ঘটিয়ে রেখে দিয়েছি একথা মনে করতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি—এজন্য আপনার চিঠিখানা পেয়ে বিশেষ সান্ত্বনাবোধ করেছি। আমি জানি এ রকম চিঠি লেখা সহজ নয়, খুব অল্প লোকই পারে। পরস্পরকে আঘাত করতে গিয়ে আমরা যে মোহজালে জড়িয়ে পড়ি আশাকরি আমাদের দুজনের সম্বন্ধে সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।" (২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) এই বিতর্কে নরেশচন্দ্রের সাহসিকতার পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের মহাচিত্ততার পরিচয়ও স্পষ্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথ বলেই হয়তো এমনটা সম্ভব হয়েছে।

এই অধ্যায় পড়ে তৎকালীন সাহিত্য-

বিতর্ক লেখক এবং পাঠককে কী পরিমাণ অনুপ্রাণিত করত তারও আভাস আবিষ্কার করা যায়! এখন তো সাহিত্যের সেই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম প্রায়ই লোপ পেয়ে গেছে বলা যায়।

উপসংহারে নরেশ সেনগুপ্তের রচনাপঞ্জি সংযোজিত করে লেখক পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তার সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জি' দিলে ভালো হত। এ ধরনের গ্রন্থপঞ্জি গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্যে প্রয়োজনও।

এক শক্তিমান অথচ বিস্মৃতপ্রায় লেখককে পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দাসকে ধন্যবাদ।

রশীদ আল ফারুকী

বাংলাদেশে বঙ্কিমচর্চা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মূল্যায়নের পালাবদল—সারোয়ার জাহান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পঁচাত্তর টাকা।

বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র—সারোয়ার জাহান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ত্রিশ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস লিখে ঘরে ঘরে অমৃত ফলাবে আশা করেছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তিনি প্রতাপকে স্বর্গধামে পাঠিয়ে তার গুণ গেয়েছিলেন আর রোহিণীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কিছু সান্ত্বনা পেয়েছিলেন সম্ভবত। এর মধ্যে কতটা সাহিত্যজিজ্ঞাসা ছিল আর কতটা সমাজসমীক্ষা, সে বিচার এখানে করছি না। কিন্তু সারোয়ার জাহান আমাদের জানাচ্ছেন এত করেও বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য মনোভাবকে অত্যন্ত বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তিনি নায়ক-নায়িকা চিত্রণে ভারতীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেছেন—এসব অভিযোগ করেছিলেন কেউ প্রবন্ধ লিখে, কেউ ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস রচনা করে। নবীনচন্দ্র সেন এক নায়িকার প্রেমপত্র পান যিনি নিজেকে কুন্দনন্দিনী ভেবে বিরহজ্বালা অনুভব করেছেন। নবীনচন্দ্র বিবাহবিচ্ছেদের এক উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, এসব বঙ্কিম-উপন্যাস-পাঠের কুফল। ভারতীয় নারীর পাতিব্রত্যনিষ্ঠা ভেঙে যাওয়ার মূলেও বঙ্কিমের উপন্যাস, একথা বলেছেন পূর্ণচন্দ্র বসু। আবার কেউ-কেউ বঙ্কিম-উপন্যাসের পাঠের ফলে ঘরে-ঘরে কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, আয়েষা, দলনীর আবির্ভাব লক্ষ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসনে তার পরিচয় পাই। মেকি স্বদেশচর্চা সেতে উঠেছিল কিছু বাঙালি বঙ্কিম-উপন্যাস পড়েই। অমৃতলাল বসুর 'বৌমা' প্রহসনে পুরুষোচিত-শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা হিড়িম্বার চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানেও বঙ্কিমের অনুকরণ। সারোয়ার আরও দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা দেখিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রও এইসব পড়ে কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই রাজসিংহ উপন্যাস লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সারোয়ার জাহানের এই মন্তব্য একটু দ্রুত, সেই কারণেই বিতর্কের সম্ভাবনা। 'পুনঃপ্রণীত' রাজসিংহ উপন্যাস দেখে এই কথাই বলতে হয় যে, রাজসিংহের সমগ্র ব্যাপারটা বপ্রদর্শনের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অনায়ত্ত ছিল। তিনি তো প্রকৃতপক্ষে মানিকলালের দোহাই দিয়ে রাজসিংহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'পুনঃপ্রণীত' রাজসিংহে মানিকলালের কর্মধারা আরো বিচিত্র এবং জটিল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে, বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা শিল্পবিচার করেন নি, তাঁদের দৃষ্টি সংকীর্ণ এবং একদেশদর্শী। সারোয়ার জাহান হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক তিন কবি' প্রবন্ধটির উল্লেখ করলেন না কেন? সেখানে তো সামাজিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু এই বাহ্য। সারোয়ার জাহান তার পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের কাহিনীনির্মাণরীতি অপর ঔপন্যাসিকবৃন্দ কিভাবে অনুসরণ করেছেন একের পর এক দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক তা দেখিয়েছেন। সারোয়ার জাহান দেখিয়েছেন গোবিন্দলালের মতো বাঙলা উপন্যাসের অনেক নায়ক সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, অনেক নায়িকা ভ্রমরের মতোই নিদারুণ শোকে-যন্ত্রণায় মৃত্যু বরণ করে। কেউ-কেউ বঙ্কিমের মতো কাপালিক চরিত্রের অবতারণা করেন। পশুপতির অনুসরণে সৃষ্ট হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসে বিজয়। এখানে উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে কেউ-কেউ মন্তব্য করেছিলেন বটে কিন্তু সারোয়ার জাহান যথার্থ গবেষকের কাজ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব যে কত গুরুতর ছিল, এই গবেষণাগ্রন্থ থেকে তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে আদর্শ তাঁর রচনাশৈলীতেও ধরা পড়ে। বঙ্কিমের রচনাশৈলী পরবর্তী ঔপন্যাসিকবৃন্দ নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। সারোয়ার জাহান প্রথমে নায়ক-নায়িকা নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের করণকৌশলের অনুসরণের ধারাটি লক্ষ করেছেন। সামান্য উদাহরণ দিই। আয়েষা তিলোত্তমাকে আংটি উপহার দিয়েছিল, রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে বিমলাও সরলাকে আংটি দিয়েছিল। আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' এই উক্তি অনুসৃত হচ্ছে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উর্মিলায় অনুরূপ উক্তিতে। আয়েষা একটি গোলাপফুল করদলিত করেছিল, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কুমুদিনী একটি অপরিস্ফুট ভিক্টোরিয়া গোলাপ অঙ্গুলি দ্বারা বিচ্ছিন্ন করতে লাগল। একেই বলে অনুকরণ! বঙ্কিমচন্দ্রের বীরেন্দ্র সিংহের মতোই স্বর্ণকুমারী দেবীর পৃথ্বীরাজের সদম্ভ উক্তি লক্ষণীয়। সারোয়ার জাহান দেখিয়েছেন রূপবর্ণনায়, পাঠক-সম্বোধনে, শিরোনামযুক্ত পরিচ্ছেদ রচনায়, আত্মগত ভাবনায়, দুটি সমান্তরাল কাহিনীর সন্নিবেশে, ছদ্মবেশ ধারণ ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের থেকেই পরবর্তী কালের উপন্যাসিকবৃন্দ গ্রহণ করেছেন। কোনো-কোনো ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপসংহারে সন্তুষ্ট হতে না পেরে সেই উপন্যাসের জের টেনেছেন নূতন উপন্যাস রচনা করে। দামোদর মুখোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে অন্যতম। অজ্ঞাতনামা লেখকের ভবানী পাঠক, পঞ্চানন রায়চৌধুরীর শ্রী উপন্যাস দুটি এদিক থেকে কৌতুহলোদ্দীপক। সারোয়ার জাহান অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল মিটিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বারবার জীবনজিজ্ঞাসা উত্থাপিত। আনন্দমঠের সেই গম্ভীর উচ্চারণ 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব' এর উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদৃষ্টি একটি ব্যাপক আলোচনার বিষয়। সেকালের বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসাকে একভাবে গ্রহণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদৃষ্টির এই পরিচয়কে সারোয়ার জাহান কতকগুলি ভাবনায় বিন্যস্ত করেছেন। যেমন স্বাজাত্যবোধ, নিষ্কামধর্ম এবং চিত্তসংযম, পাতিব্রত্য এবং সতীত্ব, বিধবার প্রণয় এবং পরিণাম, প্রেমের স্বরূপ, অলৌকিকতা। এই ভাবনাকে পরবর্তী ঔপন্যাসিকবৃন্দ নানাভাবে তাঁদের উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন। দেখা যায়, সকলেই বঙ্কিমের সমাজজিজ্ঞাসাকেই মেনে নিয়েছেন। এই অধ্যায়টি পড়লে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধীরা যে উক্তি করেছিলেন তা অসার বলে মনে হয়। সারোয়ার সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কতকগুলি বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন—সন্ন্যাসী, দেবদেবী, স্বপ্নবৃত্তান্ত। সেকালের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে এগুলি ঘুরেফিরে দেখা দিয়েছে। এ কেবল জীবনদৃষ্টির দিক থেকে নয়, রচনারীতির দিক থেকেও অনুধাবনযোগ্য ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসকে আধুনিক বলে দাবি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকা সত্ত্বেও 'চোখের বালি'র 'আঁতের কথা'কে বার করে আনবার পদ্ধতিকে কেন তিনি এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এই গবেষণাগ্রন্থটি পড়ে তার কিছু উত্তর পাওয়া যায়। সারোয়ার জাহান বস্তুনিষ্ঠ গবেষক। তিনি বঙ্কিমপরবর্তী ঔপন্যাসিকবৃন্দের জন্য বড়ো কিছু দাবি করেন নি, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সেকালে কী বিপুল ছিল। অধিকাংশ লেখকই বঙ্কিম-সমপর্যায়ের নন। তাঁদের রচনাও উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁরা যে সেকালের বাঙালির মানসিকতা এবং রুচিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তার পরিচয় এই গবেষণাগ্রন্থে পাই।

সারোয়ার জাহান তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম জীবন সম্পর্কে ধারণার মূল্যবিচার করেছেন। বলা বাহুল্য, বিষয়টি জটিল এবং বহুবিতর্কিত। একদা পূর্বপাকিস্তান সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে কঠোর রায় দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে প্রায় অপঠিত ছিলেন। কিন্তু নূতন করে বঙ্কিমজিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে এখন বাংলাদেশে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সম্পর্কে নূতন ভাবনারও পরিচয় আমরা পাচ্ছি। সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটি আর্থসামাজিক। ধর্মকে সেই সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হয়। এইভাবেও কেউ-কেউ বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন।

সারোয়ার জাহান বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম চরিত্র অঙ্কনে দ্বিধাগ্রস্ত; বিশেষত ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্ররচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন। কিন্তু যখনই বঙ্কিমচন্দ্র অনৈতিহাসিক মুসলিম চরিত্র এঁকেছেন তখনই এই ভেদবুদ্ধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সারোয়ার জাহান অবশ্য এর কারণ অনুসন্ধান করেন নি। বলা বাহুল্য, তার গবেষণার কাঠামোটি সেরকমও নয়। সারোয়ার সাহেবের উদার মানবিক দৃষ্টির পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি তাঁর বিচারবোধকে অনাচ্ছন্ন রেখেছেন সর্বত্র।

আমাদের প্রশ্ন জাগে, কেন এরকম হল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণে? বঙ্কিমচন্দ্র কেন দ্বিধাগ্রস্ত? যিনি আয়েষা, ওসমান, মবারক, দরিয়া নির্মাণ করেন, তিনিই কী করে তফি খাঁ, ঔরঙ্গজীবের মতো চরিত্র সৃষ্টি করেন! একটা উত্তর বোধ করি এই যে, চরিত্রগুলিকে আমরা সাহিত্যের দিক থেকে দেখছি না। দেখছি হিন্দু-মুসলমান ধর্মের দিক থেকে। ম্যাককালাম শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটক বিচার করে দেখিয়েছেন যে, শেক্সপীয়র স্বদেশী বীরকে বড়ো করে বিদেশী বীরকে কিছুটা খাটো করেছিলেন। সেখানে যদি কোনো বৈরিতা থাকে তবে তা স্বদেশচর্চার দিক থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেই কি আমরা কেবল ধর্মের

দিক থেকে দেখব! দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ইতিহাসচর্চা বেশিদূর এগোয় নি। তিনি যেমন পেয়েছিলেন তেমন কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে এঁকেছেন। তৃতীয়ত, সয়ের উল মতাক্ষরীণে (বঙ্কিমের উচ্চারণ রাখলাম) নবাবের ঘর আর বাহিরের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তা অবক্ষয়িত জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মৃণালিনী উপন্যাসে তিনি কিঞ্চিৎ কঠোর। কিন্তু পশুপতিকে আমরা ভুলব কেমন করে? কেমন করে ভুলব গঙ্গারামকে? এখানে কি বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুবিদ্বেষী? চতুর্থত, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে নিজবাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনা ভোলা সম্ভব ছিল না। তিনি কখনও-কখনও মুসলিম বাদশাহদের ইংরেজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এখানেও ব্যতিক্রম মুর্শিদকুলী খাঁ। তফি খাঁর প্রতি অবিচার তিনি মুসলমান বলে নয়—ইতিহাসের দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সুবিচার করেন নি। রামা কৈবর্তের সঙ্গে রহিম শেখকে যিনি একই প্রযত্নে উচ্চারণ করতে পারেন তাঁকে এক কথায় সাম্প্রদায়িক বলা সমীচীন হবে কি? সারোয়ার জাহানের দৃষ্টান্তে আরও অনেক এগিয়ে আসবেন বিষয়টিকে আলোচনা করবার জন্য, এই আশা করি।

বইটির অপর-একটি মূল্য অনস্বীকার্য। সারোয়ার জাহান কিছু মুসলমান লেখকের রচনা থেকে বঙ্কিমবিদ্বেষের উদাহরণ সংকলন করেছেন। যদিও সংক্ষিপ্ত, তবুও এই অংশটি মূল্যবান। বাংলাদেশের সকল মানুষের মানসিকতা জানতে হলে এইরকম গবেষণারই প্রয়োজন। এই অংশটিকে ঐতিহাসিক দলিল বলা যায়। হিন্দুমুসলমান স্বভাবের এবং রুচির বিরোধ-মিলনের সংবাদ সম্পূর্ণ জানতে পারলেই একদিন সত্য ইতিহাস রচনার পথটি সুগম হবে। সারোয়ার সাহেবের গ্রন্থটি সেই পথের নিশানা।

বিজিতকুমার দত্ত

বাংলাদেশের কবিতা, কাব্যনাট্য ও কবির অনুবাদকর্ম

হে শিকারী অস্তিত্ব—হাসনা বেগম। সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী, ঢাকা। চব্বিশ টাকা।

নূহের জাহাজ—তালিম হোসেন। মৌসুমী পাবলিশার্স, ঢাকা। কুড়ি টাকা।

শপথ—আবদুল্লাহ আল-মামুন। মুক্তধারা, ঢাকা। নয় টাকা।

রক্ত আর ফুলগুলি—তো হূ। নির্মলেন্দু গুণ অনূদিত। মুক্তধারা, ঢাকা। বারো টাকা।

ওপার বাঙলার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এই বাঙলার আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই অপরিসীম। রাজনৈতিক কটাটার পেরিয়ে সাহিত্যগুন্ধের যাতায়াত আজো সহজ হয় নি বলেই ওপারের কোনো রচনা হাতে এলে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। প্রাথমিক এই প্রতিক্রিয়া কেটে গেলে রচনার মান, গুণাগুণ ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহী পাঠকের হৃদয়ে নানা প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিতেই পারে। পরবর্তী এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতাকে মেনে নিয়েও বলতে পারি বাংলাদেশের সাহিত্য আমাদের আরো ভালোবাসা, অভিনিবেশ এবং শ্রম দাবি করে। ওপার বাঙলার পাঠকসমাজ যে তৃষ্ণা নিয়ে এপার বাঙলার লেখা পড়তে চায় আমরা কি সেই আকুলতা দেখিয়েছি?

হাসনা বেগম তাঁর কবিতায় জীবনকে সুন্দর এবং মহৎ দেখতে চেয়েছেন। জীবনকে তিনি বলেছেন—'আমার প্রিয়তমের মুখ হও'। কিন্তু এই স্বচ্ছ জীবনবোধের পাশেই তাঁর এক নিরালম্ব অস্তিত্বের কথা আমাদের ফিরে-ফিরে শুনিয়েছেন—'আমি শূন্যে ঝুলতেই থাকি/প্রাণহীন কাক ওই বৈদ্যুতিক তারে।' আসলে তাঁর মধ্যে 'সবুজের দানা'র পাশাপাশি এক অসম্ভব দুঃখময় দীর্ঘ রিক্ততার সহাবস্থান লক্ষ করা গেল। 'সন্ধ্যের নিমন্ত্রণে বিশ্বভরা ডাকে' তিনি সাড়া দিতে চেয়েছেন কিন্তু ডেফোডিলস তাঁর কাছে 'এক গ্রাস করা অন্ধকার', 'সোনালী রঙে আঁধারের বিভীষিকা/অরেঞ্জ রঙের মাঝখানটিতে ধূসর রঙের ভবিষ্যত'। একজন আধুনিক যথার্থ কবির মধ্যে এই বিপরীতবোধ কাজ করেই। কবি একই সঙ্গে চিহ্নিত করেন স্বপ্নময়তা ও স্বপ্নহীনতা, আনন্দ ও বেদনা, বঞ্চনা ও প্রাপ্তি। কারণ সক্রিয় কবির ইন্দ্রিয় সব সময়ই সজাগ, তীক্ষ্ণ এবং প্রখর। তাই পৃথিবীর ভালোমন্দ, জীবনমরণ সবই কবিতায় চিত্রল সৌন্দর্য পেয়ে যায়।

কিন্তু হাসনা বেগম-এর কবিতার বড়ো বেশি ক্লিশে-আক্রান্ত বোধ আর শব্দের ছড়াছড়ি। অনেক সময়ই ছন্দের মাত্রা পড়ে গেছে—যেমন 'ভীষণ মরণ' কবিতাটি। যেসব কবিতা তিনি অসমছন্দে বা গদ্যছন্দে লিখেছেন সেগুলি সম্পর্কে আমাদের তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু মাত্রাবৃত্তের দোলচালে ভুল হলে খারাপ লাগে বৈকি! 'হে শিকারী অস্তিত্বে'র পরের কবিতাগুচ্ছের প্রত্যাশায় থাকা গেল—হ্যাঁ, অবশ্যই গভীর আগ্রহ নিয়ে।

তালিম হোসেন দীর্ঘদিন কবিতাচর্চা করছেন। 'নূরের জাহাজ'-এ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তাঁর লেখা কবিতা পাওয়া গেল। মূলত তাঁর কবিতায় এক ধরনের ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ আর বেদনাবোধ কাজ করছে। কিন্তু তিনি বড়ো বেশি নজরুল-আক্রান্ত। বিশেষত 'কর্মখালি' ও 'পঞ্চমবাহিনী' কবিতা দুটিতে। এসব রচনা আবৃত্তি করে তাৎক্ষণিক প্রশংসা পাওয়া যাবে ঠিকই, তবে এর আপাতমূল্য হারিয়ে যাবে চিরন্তনের কষ্টিপাথরে। তালিম হোসেন অবশ্যই প্রাচীনধর্মী—তাঁর লেখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষ দেখা গেল না। তিনি সাম্প্রতিক কবিতার পালাবদল প্রসঙ্গে আরেকটু সচেতন হলে ভালো হত। তবু তাঁর দু-একটি কবিতা নিন্দুক সমালোচককে স্পর্শ করে গেছে। যেমন 'বাড়ি' কবিতাটি। চমৎকার এই কবিতাটির করুণ মাধুর্য স্মরণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তেমনি 'চাঁদের শবযাত্রা' কবিতাটি।

'শপথ'-এর প্রথম সংস্করণের নিবেদনে আবদুল্লাহ আল-মামুন লিখেছিলেন, 'সেই বয়সের অপেক্ষাকৃত স্থূল ও অকারণ নিয়ম-না-মানা মানসিকতা যুদ্ধ আর শান্তিকে বিষয়বস্তু করে মোটামুটি ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তার একখানা নাটক ধরনের রচনা লিপিবদ্ধ করতে আমাকে এক প্রকার বাধ্যই করল। অস্বীকার করব না, কেমন যেন একটা উন্মাদনায় মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে 'শপথ' লিখে ফেললাম'। এই সুন্দর স্বীকারোক্তির পর আর বিশেষ কিছুই লিখতে ইচ্ছে হয় না। প্রতীকধর্মী এই কাব্যনাট্যটি অল্প বয়সের উত্তাপ নিয়ে লেখা। ফলে আবেগ যতখানি প্রাধান্য পেয়েছে শিল্পনৈপুণ্য ততখানি নয়। এই আখ্যানের কুশীলব হল সূর্য, বাতাস, মৃত্তিকা, আকাশ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ, শ্রমিক, বিশ্ব, শান্তি ইত্যাদি। এর থেকেই পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন—রচনাটি কতখানি রূপকাশ্রয়ী। শেষাশেষি যথারীতি জনতার রায়ে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও যুদ্ধ বহিষ্কৃত হয় পৃথিবী থেকে। বক্তব্যের দিক থেকে লেখাটির তাৎপর্যময়তা অনস্বীকার্য এবং এখনো তা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রকরণরীতি পুরোনো বলে অনেক সময়ই ক্লান্তিকর। আধুনিক কাব্যনাটকে কবিতার ভূমিকা প্রধান এবং নাটকের স্থান গৌণ বলেই মনে করা হয়। 'শপথে' কাব্যগুণের আরেকটু আস্বাদ পেলে হয়তো খুশি হওয়া যেত। তবে অল্প বয়সের রচনা হিসেবে নিশ্চিন্ততায় গ্রহণ করলে এই ত্রুটি উপেক্ষা করা যায়।

ভিয়েতনামের কবি বলতে আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই ফুটে ওঠেন হো চি মিন। তাঁর কবিতার কিছু অনুবাদ ইতস্তত আমরা পড়েছি। কিন্তু হো চি মিনের পরে যে কবি ভিয়েতনামে সর্বাধিক আদৃত সেই তো হূ-র কবিতার সঙ্গে আমরা অনেকেই অপরিচিত। বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণ এই কবির বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ করে আমাদের উপহার দিয়ে একটি সময়োচিত কাজ করেছেন। ভূমিকায় নির্মলেন্দু লিখেছেন—"আমার অক্ষম অনুবাদেও যদি সেই পুণ্যভূমি ভিয়েতনামের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরে তাহলে ওটাই হবে আমার অনুবাদকর্মের সার্থকতা—এ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের কাব্যিক অমরত্বের তৃষ্ণা থেকে আমি এ কাজ করি নি।" প্রথমত বলি, অনুবাদগুলি মোটেই অক্ষম নয়, কিন্তু এই বিনয়ী নিবেদন মর্মস্পর্শী। দ্বিতীয়ত, নির্মলেন্দু অজস্র ভালো মৌলিক কবিতা লিখেছেন, তাঁকে অনুবাদের হাত ধরে কাব্যিক অমরত্বে পৌঁছুতে হবে কেন! তবে তাঁর উদ্দেশ্য অন্তত কিছুটা যে সফল হবে এই প্রচেষ্টায় তা বলাই বাহুল্য।

তো হূ-র কবিতা নিরাভরণ তবে আন্তরিক উচ্চারণে শুদ্ধ ও সুন্দর। সেই শুদ্ধ সৌন্দর্যের সফল উন্মোচন ঘটিয়েছেন নির্মলেন্দু বাঙলা অনুবাদে। সাবলীল ভাষান্তরের উদাহরণ দেওয়া যাক—

আজকাল দিনগুলো যেন
বিদায়বিষাদে মোড়া ;
অশ্রু হয়ে গলছে জীবন,
বৃষ্টি হয়ে গলছে আকাশ।

কিংবা

শতাব্দীর জ্বলন্ত ভৃঙ্গার
অন্তহীন অপেক্ষার শেষে
হোক না স্বপ্নের মধ্যে,
তবু আজ বসন্ত এসেছে।
আকাশ হয়েছে শান্ত,
সেজেছে সে অবিশ্বাস্য নীলে।
ঘুমন্ত শিশুর শান্ত মুখশ্রীকে
ধারণ করেছে পৃথ্বী।

মনে হয় যেন বাঙলা কবিতা পড়ছি—এত স্বচ্ছন্দ এদের রূপান্তর। এই কাব্যানুবাদ অবশ্যই আদৃত হবে—অনুমান করি।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সংগীতভাবনা

সে অগ্নিতে দীপ্ত-গীতে—অনন্তকুমার চক্রবর্তী। ঐকতান, ৭৫ পশ্চিম ঘোষপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা। শোভন সংস্করণ পঁচিশ টাকা, সুলভ সংস্করণ কুড়ি টাকা।

শিল্পের বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে চর্চা, গবেষণা এবং পুস্তকপ্রকাশনার কাজকে আজকের শিল্পপ্রাণ মানুষ বেশ পৃষ্ঠপোষণ করে থাকেন। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে কালিকলমে যাকে প্রকাশ করা সম্ভব, কখনোই তার অনন্ত রসের

সামগ্রী হবার জো নেই। এর কারণটা মোটেই দুরূহ নয়। একসারসাইজ বুকের দুই মলাটে বেঁধেরাখা গানের স্বরলিপি আর শিল্পীর কণ্ঠের গান এক জিনিস নয়, নাটকের স্ক্রিপ্ট বা নাট্যাভিনয়ও সমান কথা নয়, এমনকি নৃত্যের বেলাও নিতান্তই অনর্থক হত যদি না নর্তকের নাচের মুদ্রায় নট-রাজের ভাস্কর্যের অপূর্ব ছন্দ লীলায়িত হত। যেমন 'নীরব কবিত্ব' বলে কোনো কথা শব্দকোষে নেই, সেইরকমই শিল্পের প্রকাশ, অভিব্যক্তি বা পরিবেশন ব্যতীত সংবেদনশীল হৃদয়ে তার রসসঞ্চারেরও কোনোরকম সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যেহেতু কেতাবি লক্ষণকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে হাত ঘোরালেই নাচ হয় না, আঁচড় কাটলেই ছবি হয় না বা শব্দ করলেই গান হয় না, সেহেতু পুঁথির পাতা ওলটাতে হয় আমাদের, শিল্পী হতে গেলে হতে হয় শিক্ষানবীশ। ঠিক তেমনিই শিল্পের যথাযথ রসপ্রকাশনার প্রাক্‌পর্বে পুঁথির পোশাকি সূত্রমালা, নির্দেশ, বিধি, ব্যাকরণিক নিয়মাবলী একেবারে অলভ্য। প্রধানত শিল্পকলার উদ্দেশ্য রসস্ফুরণ, এবং অনিবার্যভাবেই তা প্রকাশসাপেক্ষ হলেও কলাবিদ্যাচর্চা-গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রয়োজন হল কলা-শিল্পকে পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধতর করা, তাতে নবত্বের যোজনা ঘটানো। যেমন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ব্যাপ্ত থাকে সৃষ্টি এবং সভ্যতার প্রগতি এবং পরাগতি-করণে, সেইরকমই কলাবিদ্যাবিষয়ক কোষগ্রন্থ, গবেষণাপুস্তিকা পরিবেশন-সক্ষম নন্দনকলাকে বিস্তৃতি, প্রাপ্তি আর পর্যাপ্তির দিকে আকর্ষণ করে। আর বলাই বাহুল্য নন্দনকলার ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ হল তার শুদ্ধতম এবং সূক্ষ্মতম রসসংবেদনার অন্যতম হেতু। এই শাসনকে আত্মসাৎ করার পর শিল্পীর শিল্পের মধ্যে আত্মনির্মাণ, আত্মনিষ্কাশন এবং রসপ্রাণপ্রতিষ্ঠার মহান সুযোগ ঘটে, তখনই অন্তরঙ্গ অনুভবমেলা আর প্রেমের প্রগাঢ় বর্ণবিস্তার নিয়ে বেরিয়ে আসে নন্দনকলার অন্তিম আবেদন।

সংগীতের দ্বিতীয় বিষয়ক জ্ঞানের বই এযাবৎ ঢের লেখা হয়েছে। বর্তমান লেখক অনন্তকুমার চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন আরেকটি। অধ্যাপনা তাঁর পেশা। সুতরাং এ বইয়ের ভঙ্গি যেমন জ্ঞানগর্ভ, অ্যাকাডেমিক, বিন্যাস তেমনিই পরিপাটি টানটান। যে-কোনো বিষয় বোঝাতে গিয়েই তিনি অধ্যাপক-সুলভ ভঙ্গিতে বলেন বিস্তর কথা, প্রভূত উদাহরণ, অসংখ্য রেফারেন্স, অগণিত দৃষ্টান্ত—হেগেল, দ্য ভিঞ্চি, ধূর্জটিপ্রসাদ, কলিংউড, রবীন্দ্রনাথ, ভেরলেন—কেউই তালিকা থেকে বাদ পড়েন না। আমার ধারণা মোট আঠারোটি অধ্যায়ের বিবিধ আলোচনায় লেখক চৌষট্টি কলার অধিকাংশই বেশ পারদর্শিতার সঙ্গেই ব্যাখ্যা করেছেন।

এ গ্রন্থের লেখক স্বতঃসিদ্ধের মতো ধারণ করেছেন একটি মত—"সংগীত একমাত্র স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ শিল্পরীতি।" অতঃপর এই সিদ্ধান্তটিকে প্রমাণের অভিপ্রায়ে অজস্র পাতায় অজস্র প্রামাণিক সমর্থনবাণী যোজনা করে গেছেন তিনি। ধ্বনিই যে সংগীতের মূল—একথা বোঝাতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার ধ্বনির অধ্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাঁর বিশ্লেষণ। সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে লেখকের কৌতূহল এবং সন্ধিৎসা মূল্যবান করেছে এই গ্রন্থের সংগীত বিষয়ে অজ্ঞতা বিষয়ে লেখকের সূচিন্তিত বিনয়প্রস্তাবনা—ইউরোপীয় সংগীত বিষয়ে বর্তমান লেখক প্রায় সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন"। সত্যিই অজ্ঞতা? না বৈষ্ণবোচিত বিনয়? পরবর্তী অষ্টম বা নবম অধ্যায়ের আলোচনা বিশদভাবেই হিন্দুস্তানী সংগীত-বিষয়ক। দশম অধ্যায়ে একদিকে ভারতীয় মার্গসংগীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, পাশাপাশি বাখ্‌-বিঠোফেন-মোৎসার্ট-ভাগনারকে নিয়ে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল—অথচ আজকের Cosplolitanism or cultural Americanisation-এর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে সেই cultural aristrocracy-র কী করুণ আর অসহায় অপঘাতমৃত্যু ঘটেছে। লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন সঠিকই। "দুই সভ্যতার (প্রাচ্য-প্রতীচ্য) সাংগীতিক মনোভাব আলাদা" আর সেই কারণেই জোর করে সমন্বয়ের বন্দোবস্ত করলে জনসমর্থন-বিহীন অন্তেতরর মতোই পরবর্তী প্রজন্মও হবে বন্ধ্যাত্বের শিকার। লেখক এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যে, এই কৃত্রিম সমন্বয়ের জন্যই উচ্ছন্নগামী আজকের দেশীয় সংগীত। এমন কি যে লোকসুরে শিল্পসংগীতসুলভ জটিলতা নেই, অকৃত্রিম সারল্যই যার প্রধান লক্ষণ, সেইসঙ্গে দার্শনিক আর সামাজিক প্রত্যক্ষতা এবং অনুপেক্ষণীয় সাহিত্যগুণ যার সম্পদ—ব্যবসায়িক সাফল্যের তাগাদায় তারও অপ্সন দূষিত হয়েছে। সংগীতের একজন আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এই বুণ্ণতা লেখককে তো পীড়িত করবেই। কিন্তু বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীত যখন বাইজী-পল্লীতে আর অভিজাত দরবারের জলসাঘরে প্রবেশ করে শাস্ত্র-বিরোধী হয়ে উঠল, সে যুগের কর্মকাণ্ডকে আমরা সামাজিক অবক্ষয় বা রুচির অবনয়ন বলে দোষারোপ করব,—আজকের দিনেও, এমন রক্ষণশীল কি না হলেই নয়? তবে কি যা প্রক্ষিপ্ত, যা শাস্ত্রনিষিদ্ধ তা-ই কুরুচিকর, অ-শিল্প? তবে কি সংগীতের প্রগতি স্থবির হয়ে থাকবে? দাদরা-গজল-ঠুংরি মজলিশি গান হতে পারে, শাস্ত্রবিরোধী হতে পারে, কিন্তু শিল্প-মূল্যসিয়ানায় সে কোন্‌দিকে কম?

সমান পিউরিট্যান উন্নাসিকতাই পরবর্তী হয়েদশ অধ্যায়েও—কৃষ্ণনাগরিকদের পৃষ্ঠপোষণা শাস্ত্রীয় সংগীতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু টপ্পা, আখড়াই, খেউড়, ঝুমুর, কবিগান তর্জা পাঁচালির কদর্য সাজগোজ বাঙলাদেশের বাজার ময়লা করে এল অবক্ষয়ী যুগে—যতদিন না পর্যন্ত ব্রহ্মসংগীত-নামক ভক্তিগীতির মরায়ল শাসন এল—এ কথাও কি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-কারদেরই প্রতিষ্ঠনি নয়? এত দিন পরে নতুন করে এই পুরোনো অভিযোগের পুনরুক্তির জন্য কি ঘটা করে বই লেখার দরকার ছিল?

অতঃপর যে সমে এসে মিলে যায় সব তাল-বেতাল, সেই রবীন্দ্রনাথেই এসে মিশেছে সমস্ত নতজানু আত্ম-সমর্পণ। শুদ্ধতম উচ্চাঙ্গসংগীতের সঙ্গে কমবেশি আপোস-রফা করে যে কলোনিয়াল সংগীতের প্রবর্তনা হয়েছিল তাতে সংস্কৃতিসংকটের সম্ভাবনাই ছিল সর্বাধিক, মুক্তির আশা নিতান্তই ক্ষীণ। চতুর্দশ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পংক্তি—"সংগীতের সেই মুক্তি আর সৃষ্টি-লীলার সূত্রপাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে। এমনি এক বিচিত্র পরিবেশে রবীন্দ্রপ্রতিভার আবির্ভাব।"

রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাকরণিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার যাত্রা শুরু এই চতুর্দশ অধ্যায় থেকেই। তাঁর গানের সুরবিন্যাস যেখানে কথার ঝোঁকের সমানুপাতিক, কিংবা যেখানে কথা-সুরের চমৎকার ভারসাম্যে গড়ে উঠেছে বস্তু-অতিক্রান্ত গভীরতর ব্যঞ্জনা, অসামান্য ইঙ্গিতবহ প্রেক্ষণী। লেখক সচেতন-মনস্কতায় চেষ্টা পেয়েছেন কিভাবে প্রথাগত অনুবঙ্গ ব্যবহার সত্ত্বেও সংগীতের সীমা খুঁজে নিয়েছে অসীমকে রবীন্দ্রনাথেরই গানে। বিশেষ করে যে মূল্যবান কথাটি গ্রন্থকার লেখেন—"রবীন্দ্রসংগীতের আস্থায়ীকে বাদ দিলে সঞ্চারীই হল গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। একে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তোলায় যুগপৎ কাব্যের ও সুরের দিক থেকে শিল্পের কাঠামোগত ভারসাম্যটি অর্জিত হয়।" এ কথাটি আমার গুরু রবীন্দ্রসংগীতাচার্য স্বয়ং শৈলজা-রঞ্জন মজুমদার স্বয়ং আমার মতো অকিঞ্চিৎকর শিষ্যকে উদ্বাস্ত মনে করিয়ে দেন।

ষোড়শ অধ্যায়ে সংকলিত রবীন্দ্র-নাথেরই গুরুত্বপূর্ণ উক্তি—"Art is never an exhibition, but an revelation." প্রণালীবদ্ধভাবে ধ্রুপদী কাঠামোয় ওস্তাদি রবীন্দ্রসংগীত গাইবার আগে এই 'revelation'-এর ব্যাপারটা চিন্তা করাটা অবশ্যই জরুরি। অন্যত্র লেখক বলছেন—"রবীন্দ্রসংগীত সংগীত—সংগীত ছাড়া কিছুই নয়। .....রবীন্দ্রসংগীতে কাব্যও আছে। কিন্তু গোটা গীতবিতান বইখানা পড়ে গেলে বা মুখস্থ করলেও রবীন্দ্র-সংগীতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সংগীতের রুচি দিয়েই তাকে গ্রহণ করতে হবে।" পাঠক হিসেবে আমার মনে পড়ে না সম্প্রতি লোকান্তরিত রবীন্দ্রপূজারী শ্রদ্ধেয় আইয়ুবের পর অন্য কোনো লেখনী এইরকম বিনীত আত্মনিবেদন করেছেন কিনা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতের রক্ষণ ও প্রসারণ বিষয়ে জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষীর সংগত উদ্বেগ। সৎ সংস্কৃতি ও শুভশিল্পধারসের একমাত্র শক্ত বুনিয়াদ হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতকে প্রতিপন্ন করার জন্যই দীর্ঘ একশো পঞ্চাশ পাতা ধরে সংগীতের ইতিহাস হাতড়ে এলেন গ্রন্থকার। সার্থক তাঁর পরিক্রমা। সমে পৌঁছেছেনও নির্বিঘ্নে। পথে আইপি-টি-এর সংগীতকারদের করমর্দন করেছেন, বাহাদুরি দিয়েছেন লোক-সংগীতকে। শিল্পের নৈরাজ্যে পাছে দেউলিয়া হয়ে পড়েন—এই উৎকণ্ঠা তাঁর প্রকাশ পেয়েছে আগাগোড়া। সংগীতের প্রকরণগত ও শিল্পগত আলোচনার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের দিকেও নজর ফিরিয়েছেন মাঝে-মাঝে। ভারতীয় মার্গসংগীতের পিতৃপুরুষ তানসেন থেকে শুরু করে এক দীর্ঘ বংশলতিকার ছোটোবড়ো মানুষ মারফত সেনী ঘরানা কেমন করে কোন মোহানায় পড়েছে তার একটা প্রামাণিক নির্ভরযোগ্য মানচিত্র তিনি আমাদের হাতে দিয়েছেন।—গুরুরা বংশাভিমানের সংকীর্ণতায় বিজাতীয় শিষ্যকুলের কাছে নিজেদের ঘরানার শিক্ষা উজাড় করে নিঃস্ব হতে চান নি—এই বেদনাও ব্যথিত করেছে লেখককে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে, সিমফনি আর হারমোনির বাড়াবাড়িতে অধঃপতনে গেছে আজকের ভারতীয় সংগীত—এ দুঃখ প্রকাশও সংগত, নিরপেক্ষ এবং সমর্থনযোগ্য।

শুধু অস্বস্তি হয় গোটা বই জুড়ে ইংরেজি সংখ্যা আর যে কোনো সরল অর্থদ্যোতক বাঙলা শব্দকেই কন্টেক্সটে অযথা ইংরেজিতে তর্জমা করার ঝোঁক দেখে। খটকা লাগে নামকরণে—যদিও তা রবীন্দ্রকাব্যের কাছেই ক্ষণস্থত তথাপি শিরোনাম আর পাঠকের মাঝখানে এক অদৃশ্য বিকর্ষণবল কাজ করে। নামকরণের সংক্ষিপ্তির মধ্যেও কিভাবে নিহিত ব্যঞ্জনার জাদু দিয়ে পাঠককে সম্মোহিত করতে হয়, তার কৌশল আয়ত্ত থাকা উচিত লেখকদের। এ তো আর গল্প-উপন্যাস নয়। তত্ত্বের বই পড়া পাঠকের কাছে যেন এক দুরূহ টাস্ক। সেই তত্ত্বের বইয়ের নামকরণেও বাড়তি কাঠিন্যের বোঝা চাপিয়ে আমরা আর কতদিন সংখ্যালঘু করব সীরিয়াস পাঠক?

বর্ণালী দাস

নানা প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চা

সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল তাঁদের ভবনে উচ্চতর 'সংস্কৃত' পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করছেন। সংস্কৃতের সঙ্গে পালি-প্রাকৃত ভাষার চর্চাও জড়িত। এই সূত্রে বলা যায় এই মহানগরীতে কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'সংস্কৃত' পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে দেড়শো বছরের অধিক বয়সী 'সংস্কৃত কলেজ' যেখানে স্নাতকোত্তর গবেষণা-বিভাগ ও প্রাচীন ধারার 'টোল' পাশাপাশি বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ও বর্তমানে (১৯৫১ সাল থেকে) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত 'বিশ্বভারতী'তে 'চীনা' 'তিব্বতী' ভাষাসহ সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ও গবেষণার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষার ও গবেষণার সুযোগের অভাব নেই, অভাব ঘটছে সেই সুযোগ গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীর। সেজন্য সন্তানের জীবিকার ভবিষ্যৎ ভেবে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকেরাও তাদের আর সংস্কৃত পড়াচ্ছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বা 'সংস্কৃত কলেজে' সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে এখন আঙুলে-গোনা-যায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্কুলে মাধ্যমিকস্তরে 'সংস্কৃত'কে অবশ্যপাঠ্য করলে কলেজে ছাত্রেরা অনেকেই ওই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে এমন আশা করা দুরাশা। কেননা যে-সময়ে আমরা বাস করছি সেটি মুখ্যত প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর হয়ে উঠছে। সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন দ্রুত ঘটছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার দৌলতে। কাজেই প্রযুক্তি-বিদ্যার বহুমুখী কলকাঠিকে আয়ত্ত করবার ঝোঁক ও আগ্রহ ছাত্রদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক—এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে! পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার সংখ্যাল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশেচ্ছু অথচ ব্যর্থকাম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উদ্‌বেগজনক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পুঁজি-ভিত্তিক নাগরিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। সেই যন্ত্র-শিল্পজীবী সমাজ-পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ী-বিদ্যা অর্জন প্রয়োজন। সেজন্য চতুর্দিকে 'ইনস্‌টিটিউট অব বিজ্‌নেস ম্যানেজমেন্‌ট' গড়ে উঠছে। দেখা দিচ্ছে চাটার্ড অ্যাকাউন্‌টেনসির 'কোচিং ক্লাস'! এই আবহাওয়ায় স্বভাবতই 'মানবিক বিদ্যা' অর্থাৎ 'হিউম্যানিটিস্‌'-এর পড়ুয়ার সংখ্যা সর্বত্র কমে যেতে বাধ্য। বিজ্ঞান, কারিগরি বা প্রযুক্তি বিদ্যায় যারা আগ্রহ দেখায় না এমন ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে চায় সামাজিক-বিদ্যা অর্থাৎ 'সোসাল সায়েন্‌স'। কাজেই মানতে হবে 'সংস্কৃত' শিক্ষার উপযোগিতা স্কুল-কলেজে দ্রুত কমে গেছে ও যাচ্ছে। একদা ভারতে বৃটিশ আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় "ক্ল্যাসিকাল লাঙ্গুয়েজ' অবশ্যপাঠ্য ছিল ইংলন্ডের মডেলে। আজ সেখানে গ্রীক, লাতিন শিক্ষার দশা হতাশাব্যঞ্জক।

এখন থেকে দুশো বছরের বেশি আগে ওয়ারেন হেস্‌টিংসের প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চায় সহায়তা, চার্লস্‌ উইলকিন্‌সের ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ, স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪), শকুন্তলার অনুবাদ বা সংস্কৃতভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। কিন্তু জোন্‌সও তাঁর অনুবাদকার্যে তৎকালে কালিদাসজ্ঞ পণ্ডিত বেশি পান নি। তখনকার বঙ্গদেশে ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের পঠন-পাঠন অপেক্ষাকৃত বেশি-মাত্রায় হত। বেদ-উপনিষদের চর্চা খুব কমই ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের পণ্ডিত ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের অর্থ ধরতে পারেন নি, তাই দেবেন্দ্রনাথকে যেতে হয়েছিল রামমোহন রায়ের সহযোগী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। বেদাধ্যয়ন শিক্ষার জন্য চাঙ্গাল বাঙালি ছাত্রকে তিনি নিজব্যয়ে কাশীধামে পাঠিয়েছিলেন। মনে রাখতে হয়, পাণিনির ব্যাকরণের চেয়ে সহজতর ব্যাকরণই বঙ্গদেশে অধিক পঠিত হত। এসব কথা লেখার অর্থ এই নয়, যে, দেশে বড়োমাপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বেশি ছিলেন না। জোন্‌স, কোলব্‌রুক্‌, প্রিন্‌সেপ প্রভৃতি ইংরেজ 'ভারততত্ত্ববিদে'রা যে কাজ করেছিলেন তার পিছনে ছিলেন বিশিষ্ট বাঙালি পণ্ডিতেরা। অথচ আজ তাঁদের কেউ স্মরণ করে না, তাঁদের দান বিচার করে না।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যাঁরা উনিশের শতকে লাভ করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের, প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচিত্র বিদ্যার, সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের যথার্থ অনুরাগী হন। এই অনুরাগের পিছনে কার্যকর ছিল স্বদেশ-ও স্বধর্মানুরাগ। রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, বেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্রাতৃক দ্বিজেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের বহুমুখী চিন্তার উজ্জ্বল প্রকাশ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই আলোড়ন ও সৃষ্টি স্কুল-কলেজে সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পড়ার ফল একথা বলা চলে না। প্রাচীন ভারতের সব কিছুকে নতুন করে জানবার ও জানাবার, শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বিচার করবার প্রবল ঝোঁক [বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস'] সে-সময় দেখা দিয়েছিল। এই সচেতনতা ও অনুরাগ থেকে প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রাদি ও সাহিত্যপাঠের আগ্রহ জাগ্রত হয়।

টোলে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে 'সংস্কৃত' শিক্ষাদান নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কোটালিপাড়া এবং অন্যান্য কেন্দ্রে অব্যাহত ছিল। সেখানে প্রতিভাধর দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতেরা শিষ্যপরম্পরায় বহুবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। বুদ্ধিমান ছাত্রও তাঁরা পেতেন। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় দ্রুত সে-যুগের অবসান ধ্বনিত হল। অধিকাংশ পণ্ডিত মহাশয়েরা স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। কেননা টোলে মেধাবী ছাত্র জোটে না, সামান্য 'বৃত্তি'তে দিন চলে না।

এমন সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) আমাদের দেশকে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। তারপর দেশভাগ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। স্বভাবত জোর পড়ল শিল্পোন্নয়নের উপর। ভারি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মধ্য দিয়ে যন্ত্রপুষ্ট নাগরিক সভ্যতার ক্রমব্যাপ্তির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে 'সংস্কৃত' শিক্ষা ও 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' চর্চার স্থান ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। একদা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভান্ডারকর থেকে দীনেশচন্দ্র সরকার এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু দেখেছি যে-সব প্রার্থী ইতিহাসে অনার্স না থাকায় 'আধুনিক ইতিহাস' বিভাগে ভর্তি হতে পারে না, তাদেরই স্থান হয় 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগে। কিন্তু লিপিউৎকিরণবিদ্যা (এপিগ্রাফি), মুদ্রাপরীক্ষণবিদ্যা (নিউমিজম্যাটিকস্‌) বা মূর্তিসম্পর্কিত বিদ্যা (আইকোনোগ্রাফি) আয়ত্ত করা কঠিন। ১৯৮১ সালে কলকাতায় 'এপিগ্রাফি'র দুশো বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে-সম্মেলন হয় সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল 'এপিগ্রাফি'র শাখায় ছাত্র হয় না বললেই হয়। এই বিষয়ে পারঙ্গম হতে গেলে বিভিন্ন ধরনের লিপি ও বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত হতে হবে। উল্লেখিত অপর দুটি বিদ্যাও বিশেষ (স্পেশালাইজড) শিক্ষণের দাবি রাখে।

তাহলে ভারতের এই সমৃদ্ধ বিশ্ববরেণ্য ভাষা, তার অপরিমেয় সম্পদ নিয়ে কি আমাদের কাছে পূর্ণ পরিচিত হয়ে উঠবে না? একথা মেনে নিতে হবে জোর করে সকলকে মাধ্যমিকশিক্ষাস্তরে ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়ে কোনো সুচির স্থায়ী ফল হবে না। ওই সামান্য সংস্কৃত শিক্ষাদ্বারা শাস্ত্র বা সাহিত্য কিছুই তার বোধগম্য হবে না। 'সংস্কৃত' শিক্ষাদানের জন্য নতুন ধরনের ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যে-পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে সেই 'মেথড' বা শিক্ষারীতি গ্রহণ করায় বাধা কী?

পূর্বসূরিবৃন্দ যে মহৎ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তাকে তো আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেজন্য সংখ্যাগত বৃদ্ধির চেয়ে গুণগত মানকে উন্নত করতে হবে অর্থাৎ 'কোয়ান্‌টিটি'র চেয়ে 'কোয়ালিটি'র উপর জোর দিতে হবে। সেজন্য বৈজ্ঞানিকপ্রণাসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তার সঙ্গে বেদ-উপনিষদ্‌সহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত সকল প্রকারের প্রধান-প্রধান শাস্ত্র ও সাহিত্যাদ্যন্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ চির-বরণীয় পণ্ডিতবর্গ বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মৌলিক ও অনূদিত রচনার দ্বারা। এই পথই অবশ্য-গ্রহণীয়। এই পথেই 'সংস্কৃতে'র মুক্তি।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

শিবশঙ্কর পিল্লৈ : শ্রেণীবিভক্ত মানবসমাজের সার্থক রূপকার

প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর যাঁরা রাখেন কেরলের যোসেফ মুন্‌ডশ্‌শেরির নাম তাঁদের কাছে পরিচিত ই. এম. এস. নাম্‌বুদিরিপাদের মন্ত্রিসভার (১৯৫৭-৫৯) শিক্ষা এবং সমবায় মন্ত্রী হিসেবে। প্রগতিশীল মালয়ালম সাহিত্য-আন্দোলনের ইতিহাসে সাহিত্যসমালোচক হিসেবে মুন্‌ডশ্‌শেরির ভূমিকা আমাদের অনেকের জানা নেই। শুধু মালয়ালী প্রগ্রেসিভ রাইটার্‌স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবেই নয়, মালয়ালম ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে তকষি শিবশঙ্কর পিল্লৈ, কেশবদেব, ডৈকম মুহাম্মদ বশীর বা পোট্টেকট অথবা কবিতার ক্ষেত্রে চঙ্গমপুঝা কৃষ্ণ পিল্লৈ-এর মতো প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের প্রকাশ্য সমর্থন এবং উৎসাহদানের কারণে মুন্‌ডশ্‌শেরির ভূমিকা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এবং সেই কারণেই তকষি যখন বলেন, "আমার মতে শ্রীযোসেফ মুন্‌ডশ্‌শেরিই মালায়লম সাহিত্যের সবচেয়ে নামী সমালোচক।...সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি যখন নামলেন তখন তাঁর বক্তব্যে একটা নতুন স্বর শোনা গেল। এ স্বর শুনে সকলে চমকে উঠলেন, অনেকে আঘাত পেলেন, প্রচলিত বিশ্বাসবোধকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিলেন, তাতে অনেকের শত্রুতা তিনি অর্জন করলেন এবং পুরানো ঐতিহ্যের ধ্বজাবাহীরা তাঁর উপর আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নি, তাঁর কণ্ঠকেও রোধ করা যায় নি।...আজকে তাঁর বক্তব্যকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতে আমরা একমত হই বা না হই তার গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।" তখন আমরাও সহজে তা স্বীকার করে নিতে আগ্রহী হয়ে পড়ি, যেহেতু যে প্রগতিশীল ধারার প্রবল প্রবক্তা ছিলেন

মুন্ডশ্শেরি, আমরা জানি সে ধারার পয়লা নম্বর নাম তকষি শিবশঙ্কর পিল্লে-এর, যিনি স্বয়ং মুন্ডশ্শেরির পক্ষ নিয়ে একথাগুলি বলেছেন।

মুন্ডশ্শেরি তাঁর 'অন্তরীক্ষম্' বা 'মানদণ্ডম্' সমালোচনাগ্রন্থে পূর্বযুগের কুমারম্ আসান, ভাল্লাথোল বা উল্লূরের যুক্তিসর্বস্বতা সমালোচনা করেছিলেন, আবার তাঁর আলোচনাতেই তিনি তকষি প্রমুখের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। মুন্ডশ্শেরির বিচার বৃথা যায় নি, আজ তকষি শিবশঙ্কর পিল্লে-এর স্বীকৃতি সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। তিনি বর্তমান বছরে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সংবর্ধিত হয়েছেন।

শিবশঙ্কর পিল্লে-প্রসঙ্গে আলোচনার সূচনায় স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে অনুবাদের অপ্রতুলতাহেতু মালায়লম সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় স্পর্শক-সান্নিধ্যের চেয়ে গভীরতর হয়ে ওঠে নি। গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে মালায়লম গ্রন্থের খানচারেকের চেয়ে বেশি বাঙলায় অনুবাদিত হয় নি। যদিও আমাদের সৌভাগ্য যে তার মধ্যে দুটি গ্রন্থই, দু কুনকে ধান (রন্টিতাপ্পাযি) আর চিংড়ি (চেম্মিন) শিবশঙ্কর পিল্লে-এর। এই অনুবাদগুলি আমরা পেয়েছি সাহিত্য অকাদেমির আনুকূল্যে। মালায়লম সাহিত্য নিয়ে বাঙলায় আলোচনার অপর একটি বাধা, আপাতভাবে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও, প্রতি পদে বিরক্তিকর। সে হল প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যা। মালায়লমে তকসি'র যে উচ্চারণ, বাঙলা বর্ণমালায় তা সঠিক লেখার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। বাঙলায় যেখানে 'যি' লেখা হচ্ছে, ইংরেজিতে সেখানে 'জেড এইচ' দিয়ে কাজ সারা হয় বটে, মূল মালায়লমে উচ্চারণ অনেকটা পরশুরামের চিকিৎসাসংকটের তারিণীখুড়োর 'য়ানতি পার না'-র জেড-এর সঙ্গে একটা 'ড়'-এর প্রলেপ লাগবে। হয়তো তাতেও যথাযথ উচ্চারণের কাছে যাওয়া যাবে না।

তকষি (অধিকপ্রচলিত, এই বিচারে অগত্যা এই বানানেই রাজি হওয়া গেল) একটি গ্রামের নাম। সমুদ্রোপকূলবর্তী আলেপ্পির অন্তর্বর্তী তকষি হল শিবশঙ্কর পিল্লে এর জন্মগ্রাম। আঞ্চলিক রীতি অনুযায়ী জন্মগ্রামের নাম তাঁর নিজের নামের অংশ হয়েছে। শুধু তাই নয়, আজ একাত্তর বছর বয়সেও শিবশঙ্কর তাঁর আপন গ্রামের অধিবাসী। গ্রামের নাম তাঁর নামে আর ঠিকানায় চিরকালের মতো জড়িয়ে রয়েছে। ১৯১৯ সালের ১৭ এপ্রিল তিনি এই গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হন। কথাকলি নৃত্যের প্রবাদপুরুষ কুঞ্জু কুরুপ ছিলেন তাঁর খুল্লতাত। গ্রামের ইস্কুল ছেড়ে শিবশঙ্কর যে বিদ্যালয়ে যান সেটি ছিল সমুদ্রতীরবর্তী জেলেপাড়ার মধ্যে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই তাঁর আবাল্য পরিচয় শুরু। পরে ১৯৩৪ সালে ওকালতি পরীক্ষায় পাস করে যখন ওকালতি শুরু করেন, তখন তাঁর মক্কেলদের অধিকাংশই ছিলেন এই সম্প্রদায়ের মানুষ। অধিকাংশ সাহিত্যিকের কৈশোরে যেমন হয়, শিবশঙ্করও হাইস্কুলে পড়বার সময়েই কবিতা লেখা শুরু করেন। কিন্তু কৈনিক্কর কুমার পিল্লে-এর মতো পণ্ডিত-সমালোচকের প্রভাবে এসে গদ্য লেখার হাত দেন। ত্রিবান্দ্রামে লা কলেজে ওকালতি পড়তে এসে তরুণ শিবশঙ্কর সাহিত্য-পত্রিকা 'কেশরী'র সম্পাদক বালকৃষ্ণ পিল্লে-এর ঘনিষ্ঠ হলেন। যোগসূত্র মুন্ডশ্শেরির আগে বালকৃষ্ণ পিল্লে মালায়লম সাহিত্যে প্রতিবাদের কথা, সমাজসচেতন সাহিত্যের কথা বলতে শুরু করলেন। এবং উল্লেখ করা কর্তব্য যে এ ঘটনা ১৯৩৬ সালে লক্ষ্যীতে প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের আগের কথা। সেদিন যাঁরা বালকৃষ্ণ পিল্লে-এর গোষ্ঠীতে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তী কালে মালায়লম সাহিত্যে এবং কেরলের রাজনীতিতে প্রগতিশীল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই 'কেশরী'র আড্ডাতে এসেই শিবশঙ্করের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল—মার্কস ফ্রয়েড পড়লেন। 'কেশরী'তেই তাঁর ছোটোগল্প প্রকাশিত হল। প্রথম দিককার ছোটোগল্পে দেখা গেল ফরাসি বাস্তববাদের সুস্পষ্ট ছায়া, যেন মোপাসাঁর অনুকরণ। তাঁর প্রথম সার্থক গল্প ভেল্লেপ্পোরম্ম্-এ তিনি এক নিশ্চিন্ত পরিণতির সন্ধান পেয়েছেন। মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের কুট্টনাদ-এ প্রতি বছর যে বন্যা লেগেই আছে, তা নিয়েই লেখা ভেল্লেপ্পোরম্ম্। একটি অসহায় নিঃসঙ্গ কুকুর একটা ডুবন্ত বাড়ির মাথায় বসে কেঁদে চলেছে—এই প্রতীকের ভিতর দিয়ে এক আশ্চর্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তিনি এই গল্পটিতে। শিবশঙ্করের প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশিত হয় খুব সম্ভবত ১৯৩৪ সালে। অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি উপন্যাস 'প্রতিফলম্' এবং 'পতিতপঙ্কজম্'। প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। শিবশঙ্করের গল্পসংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চণ্ডাতিকল, ইনকিলাব, মকলুত্তে মকল, প্রতীক্ষাকাল, পতিব্রতা, ঘোষযাত্রা, আডিওঝুক্কেল, নিত্যকাঁরিক, প্রতিজ্ঞা এবং তকষিয়ুড়ে কথাকল।

কেরল লেখক সমবায়সংস্থা বিভিন্ন খ্যাতনামা লেখকদের গল্পসংকলন প্রকাশ করে থাকেন। এঁরা 'তীরাল্লেদুত কথাকল' নামে তকষির প্রায় ৫০টি গল্প নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন।

শিবশঙ্করের প্রথম দুটি উপন্যাস প্রতিফলম্ এবং পতিতপঙ্কজম্-এ মোপাসাঁর ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট। এ দুটি উপন্যাসে এযাবৎ সাহিত্যে নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ এবং প্রচলিত নৈতিকতার বিরুদ্ধে ঘোষণা থাকায় রক্ষণশীল গোষ্ঠীতে খুব আলোড়ন শুরু হয়। এর পরে ত্রিবাঙ্কুরে ভায়ালারের ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের ভিত্তিতে রচিত উপন্যাস 'তালয়োড়ু'-তে (১৯৪৭) তিনি পূর্বধারা ছেড়ে শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে উপন্যাস রচনা শুরু করলেন। এই হল শিবশঙ্করের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

টোট্টিয়ুড়ে মকন (১৯৪৮) এবং চেণ্ডি বর্গম্ (১৯৫০) দুটি উপন্যাসে হরিজন আর ভিখারিদের নিয়ে লিখলেন শিবশঙ্কর। এই সময় তিনি রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। 'টোট্টিয়ুড়ে মকন' লেখা হয়েছিল তাঁর আন্দোলনকালে। এক অদ্ভুত ঝাড়ুদার তার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে অদ্ভুত বৃত্তির অভিশাপ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। সেই সংগ্রাম কিভাবে ব্যর্থ হল এবং সেই ব্যর্থতা ঝাড়ুদার-পুত্রকে কিভাবে বৈপ্লবিক চেতনার সন্ধান দিল তা নিয়ে এই উপন্যাস।

'চেম্মিন' (১৯৫৬)-এর সূত্রেই বাইরের জগতে শিবশঙ্কর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে মালায়লম সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্ণীত হয়েছে 'রন্টিতাপ্পাযি' (১৯৮৪)-র সূত্রে। কুট্টনাদের জলাভূমিতে আবহমান কাল ধরে যে ভূমিহীন কৃষক চাষ করে আসছেন, তাঁরা শুধু কৃষিকাজেই দক্ষ নন, জলাভূমিতে বাঁধ দেওয়া, জল সরানো ইত্যাদি নানা কাজ তাঁদের করতে হয়। একদা এঁরা ছিলেন তপ্পুরান বা জমির মালিকের ভূমিদাস। কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে দিন বদলায়, ভূমিদাসপ্রথার পরিবর্তে বেতনসম্পর্ক আসে। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ কাহিনীর নায়ক কোরন এমনই, একজন ভূমিহীন কৃষক। এ উপন্যাসে ১৯৪৬ সালে ভায়লারে নিরস্ত্র কৃষক জনতার উপর গুলি চালিয়ে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী যে ৮০০ জনকে মারা হয়েছিল তার উল্লেখ আছে। 'রন্টিতাপ্পাযি'-তে স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন এসে পড়েছে। তাতেই উপন্যাসটি খাঁটি এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাস সম্বন্ধে তকষির নিজের স্বীকৃতি আছে যে কৃষকের ঘরের ছেলে হিসেবে তিনি যা দেখেছেন, সয়েছেন এবং অনুভব করেছেন এই উপন্যাসে তাই তিনি অকপটে কোনো রঙ না চড়িয়ে বিবৃত করেছেন।

'চেম্মিন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। চেম্মিনে এসে তকষির রচনা একটু নতুন বাঁক নেয়। যে বাস্তববাদ এবং জনজীবনের স্পষ্ট ছবি তিনি রন্টিতাপ্পাযিতে এঁকেছিলেন, চেম্মিনে তার সঙ্গে এক রোমানটিকতা এসে জুড়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত উপন্যাসপাঠকের কাছে চেম্মিন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অতি দ্রুত তার সংস্করণ ফুরিয়ে যায়। সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার ঘরে আসে। মালায়লম ভাষায় চলচ্চিত্রায়নের ফলে চেম্মিন ১৯৬৬ সালে চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে। 'রন্টিতাপ্পাযি'ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সে উপন্যাসও বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। তবু 'রন্টিতাপ্পাযি' এবং 'চেম্মিন' তকষির ঠিক একই চেতনার প্রকাশ নয়। 'রন্টিতাপ্পাযি'তে তিনি অনেক বেশি প্রতিবাদী, চেম্মিনে তিনি প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের পথ ছেড়ে ভাগ্য-লাঞ্ছিত দরিদ্র জেলের জীবনের অনিবার্যতাকে এক প্রেমের প্রেক্ষাপটে গভীর ক্ষমতায় আঁকলেন। মনে রাখা ভালো, দুটি উপন্যাসের মধ্যে আট বছরের ব্যবধান। এবং ১৯৪৮ সালের ৩৪-বছর-বয়স্ক তকষি ভারতবর্ষ বা তাঁর কেরলভূমিকে যে সংগ্রামমুখর বলে ভেবেছিলেন, ১৯৫৬ সালে তার সংগ্রামী পরিণতি তো ঘটে নি। তাই রন্টিতাপ্পাযী থেকে চেম্মিনে তকষি যেন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কাছাকাছি থাকার তাগিদে সংস্কার, বিশ্বাস সংবলিত একটা সম্প্রদায়ের যথার্থ ছবি আঁকলেন।

'চেম্মিনে'র তিন বছর পর লিখলেন কেরল প্রদেশের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় নিয়ে 'দ্য চিলড্রেন অব অউসেফ' (উপন্যাসটির মালায়লম নাম জানতে পারি নি)। তারও কয়েক বছর পর একটি নিম্নাধিকারী কেরানির আমলাতান্ত্রিক মঞ্চআরোহণ নিয়ে লিখলেন 'এনিম্পডিকল'। এই উপন্যাসটিরও সার্থক চলচ্চিত্রায়ন ঘটেছে। এ পর্যন্ত তকষির তিনটি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এবং তিনটিই দর্শকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছে। আজকের জঘন্য কদর্য মালায়লম চলচ্চিত্র, যা আমাদের শহরকে গ্রাস করতে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গত দুই দশকের মালায়লম চলচ্চিত্রের সৎ প্রয়াসের প্রমাণস্বরূপ তকষির তিনটি উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপের কথা মনে রাখা যেতে পারে। তকষির একটি গল্প থেকে যে রাজনৈতিক নাটক 'তোত্তিল্লো' একদা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাও উল্লেখযোগ্য।

আমাদের সৌভাগ্য যে তকষি এখনো স্তব্ধ হন নি। ১৯৭৮ এবং ১৯৮২ সালে তাঁর দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ছোটোগল্পে এবং উপন্যাসে তকষি শিবশঙ্কর পিল্লে ভারতীয় সাহিত্য-মানচিত্রে এক সমাজসচেতন, জীবনধর্মী সংবেদনশীল রূপকার।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

আচার্য দীনেশচন্দ্র সরকার

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ভোরবেলায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-সাধনার ক্ষেত্রে প্রমাণপুরুষ আচার্য দীনেশচন্দ্র সরকারের জীবনাবসানে ভারতবিদ্যাচর্চার এক যুগের অবসান ঘটল।

দীনেশচন্দ্রের জন্ম ১৯০৭ সালের ৮ই জুন, পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলার কৃষ্ণনগরে। মা কুসুমকুমারী, বাবা আয়ুর্বেদবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যজ্ঞেশ্বর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র দীনেশচন্দ্র সংস্কৃতে অনারস নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯২৯

সালে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ১৯৩১ সালে। ১৯৩৬-এ অর্জন করেন 'ডকটর অব ফিলজফি' ডিগ্রী। গবেষণার বিষয় ছিল 'দ্য সাকসেসরস অব দ্য সাতবাহনজ ইন লোয়ার ডেকান'। ইতোমধ্যে ১৯৩৪-এ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-সম্পর্কিত আর-একটি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৩৭-এ সংশ্লিষ্ট গবেষণায় সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে মৌয়াট পদক পুরস্কার পান।

দীনেশচন্দের কর্মজীবনের আরম্ভ ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার হিসাবে। ১৯৪৯-এ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার লেখতত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন। পদটি ছিল অ্যাসিসট্যানট সুপ্রিনটেনডেনট ফর এপিগ্রাফিস্ট। ওই বিভাগের তদানীন্তন সর্বোচ্চপদ গভরনমেনট এপিগ্রাফিসট ফর ইনডিয়া লাভ করেন ১৯৫৫ সালে।

১৯৬১ সালে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিখ্যাত কারমাইকেল অধ্যাপক পদে বৃত হন। পরে ওই বিভাগের ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাকেন্দ্রের প্রধান হন। ১৯৭২ সালে ওই পদ থেকে অবসর নেবার পর বিভিন্ন সময়ে ভারতে এবং ভারতের বাইরে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে (যেমন পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ইত্যাদি) স্বল্পকালীন অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করেন।

কর্মমুখর জীবনে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে নিরলস এবং বহুমুখী গবেষণার জন্য পণ্ডিতসমাজে দীনেশচন্দ্র প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিভিন্ন সময়ে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দেশে বিদেশে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে, এবং বিভিন্ন আলোচনাচক্র এবং অধিবেশনে যোগদান করতে। এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি অধিবেশনে (যেমন ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদের কলিকাতা ও আগ্রা অধিবেশন, ১৯৭২ সালে নিখিলভারত প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের উজ্জয়িনী অধিবেশন, ১৯৭৫ সালে ভারতীয় পুরাভিলেখ পরিষদের ইন্দোর অধিবেশন, ১৯৮০ সালে অন্ধ্র ইতিহাস কংগ্রেসের নাগার্জুনসাগর অধিবেশন, ১৯৮০ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বোমবাই অধিবেশন, ইত্যাদি) সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

দীনেশচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ, নব নালন্দা মহাবিহার, ভারতীয় পুরাভিলেখ পরিষদ, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা ইত্যাদি) তাঁকে সম্মানিত সদস্যপদ, বিশিষ্ট সদস্যপদ, পদক, তাম্রপট্ট প্রভৃতি প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে ১৯৭২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির উইলিয়াম জোন্স পদক এবং ১৯৭৫-এ ভারতীয় পুরাভিলেখ পরিষদের তাম্রপট্ট লাভের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে নব নালন্দা মহাবিহার তাঁকে 'বিদ্যাবারিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিভিন্ন শিক্ষা-ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের ছিল নিবিড় যোগ। এদের মধ্যে কয়েকটির কার্যনির্বাহী সভা বা অছি পরিষদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতাস্থ ভারতীয় সংগ্রহশালার অছিপরিষদের সদস্য ছিলেন ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত।

দীনেশচন্দ্রের গবেষক জীবনের ব্যাপ্তি অর্ধশতাব্দীরও বেশি। এই সুদীর্ঘকাল ভারতীয়, বিশেষত প্রাচীন ভারতীয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন এবং গবেষণামূলক বিপুলসংখ্যক প্রবন্ধ (প্রায় ১২০০) ও বই (সংখ্যায় ৪৩)-এর প্রকাশ তাঁর যে ভাষ্যমূর্তিকে আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছে তা হচ্ছে আকর-জ্ঞানের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ানো, প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত এক প্রমাণপুরুষের। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক ও ধর্মগত ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যায় বিচরণ। প্রাচীন ভারতের ভূগোল, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছিল অসাধারণ ঔৎসুক্য। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত লেখমালা ও সংশ্লিষ্ট বর্ণমালার বিষয়ে তাঁর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান।

অধ্যাপক সরকার যে-সকল লেখ-এর পাঠোদ্ধার করেছেন তাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস সম্পর্কে নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। শুধু এই দুই বিষয়ের ইতিহাসেই নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মগত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে লেখমালার বহুল ও সর্বাংশে সার্থক ব্যবহার তাঁর আগে কেউ করেন নি।

সম্পাদনার কাজে অধ্যাপক সরকার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সম্পাদিত 'এপিগ্রাফিয়া ইনডিয়া' ও 'জারনাল অব এনসিয়েনট ইনডিয়ান হিস্টরি'র অনেকগুলি খণ্ড এবং উনিশটি বই সেই সাক্ষ্য বহন করছে। লেখতত্ত্ববিদ সমাজে উচ্চপ্রশংসিত 'সিলেকট ইনস্ক্রিপশনস বেয়ারিঙ অন ইনডিয়ান হিস্টরি অ্যানড সিভিলাইজেশন'ও একধরনের সম্পাদিত গ্রন্থ। এর দুই খণ্ডে বহু মূল্যবান লেখ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের মমতা ছিল লক্ষণীয়। এই বোধেরই এক ধরনের প্রকাশ বাঙলা ভাষায় রচিত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি।

শিক্ষকতার জীবনে অধ্যাপক সরকার অনেক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁরা তাঁর প্রধাণত ছাত্র না হলেও নিজেদের আচার্যের ছাত্র বলেই মনে করতেন। বর্তমান লেখক তাঁদেরই একজন। এইসকল ব্যক্তিদের মতোই লেখকের আচার্যের সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। এইসব আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠত তাঁর ইতিহাস সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও প্রখর স্মৃতিশক্তির স্পর্শে।

বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অধ্যাপক সরকার অনেক সময় অন্য ব্যক্তিদের মতের কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু সেইসব সমালোচনা তথ্যনিষ্ঠ এবং জ্ঞানানুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে তিনি গুণীর সমাদর করতে জানতেন। বেশ কয়েকটি পুস্তকের সমালোচনায় তাঁর প্রশংসাসূচক মন্তব্য সেইরূপই ইঙ্গিত করে।

দীনেশচন্দ্রের অসংখ্য গুণগ্রাহী ও ভক্তদের মধ্যে কয়েকজনের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে তাঁকে এক অভিনন্দনগ্রন্থ (**শ্রীদীনেশচন্দ্রিকা**) উপহার দেওয়া হয় ১৯৮৩ সালে। কিন্তু তাঁর গবেষণার মূল্যের সঠুকভ্র স্বীকৃতি এত অল্পে শেষ হওয়া উচিত নয়। তাঁর নামে বক্তৃতামালা ও অধ্যাপকপদের সৃষ্টি হওয়া উচিত। সুখের বিষয় যে তাঁর নামাঙ্কিত এক গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে বিহারের গয়া শহরে।

সাম্প্রতিক কালে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সরসীকুমার সরস্বতী ও রাধাগোবিন্দ বসাকের প্রয়াণের মতোই অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের তিরোধানও ভারততত্ত্ববিদ্‌যসমাজের অবক্ষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—যে সমাজ কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প জানে না, যার কাছে বৈজ্ঞানিক রীতিতে তথ্যানুসন্ধান ও মননশীলতাই জীবনধর্ম। সত্য যখন গোষ্ঠীভুক্ত, পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি যখন রাজনৈতিক মতবাদ ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, তখন এই সমাজের অবলুপ্তি প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু এই অবলুপ্তি রোধ করতে না পারলে ভারতবিদ্যা ও ভারত-ইতিহাসের চর্চার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ডি. এচ. লরেন্স

সাহিত্যধর্মে নৈর্ব্যক্তিকতা যাঁর উপাস্য ছিল না কোনোকালেই, যিনি কোনোদিনই টি. এস. এলিয়টের মতো বলেন নি, "পোয়েট্রি...ইজ অ্যান এসকেপ ফ্রম ইমোশন", শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে বুদ্ধি এবং আঙ্গিকের ওপরে যিনি স্থান দিয়েছেন আন্তরিক আবেগকে, সেই ডি. এচ. লরেন্সের জন্মের একশো বছর পূর্ণ হল ১৯৮৫তে। তাঁর সাহিত্যকীর্তি ইতিমধ্যে বহু আলোচিত হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ততোধিক। চমকপ্রদ সেই ব্যক্তিত্বের কতকগুলি তির্যক দিক আছে। সেগুলি স্মরণে রাখলে তাঁর শিল্পকৃতিকে বুঝতে সুবিধা হয়।

তাঁর বাবা ছিলেন কয়লাখনির শ্রমিক, মা ছিলেন বিবাহের পূর্বে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। অসম এই সম্বন্ধ লরেন্সের চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'সানস অ্যানড লাভারস' (১৯১৩) থেকে শেষ উপন্যাস 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' (১৯২৬-২৭) পর্যন্ত। নানাভাবে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে লরেন্স ভেবেছেন এবং লিখেছেন, যে ভাবনার মূল কথাটি হল এ সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তির প্রয়োজনীয়তা। যন্ত্রকেন্দ্রিক এই আধুনিক সভ্যতা মানুষের চেতনাকে পিষ্ট করছে, তাই এই সভ্যতার তাঁর সমালোচনা করে লরেন্স সন্ধান করে ফিরেছেন এমন স্থান, এমন সংস্কৃতি, যেখানে মানুষ স্বাভাবিক প্রাণচেতনোর মর্মে ফিরে যেতে পারে। এদিক থেকে তিনি রোম্যানটিক। 'দ্য উঙম্যান হু রোড অ্যাওয়ে' (১৯২৮) নামক বড়ো গল্পটি এই আকাঙ্ক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

তাঁর স্ত্রী ছিলেন জরমান, অভিজাত এবং তাঁর প্রাক্তন গুরুপত্নী। এ বিবাহ লরেন্সের সমাজজীবনকে জটিল করে তুলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এর ফলে তাঁকে নানা নির্যাতনও সহ্য করতে হয়। ১৯১৬-র পর থেকেই তিনি একরকম দেশছাড়া। এই সময়ের সাহিত্যিক দান 'সী অ্যানড সার্ডিনিয়া' (১৯২১) প্রভৃতি অসামান্য ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অবশ্য তিনি বিশেষ কিছু লেখবার সুযোগ পান নি, যদিও ১৯২২-এ অসট্রেলিয়া পাড়ি দেবার পথে শ্রীলঙ্কায় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। মনে হয়, এদেশে এলে আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে হয়তো তাঁর প্রশ্নাদির কিছু উত্তর পেতেন।

জীবনের শেষ পাঁচ বছর য়ুরোপে ফিরে এসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। এ যুগের লেখায় তিনি যেমন একদিকে মানুষের জৈবপ্রকৃতির কেন্দ্রে কোনো পরম সত্যকে অন্বেষণ করে ফিরেছেন, তেমনি সন্ধান করেছেন মানুষের আদিম অকৃত্রিম রূপটিকে নানা সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে, কখনো মেকসিকোর পটভূমিকায়, কখনো অসট্রেলিয়ায়। গতানুগতিক ধর্মশাস্ত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল না বলে স্বরচিত কিছু তত্ত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সে তত্ত্ব খুব সমাদৃত হয় নি, কিন্তু তার পিছনের মানসিকতা আজ হয়তো অনেকেরই সহানুভূতি অর্জন করবে। যান্ত্রিকতা-অধিগত পাশ্চাত্য সভ্যতা যে ভিতরে-ভিতরে জীর্ণ হয়ে এসেছে, মানবিক মূল্যবোধগুলি যে সেখানে দারুণভাবে ক্ষয়িষ্ণু, এ কথা লরেন্স নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৯৩০-এ দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রানসের একটি আরোগ্যনিকেতনে ক্ষয়রোগে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, য়ুরোপের রাজনৈতিক আকাশে হিটলারিয় ঘনঘটা তখনও প্রবল হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তার পূর্বেই লেখা একটি ছোটগল্পে লরেন্স এক

জারমান কাউনট (Count Psaneck)-এর মুখে যে সংলাপ বসিয়েছেন তাতে তাঁর সত্যদৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। কাউনট বলছেন, দুর্বল লোকেরা একদিন শক্তিমান নায়কদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। তারা বলবে, "তুমি আমাদের চেয়ে বড়ো। তুমি আমাদের প্রভু হও, তোমার হাতে আমাদের জীবনমৃত্যুর ভার তুলে নাও, তোমার খুশিমতো আমাদের চালনা করো।" এবং সেই জননায়ক তখন উত্তরে বলবেন, "আমাকে যদি বেছে নাও আমাকে বিচার করবার, সমালোচনা করবার অধিকার তোমাদের ছাড়তে হবে। এখন থেকে তোমরা শুধু হুকুম তামিল করবে।" ফ্যাসিবাদের মূল সূত্রটি এই সংলাপের মধ্যে নিহিত আছে। লরেন্স সেই আসন্ন পরিস্থিতিটি পরিষ্কার বুঝেছিলেন। তাঁর রচনা তাই শুধু স্রষ্টার প্রতিভায় উজ্জ্বল নয়, দ্রষ্টার প্রতীতিতেও অর্থবহ।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আ লো চ না

আসাম : এখনও জটিল

দেশে, এবং বিদেশেও, পানজাবের ঘটনাবলীর ওপরই সকলের নজর বেশি পড়েছে ; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—আসাম-সমস্যার জটিলতা অনেক বেশি। অকালি রাজনীতির অভ্যন্তরীণ জটিলতাও অবশ্য কম নয়, এবং পানজাব সমস্যাকে তা অহেতুক দুরূহ করে তুলেছে। কিন্তু পানজাব নিয়ে সত্যিকারের প্রশ্ন যেগুলো, তার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু ছিল না, উভয় পক্ষই একটু বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে এগোলে যার সমাধান করা যায় না।

আসামের সমস্যা অন্য জাতের। তার একদিকে এক বিপুল জনগোষ্ঠী—তাদেরকে গেলাও মুশকিল, উগরে দেওয়াও কঠিন ; আরেক দিকে স্থানীয় অধিবাসীরা—তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রাধান্যের দাবি।

আইন যাই বলুক, অধিকসংখ্যক মানুষ যখন বাসভূমি বলে কোথাও জমি আঁকড়ে থাকে, এবং বছরের পর বছর সে জমি আঁকড়ে ধরেই রাখে, তারপর সেই জনসংখ্যার সেখানে অস্তিত্বই এমন একটা বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়ায়, এমন এক অধিকারবোধের জন্ম দেয় সেই অবস্থান যে তার পরে তাদেরকে বে-আইনি দখলদার বলে উচ্ছেদ করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে। এই কলকাতাতে এবং আশেপাশে কত জবরদখল কলোনি ছড়িয়ে আছে তার প্রমাণস্বরূপ। সেসব জমিরও নিশ্চয় মালিক ছিল কেউ না কেউ, তার বিলিব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনকানুনও ছিল। কিন্তু কোথায় উড়ে গেছে সেসব আইন কে তার খোঁজ রাখে ?

অবশ্যই স্থানীয় অধিবাসীরা দেখতে পায়—এই নিয়মবহির্ভূত বসবাস থেকে নানা সমস্যার উৎপত্তি হয় দিনের পর দিন। কিন্তু আস্তে-আস্তে মানুষ তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, আস্তে-আস্তে সয়ে যায় এই অবাঞ্ছিত উপস্থিতি।

কিন্তু সমস্যাটা ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে যদি স্থানীয় অধিবাসীরা দেখে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে, এবং বহিরাগতদের চাপে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা কলকাতার জবরদখলকারীদের বেলায় এই ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রশ্ন তেমন ওঠে নি। কাজেই, সংখ্যার গুরুত্ব-লঘুত্বের প্রশ্নও আসে নি। বাঙাল-ঘটির ঝগড়াটা যত দিন ছিল, ঠাট্টাতামাশার বিষয় হয়েই ছিল। এখন আর তাও নেই। কে বহিরাগত, আর কে স্থানীয়—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কেউই বিশেষ বোধ করে নি।

আসামে কিন্তু 'বহিরাগত' কথাটাই দিনে-দিনে ফুলেফেঁপে উঠেছে, আরব্য উপন্যাসের সেই কলসীর ভেতর থেকে বেরোনো দৈত্যের মতো। 'কাট-অফ ইয়ার' হবে ১৯৭১ না ১৯৬৬—এ প্রশ্ন তো কয়েক বছর হল খুব জোরদার হয়েছে ; তার আগে থেকেই, 'বহিরাগত'দের বিষয়ে আসাম সচেতন হতে আরম্ভ করেছিল। আসলে, আইনের চোখে তারা বহিরাগত কিনা, ভারতেরই এক রাজ্যের লোককে অন্য রাজ্যে বহিরাগত বলা যায় কিনা—এসব প্রশ্ন খুবই সংগত ছিল বটে, কিন্তু মানুষের সহজাত নানা প্রবৃত্তি, ভয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ, আগন্তুক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈরিভাব, বিশেষত তার আকার যখন অসহনীয় মনে হয়—এসব কোনো আইনকাননের ধার ধারে না।

এদিকে আবার জনবিক্ষোভ, তা সে যতই ব্যাপক হোক, কোনো সরকারি

দেশে বিদেশে

প্রশাসনযন্ত্রকে ঠেলে দেবে আইনের পথের বাইরে—তাও কোনোমতেই কাম্য নয়। তা তো আরোই অবাঞ্ছনীয়, যখন সেই বিক্ষোভ এক রাজ্য থেকে আগত ভারতীয়ের অন্য রাজ্যে বসবাসের ন্যায়-এবং সংবিধান-সংগত অধিকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত। কাজেই, যত দিন পর্যন্ত প্রশ্নটা ছিল ভারতীয়-অসমীয়া আর ভারতীয়-বাঙালি ইত্যাদি নিয়ে, তত দিন বিক্ষোভ থেকে-থেকেই ফুঁসে উঠছিল, অথচ তার স্থায়ী নিরাকরণের কোনো পন্থা, মনে হচ্ছিল, অসম্ভব। মাঝে-মাঝে সে বিক্ষোভ চাপা পড়ছিল বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে একটা গজরানি একটু কান পাতলেই শোনা যেত। সে বিক্ষোভ দলীয় রাজনীতির কাজে লাগত, ছিল বলেই কাজে লাগত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়, দলীয় রাজনীতিতে মানুষের রাগ-দ্বেষ, লোভ-ক্ষোভ, দুঃখ-বেদনা সবই কাজে লাগে। জনপ্রতিনিধিরা মানুষের উদারতা, পরার্থপরতা, কল্যাণবুদ্ধির যেমন, তেমনি আবার ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতারও প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে, যিনি ভালো রাজনীতিক তিনি যেমন নিজের মধ্যে, তেমনি আবার তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যেও, যা মন্দ তার প্রশমন এবং যা ভালো তার পরিপোষণ করবার চেষ্টা চালিয়ে যান।

যাই হোক, বহিরাগতদের নিয়ে প্রশ্ন যখন উঠল আইনগত অর্থে যারা বহিরাগত, অর্থাৎ বিদেশাগত, তাদের সম্পর্কে—তখন, আইনই তার ব্যবস্থা করবে, এ দাবি সবাইকেই মানতে হল। কিন্তু আগেকার পূর্ববঙ্গ থেকে এবং এখনকার বাংলাদেশ থেকে যারা আসামে, অর্থাৎ ভারতে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, চলে এসেছে, তাদের

বহিরাগত বিদেশী বলে গণ্য করা চলে কিনা, কিংবা তাদের মধ্যে কাকে বহিরাগত বিদেশীর শ্রেণীতে ফেলা যায়, কাকে যায় না—সে প্রশ্ন, দেখা গেল, কম জটিল নয়। একথা ঠিকই, দেশ-বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারাদের ভারতে আশ্রয়গ্রহণের অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল; প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—তারা এদেশে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা পাবে। কিন্তু কত কাল? অনন্ত কাল ধরে নিশ্চয়ই নয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পর সেখান থেকে যারা এদেশে এসেছে তাদের বিদেশী বলেই গণ্য করতে হবে—এটা ঠিকই ছিল। কিন্তু তার আগের পাঁচ বছরে যারা এসেছে, তাদেরকে আসামের আন্দোলনকারীরা ভারতবাসী বলে মানতে, দেখা গেল, কিছুতেই রাজি নয়। অথচ তারা আগে ভোট দিয়েছে, সামনের নির্বাচনেও দেবে। তাবপর দশ বছর তাদের ভোটাধিকার থাকবে না, যদিও তাদের বাহিষ্কারও করা হবে না। এই শর্তে আন্দোলন-কারীরা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁদের এই মর্মে বোঝাপড়া হল। আন্দোলন তুলে নেওয়া হল।

এই বোঝাপড়া সম্পর্কে দুটো আপত্তি। এক : বিপুলসংখ্যক মানুষ, যারা এখনও ভোটার, তারা শুধু ভোটই হারাল না—রাষ্ট্রহীন, যাবতীয়-নাগরিক-অধিকারহীন 'অবান্তি' (নন-পারসন)-তে পরিণত হল। তার কারণ, তারা ভারতীয়ও থাকবে না, আবার বিদেশী নাগরিক হিসাবে অন্য কোনো দেশের পাসপোর্টও থাকবে না তাদের কাছে। বাংলাদেশ তাদের স্বীকার করে না, বিপদে-আপদে বিদেশীরা যেমন করে থাকে—ভারতস্থ বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে তারা সহায়তা চাইতে পারবে না। এ অবস্থা খুবই কষ্টকর এবং অনিশ্চয়তায় পূর্ণ মনে হতে পারে। তবে দেশের আইন তাদের রক্ষা করবে না, এবং তারা রুজি-রোজগার হারাবে—এমন আশঙ্কা অমূলক বলেই মনে হয়। সরকার যখন তাদের এদেশ থেকে বহিষ্কার করছেন না, তখন তাদের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার কিছুতেই, কোনো আইনেই অস্বীকার করতে পারে না। যদি তাদের সে অধিকার রক্ষা করতে সরকার অপারগ হন, তাহলে বুঝতে হবে, ভোটাধিকার হারানো তার কারণ নয়—প্রশাসনিক অক্ষমতাই তার কারণ। তবে, ভোটের অধিকার পেয়ে হারানোর ব্যাপারটা আইনের চোখে কেমন ঠেকবে, তা বোঝা যাবে এ নিয়ে মামলা হলে। আশা করা যায়, সে মামলা আদালতে কেউ না কেউ তুলবেন।

দুই : আসামের আন্দোলন এমনিতেই ঝিমিয়ে আসছিল, তার শক্তি শেষ হয়ে আসছিল। এত তাড়াহুড়ো না করলে ভারত সরকার আরেকটু বেশ শর্তে মীমাংসায় আন্দোলনকারীদের রাজি করাতে পারতেন। সম্ভব বটে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার—দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্যে এমন বোঝাপড়ায় পৌঁছনোই আবশ্যক ছিল যাতে মীমাংসা যে ন্যায়সংগত হল, তাদের স্বার্থ যে ভারত সরকার সত্যি-সত্যিই দেখলেন, স্থানীয় অসামবাসী-দের সে বিশ্বাস জন্মায়। তা না হলে আজকের আন্দোলনকারীরা অহেতুক নরমপন্থী, আপোসকামী বলে চিহ্নিত হতেন, কাল আবার অধিকতর উগ্রপন্থা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। সে লক্ষণ নাকি ইতিমধ্যেই দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল।

তবে, একটা তাড়াহুড়োর ছাপ যে এই আসাম বোঝাপড়ার সর্বাঙ্গে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই এর মধ্যে কিছু-কিছু অসংগতি, আইনগত কিছু-কিছু দুর্বলতা সরকারেরও লক্ষ্যগোচর হয়েছে। এ নিয়ে আর কিছু না হোক, আইনগত জটিলতার যে সৃষ্টি হবে, তা এখনই বলে দেওয়া যায়।

হেলসিঙ্কি ঘোষণা এবং মানবাধিকার

এই অগস্ট মাসে হেলসিঙ্কি ঘোষণার দশম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হল। ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে ১৯৭৫-এর ১লা অগস্ট ৩৫টি রাষ্ট্র 'নিরাপত্তা আর সহযোগিতা' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহমতের যে ঘোষণা-টিতে স্বাক্ষর দান করে, সাধারণভাবে তাকেই 'হেলসিঙ্কি অ্যাকর্ড' অথবা 'হেলসিঙ্কি ডিকলেরেশন' বলা হয়ে থাকে। সরকারিভাবে তার পুরো আখ্যা 'দি ফাইন্যাল অ্যাকট অব দি কনফা-রেনস অন সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ।' ইউরোপের ৩৩টি দেশ ছাড়াও এই ঘোষণায় সই দিয়েছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা। শেষোক্ত দুটি দেশ পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সামরিক জোট, নর্থ অ্যাট-লান্টিক ট্রীটি অরগানাইজেশন, অর্থাৎ 'নেটো'-র সদস্য, আর এমনিতেও আমে-রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাজেই, হেলসিঙ্কি সম্মেলনে তারাও উপস্থিত ছিল, এবং ঘোষণাপত্রে তাদেরও সই প্রয়োজন হল।

তবে, মূলত ঘোষণাটি ইউরোপ সংক্রান্ত। সেই বহুজাতি-অধ্যুষিত মহাদেশের আজকের নানা রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত বর্ণবৈচিত্র্য প্রতিফলিত করছে স্বাক্ষরকারী নানা দেশ। নানা দেশ মানে ইউরোপের সব দেশ। এক-মাত্র আলবেনিয়া বাদে। একদিকে যেমন নেটো, আরেক দিকে তেমনি পূর্ব ইউ-রোপের ওয়ারশ-চুক্তির অন্তর্গত দেশ-সমূহ—বিশ্বের এই দুই প্রধান পরস্পরবিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহ এই ঘোষণায় তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অর্থাৎ ঘোষণায় উল্লি-খিত যাবতীয় কর্মধারা অনুসরণে এবং লক্ষ্যপূরণে তাদের সংকল্প তারা ঘোষণা করেছে।

অবশ্যই হেলসিঙ্কি সম্মেলনের এই যে 'ফাইন্যাল অ্যাকট', এই ঘোষণাপত্রে সহমত জ্ঞাপন, ঐ কোনো ট্রীটি নয়। বিধিবদ্ধ চুক্তি যে ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, সেরকম কিছু যে এতে স্বাক্ষরদানকারীদের উদ্দিষ্ট ছিল না, সে কথাও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে ওই সম্মেলনেই। কোনো আইনগত বাধ্যতা স্বাক্ষরকারী দেশগুলি স্বীকার করে নেয় নি এই ঘোষণার মাধ্যমে। তা ছাড়া, এই ঘোষণাপত্রের অন্তর্গত, যোগদান-কারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে নীতিনির্ধারক ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজস্ব অধি-কার আর দায়দায়িত্বসমূহ এবং সে সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি প্রভৃতির কোনো ব্যত্যয় এই ঘোষণার দ্বারা হবে না।

তা হলে এই বহুবিঘোষিত আন্ত-র্জাতিক সহমতের তাৎপর্য কী, মূল্যই বা কী? চুক্তি নয়, আইনগত বাধ্যবাধ-কতার স্বীকৃতি নয়, অথচ বলা হয়েছে এই ঘোষণাপত্র আন্তর্জাতিক কূট-নৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে এক অনন্য অগ্রগতির সূচক। স্বাক্ষরদান যখন সম্পন্ন হল, তখন ব্রেজনেভ বললেন, "আমাদের এই উপগ্রহে শান্তি আর নিরাপত্তা যাঁরা মূল্যবান মনে করেন তাঁরা সকলেই এর দ্বারা লাভবান হবেন।" বস্তুত সম্মেলনে যোগদান-কারী দেশসকল এ বিষয়ে একমত হয় যে ঘোষণাপত্রটির নৈতিক আর রাজ-নৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। এমন আশাও ব্যক্ত করা হয় যে, কালক্রমে এটি মত-বাদগত সহনশীলতার প্রতীক বলে বিবেচিত হবে।

হেলসিঙ্কি ঘোষণার তাৎপর্য বুঝতে গেলে এই একটা কথা মনে রাখা দর-কার যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা ইচ্ছাশক্তির এর দ্বারা প্রকাশ হয়েছিল : দেশে-দেশে বৈরিভাবের প্রশমনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে আরও ব্যাপক, আরও গভীর, আরও দীর্ঘস্থায়ী করার ইচ্ছা। কোন্ দেশ কতটা সুবিধা পেল, কী লাভ করল—প্রশ্নটা তা ছিল না ; প্রশ্ন ছিল, পারস্পরিক সম্পর্ক নতুনভাবে গড়ে তোলার উপযুক্ত অবস্থা কী করে সৃষ্টি করা যায়। ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র যেমন আছে তেমনি থাক, কিন্তু সেই কাঠামোর মধ্যেই জাতিতে-জাতিতে সম্পর্ক উন্নত হোক, নিবিড়-তর হোক—এই ছিল উদ্দেশ্য।

নানা বিচিত্র, জটিল বিষয়ের সমন্বয়ে এই পারস্পরিক সম্পর্কের জাল রচিত হলে তবেই তা পূর্ণাঙ্গতা পেতে পারে ; তবেই দেশ আর জাতির গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মতো সহজ হয়ে আসতে পারে। হেলসিঙ্কি ঘোষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, যতদিক থেকে সম্ভব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সর্বাঙ্গীণ রূপটাকে তাতে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে, মনঃসংযোগ করা হয়েছে তার যাবতীয় সমস্যার প্রতি। রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত—হেন বিষয় নেই যা এই ঘোষণাপত্রে উপেক্ষিত।

আর, এসব বিষয়ে শুধু সংকল্পের ঘোষণা করেই হেলসিঙ্কি সম্মেলন ক্ষান্ত হয় নি, এমনকি অভীষ্ট লক্ষ্য-সমূহে পৌঁছবার জন্যে বিবিধ প্রাতি-ষ্ঠানিক আয়োজনের ব্যবস্থা করেও মনে করে নি যথেষ্ট করা হল ; সংকল্প কতদূর কার্যে পরিণত হচ্ছে তার হিসেবনিকেশেরও ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এই হিসেবনিকেশের জন্যে, কিংবা ঘোষণাপত্রের জন্যে কোনো স্থায়ী সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু, ১৯৭৭-এ বেলগ্রেডে-এ এই বিষয়ে মতবিনিময় করা হবে, সে বিষয়ে হেলসিঙ্কিতে সবাই একমত হন। তা ছাড়া বিশেষ করে ঘোষণাপত্রের মানবাধিকার-সংক্রান্ত ধারাগুলি পালিত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে বেসরকারি 'মনিটরিঙ গ্রুপ' স্থাপিত হয়েছে নানা জায়গায়। বিভিন্ন সরকারি মুখপত্র, সংসদীয় কমিশন, আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রভৃতি এ বিষয়ে মাঝে-মাঝে বক্তব্য প্রকাশ করে।

তার ওপরে, হেলসিঙ্কি সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছিল, সেসব রাষ্ট্রেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালন করতে গেলে, এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের হেলসিঙ্কি-ঘোষণার ব্যাপারে ক্রিয়াকলাপের ওপর নজর রাখতেই হয়। 'ডোমেসটিক জুরিসডিকশন' কথাটা এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'এসব আমার ঘরোয়া ব্যাপার, এর মধ্যে নাক গলিও না।' কিন্তু এতদিনে এই একটা কথা সকলের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল যে, 'একান্ত ঘরোয়া বিষয়' শুধুমাত্র তাকেই বলা যায় যে বিষয়ে বাইরের কারো মাথা ঘামানোর কোনো সংগত কারণ নেই, যার সঙ্গে জড়িত নেই কোনো বিশ্বজনীন কল্যাণভাবনা। অভ্যন্তরীণ বিষয়ও আন্তর্জাতিক নিন্দা-প্রশংসার, সমর্থন-বিরোধিতার কারণ হতে পারে—দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী তার সর্বজনবিদিত উদাহরণ। যদি কোনো রাষ্ট্র আবার স্বেচ্ছায় তার কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয়কে আন্ত-র্জাতিক অথবা বৈদেশিক চিন্তাভাবনার আওতার মধ্যে নিয়ে এসে থাকে, তা হলে সে বিষয়ে বাইরের জগৎকে 'দূর হঠো' বলার অধিকার আর স্বীকার করা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকা বাইরের জগতের সঙ্গে সেরকম লেখাপড়া করে নি, হেলসিঙ্কি অবশ্যই করেছে। বিশেষ করে মানবাধিকার-সংক্রান্ত কোনো বিষয়কে, যে বিষয় 'মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা'-র অন্তর্ভুক্ত, হেলসিঙ্কি ঘোষণার পর তাকে 'অভ্যন্তরীণ' বলে দাবি করা স্পষ্টতই অযৌক্তিক।

কাজেই ১৯৭৭-এর ৭ ফেবরুয়ারি মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখ-পাত্র সোভিয়েত রাশিয়া-স্থিত হেল-সিঙ্কি "মনিটরিঙ গ্রুপ"-এর সদস্য আলেকজানডার গিনসবারগ-এর গ্রেপ্তারের পর যখন বলেন, "সে ঘটনা যেখানেই ঘটুক, যেসব ব্যক্তিরা মানবা-ধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা-র বিধৃত নীতিসমূহ অনুসরণ করছেন,

কিংবা যাঁরা হেলসিঙ্কি সম্মেলনের 'ফাইনাল অ্যাকট' কার্যকর করার জন্যে কর্মরত, তাঁদের হয়রান করা হলে, সেটা সকল মারকিনির পক্ষেই গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হবে।"

এখন সে কথা, যার যতই অপছন্দ হোক, অসংগত বলে আপত্তি তোলা যায় না।

হেলসিঙ্কি সম্মেলনের আলোচনার মধ্যে থেকে দুটি বিষয়ে স্পষ্ট সহমত প্রকাশিত হয় : (১) সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির ৩নং গুচ্ছের অন্তর্গত ৭ম মূলনীতি—ঘোষণাতে যেসব মানবাধিকার লিপিবদ্ধ, সেগুলি সম্পর্কে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়', এই দাবি অশ্রদ্ধেয় ; (২) উল্লিখিত মানবাধিকারের লঙ্ঘন কোথাও ঘটলে, তার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়াকে লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্যায় এবং বে-আইনি হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা চলবে না।

অতএব, ১৯৭৭-এর ওই ফেব্রুয়ারি মাসেই সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রকের সংবাদপত্র বিভাগের প্রধান যে উক্তি করেন, সেটি হেলসিঙ্কি সম্মেলনের মনোভাবের বিরোধী বলেই মনে হয়। তিনি বলেন :

"পশ্চিমী দেশের অনেকে, তার মধ্যে নতুন মারকিন পররাষ্ট্রসচিব সাইরাস ভ্যানস-ও আছেন, বলছেন, সোভিয়েত রাশিয়া হেলসিঙ্কি সম্মেলনের ফাইন্যাল অ্যাকট-এর নীতিসমূহ কতদূর পালন করছে তার ওপর ওয়াশিঙটনের তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত। তাদের প্রতি আমাদের উত্তর এই, অন্যের ওপরে খবরদারি করবার অধিকার আপনাদের কেউ দেয় নি, বিশেষত সেই অন্যেরা যখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। অবশ্য আপনারা যদি মতামত বিনিময় করতে চান সে কথা আলাদা।"

বস্তুত, হেলসিঙ্কি ঘোষণা স্বাক্ষরিত হবার কয়েক দিন পরেই ব্রেজনেভ ঘোষণাপত্রের প্রস্তাব অথবা সুপারিশগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, কিছু সুপারিশ সঙ্গে-সঙ্গে কার্যকর করার মতো, আর কিছু সুপারিশ নিয়ে এগোনো যেতে পারে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে।

অথচ, "ফাইন্যাল অ্যাকট" দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছে, প্রতিটি ঘোষিত নীতি একই মূল্য বহন করে, "প্রত্যেকটি নীতিকে সমানভাবে এবং নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে হবে, এবং প্রত্যেকটির তাৎপর্য বুঝতে হবে অন্যগুলিকে মনে রেখে।" এর পরে কী করে দাবি করা যায়, মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নিছক 'ঘরোয়া ব্যাপার', বহির্জগতের কোনো অধিকার নেই তা নিয়ে কিছু করবার ? সে দাবি তোলা যে অযৌক্তিক, হেলসিঙ্কি ঘোষণা একটু ভালো করে পড়লেই সেটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। আবার, এও সকলের জানা, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে মানবাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমী দুনিয়ার 'মাত্রাতিরিক্ত' মনোযোগ অবাঞ্ছিত। তা হলে, সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার পূর্ব ইউরোপস্থিত সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ হেলসিঙ্কি ঘোষণায় স্বাক্ষর দিল কেন ?

কারণ অবশ্যই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার স্বীকৃতি আছে ওই ঘোষণায়, অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমানা ইউরোপের যে দেশের যেমন আছে তেমনি থাক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার যেমন আছে তেমনি থাক, এবং সেসব মেনে নিয়েই, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের মধ্যে স্বাভাবী সম্পর্ক গড়ে উঠুক—এইরকম একটা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে হেলসিঙ্কি ঘোষণা স্থাপিত হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপ সেইটাই বিশেষভাবে লক্ষ করে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির পক্ষে এটা একটা লাভ, তাতে সন্দেহ নেই, কেননা নিজের-নিজের দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতার যেসব লক্ষণ সেসব দেশে দেখা গিয়েছে তা তাদের দুশ্চিন্তার কারণ, এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ যে তাতে ইন্ধন জোগাতে পারে, এ সম্ভাবনা সে দুশ্চিন্তাকে দ্বিগুণ করে। এই দুর্ভাবনা থেকে মুক্তির একদা আশ্বাস তারা দেখতে পায়, হেলসিঙ্কি ঘোষণার মধ্যে। বিনিময়ে, মানবাধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নে কিছু-কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের প্রস্তাব তারা স্বীকার করে নিয়েছিল সম্ভবত এই কথা ভেবে যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বর 'ব্যাফল ওয়াল' তুলে সেগুলোর ধাক্কা যথাসময়ে এবং যথাপ্রয়োজনে সামলানো যাবে।

কিন্তু হেলসিঙ্কি ঘোষণার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য যেটি, যেখানে তার সবচেয়ে বড়ো শক্তি, তার উল্লেখই এখনো করা হয় নি। মানবাধিকারের হাতে সেটিই সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।

এই নিশ্ছিদ্র অনুজ্ঞাটি হেলসিঙ্কি ঘোষণায় স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ : "এই ফাইন্যাল অ্যাকট-এর বয়ান প্রত্যেকটি স্বাক্ষরকারী দেশে প্রকাশিত করা হবে, এবং সেই রাষ্ট্র এর প্রচার করবে, যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে সকলকে এর বিষয়ে অবহিত করবে।"

অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের জানলেই হবে না, সর্বসাধারণকে জানতে হবে হেলসিঙ্কি ঘোষণার পূর্ণ বয়ান, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে স্বাদ্রের অবসানের জন্যে এর প্রত্যেকটি প্রস্তাব। রাষ্ট্রের গণ্ডি ডিঙিয়ে মানুষে-মানুষে ভাবনা-চিন্তা বিনিময়ের জন্যে এর প্রত্যেকটি সুপারিশ, মানবাধিকারের সপক্ষে এর প্রত্যেকটি বক্তব্য।

অর্থাৎ ঘোষণায় যে আছে,

"যৌথ দানকারী রাষ্ট্রসমূহ মানবিক অধিকারসমূহ, মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা দেবে, যার অন্তর্গত, চিন্তার বিবেকের, ধর্মের, বিশ্বাসের স্বাধীনতা—জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের জন্যে।

"নাগরিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অধিকারসমূহ মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা থেকে যার উদ্ভব, এবং তার অবাধ এবং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে যা অপরিহার্য, তার উন্নয়ন এবং কার্যকর প্রয়োগে উৎসাহ দান করবে।" এই সংকল্পবাক্য কোনো রাষ্ট্র যদি বা ভুলে যায়, সর্বসাধারণ যাতে না ভোলে, সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত।

উল্লেখ করা উচিত, 'প্রাভদা' এবং 'ইজভেসতিয়া'তে হেলসিঙ্কি ঘোষণা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এই দশ বছরে হেলসিঙ্কি ঘোষণার ফল কার্যক্ষেত্রে কতটা পাওয়া গেল ? সামরিক ব্যাপারে পারস্পরিক সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের উপশমের প্রচেষ্টা কিছু-কিছু দেখা যায়—যথা, বড়ো আকারের ফৌজি তৎপরতার নোটিশ আগে থেকে একে অপরকে দেওয়ার নিয়ম বহাল হয়েছে। আর্থিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে সহযোগিতার প্রয়োজন এখন দু-দিক থেকেই স্বীকৃত, যদিচ সেই সহযোগিতায় কে বেশি লাভবান হচ্ছে তা নিয়ে অভিযোগ অনুযোগ শোনা যায়। কিন্তু মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ?

সোভিয়েত রাশিয়ায় হেলসিঙ্কি ঘোষণার কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দেবার জন্যে যে মনিটরিঙ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে তার ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ৬০ জনকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। ১৫ জনকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়, ৪ জনের মৃত্যু হয়—প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী জেলখানায় নির্যাতনের ফলে।

কাজেই, এখনও দীর্ঘপথ সামনে।

২৭.৮.১৯৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রকলা

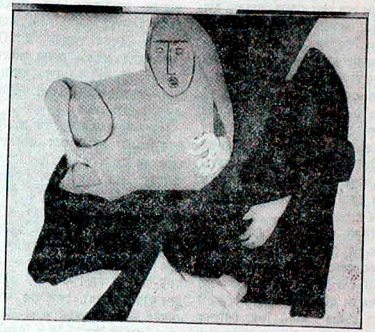

তেলরঙে আঁকা ছবি। শিল্পী এন. ডি. কৃষ্ণ খান্না

সমকালের চিত্রকলা

ছবি-আঁকিয়েদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানসিক চলাচলের রাস্তা কোনোদিনই স্বচ্ছন্দ নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে অযথা দুঃখ করা বৃথা। কবিতার পাঠকের সংখ্যা যেমন চিরদিনই লঘু, মাস মিডিয়ার কাছে তেমনি ছবির আবেদনও কোনোদিন পর্যাপ্ত নয়। বরঞ্চ এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ওপন্যাসিক বা গল্পকারেরা। জনগণের হৃদয়কে সহজেই শিকার করতে পারেন তাঁরা। অথচ কিছুদিন আগে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে যেরকম জনসমাগম হয়েছিল তাতে আমাদের প্রচলিত ধারণা বেশ ধাক্কা খেল। পাঁচদিন ধরে একটি সিরিজে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পীদের বর্ণবহুল কর্মকাণ্ডকে ভিডিও যন্ত্রে দেখালেন অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ। 'দ্য জিনীয়াস স্ট্রোকস' দেখার জন্য সে কী উপচেপড়া ভিড়। আমেরিকান যন্ত্রসভ্যতার যে কতদূর সমৃদ্ধি, 'রক্তকরবী' বা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী'-র যুগ থেকে আমাদের তা জানা। মারকিন আর্টিস্টরাও যন্ত্রে বিচিত্র টেকনিক আর কায়দাকানুন দিয়ে আজকের যুগে কেমন কাজ করছেন, বিশেষ করে গ্রাফিক কাজের রীতিনীতি কতদূর যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠেছে—তারই ছবি তুলে এনে দেখানো হল। যন্ত্র মারফত আঁকা ছবি কতদূর পারফেকশনে পৌঁছোতে পারে কৌতূহলী দর্শকেরা নিশ্চয়ই সে-ব্যাপারে বিশদ অবহিত হতে পেরেছেন, অনেকেরই বহু ফিকে

ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে আকর্ষণীয় ছিল একেবারে অন্তিম দিনের ছবিটি। সন্ধেবেলা দরজায়-দরজায় লোডশেডিং-এ বিরক্তিপূর্ণ পরিবেশ সত্ত্বেও বিড়লা অ্যাকাডেমির একতলার চাতাল ভরে গেল, লোকে-লোকারণ্য হল সিঁড়ি, বারান্দা করিডোর, ভিড়ে উপচে পড়ল লিফ্‌টের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট।

অন্যদিকে দোতলার হলঘরে জায়গা পেয়েছে সমকালীন চল্লিশজন শিল্পীর সেরা ছবি। প্রত্যেকেই নামি, প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকেই বিবেকী বুদ্ধির উৎকৃষ্ট নির্বাচন। বলাই বাহুল্য, তাঁদের চিত্রকলার সমালোচনা নিতান্তই ধৃষ্টতা। কেবল যে-সমস্ত শিল্পী বিশেষভাবে হৃদয়ে নিজেদের কীর্তির দাগ কেটে যান তাঁদের কথাই শ্রদ্ধা-পূর্বক স্মরণ করছি।

বিড়লা অ্যাকাডেমির দোতলার হল-ঘরে যাঁরা গেছেন তাঁরা জানেন কিভাবে, কোন্ ডাইমেনশনে খাড়া করা আছে বোর্ড বা ক্যানভাসগুলি। সেগুলি মাপমতো ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে ভরাট করে ফেলার জন্যও কিছু শৈল্পিক চেতনার প্রয়োজন হয়। আমাদের জানা নেই—বিড়লা অ্যাকাদেমি কর্তৃপক্ষ নিতান্ত কোনো শিল্প-অজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে হলঘরটি সাজিয়েছিলেন ; বা, ছবিগুলির সুবিন্যাসের জন্য চেয়েছিলেন কোনো রসিক বা সমঝদার ব্যক্তির পরামর্শ। মোটের উপর যিনিই হলঘরটি সাজানোর দায়িত্ব নিন না কেন, তাঁর নিহিত হৃদয়ে শিল্পানুরাগ একেবারে প্রশ্নাতীত।

হলঘরটিতে প্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীনাথনের 'হোমেজ টু দ্য ভ্যালি'-র আশ্চর্য চোখজুড়ানো রঙের আলতো কোমলতা যেন চোখের উপর পালক বুলিয়ে দিয়ে গেল। উপত্যকায় সেখানে আদিগন্ত পক-অপক শস্যের সম্ভার, পাখিরা আগলে রেখেছে নিজেদের সন্ততির সুডৌল আধার, যেখানে সুস্থ প্রাণের প্রবাহের অনর্গল সম্ভাবনা, মানবপ্রজাতির আবক্ষ শ্বাস-গ্রহণের দুর্মর প্রতিশ্রুতি—'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর পটভূমিকা হিসেবে 'গ্রাসমিয়ার' গ্রামের নিসর্গ আমাদের কি মনে পড়া খুবই অদ্ভুত হবে? ওলড টেসটামেনটের সেই নোয়ার গল্প, যেখানে প্লাবনের বিভীষিকার পর পাখির ঠোঁটের কিশলয়ে নবীন অপাপবিদ্ধ পৃথিবীর শৈশব অথবা 'রূপসী বাংলা'র সেই আর্তি—"আবার আসিব ফিরে/বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে/জলাপাখি দেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।"

বিড়লা অ্যাকাদেমি কর্তৃপক্ষ প্রতিটি প্রদর্শনীতেই একটি করে ক্যাটালগ হাতে দেন আর তাতে শিল্পীদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি থাকে, সঙ্গে থাকে তাঁদের কীর্তির ছোট্ট পরিচয়। মস্ত বড়ো আর্টবোর্ডকে রঙ দিয়ে খুশিমতো ভরিয়ে ফেলবার পর শিল্পীরা খুব দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে নীচে স্বাক্ষর করেন, কেউ বা তাও করেন না। কেউ জুড়ে দেন ছবিটার পদবী, কেউ তাও নয়। মোটের উপর বুঝবার মতো তাতে পাওয়া যায় না কিছুই। কিন্তু শিল্পীর যা খেয়াল তাকে আর দোষ দিয়ে লাভ কী? অ্যাকাদেমি কর্তৃপক্ষ সাইক্লোস্টাইল-করা কাগজে ছবির পরিচয় সমেত শিল্পীদের নামের তালিকা সরবরাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাও মাত্র কয়েক মিনিটের দেনা। দর্শকেরা যেন আবার সেগুলি ফিরিয়ে দেন—এইরকম অনুরোধ ছিল। আমি অবশ্য পত্রিকার তরফ থেকে গেছি বলে পরিচান পেলাম, সঙ্গে একটি ছবিও। আবছা, প্রায়-মুছে-যাওয়া কালির ছাপার হরফ থেকে শব্দগুলি খুঁড়ে উদ্ধার করলাম ছবিগুলির শিরোনাম। শিল্পীদের পরিচয় মনের মধ্যেই আঁকা ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রামকিংকর, যামিনী রায়, নীরদ মজুমদারের পর যোগেন চৌধুরী, এম. এফ. হুসেন, পরিতোষ সেন, ইশা মহম্মদ, গণেশ হালুই, প্রকাশ কর্মকার, গণেশ পাইন, শুভাপ্রসন্ন, বিমল দাশগুপ্ত, করুণা সাহা, বিকাশ ভট্টাচার্য, হেব্বার, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত, পিরাজী সাগর ভারতীয় শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

তিরিশের সাহিত্যধারায় যে পাশ্চাত্য ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, সেই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত জলস্রোতই তছনছ করে দিয়েছে শিল্পের সাজানো সংসারকেও। অবনীন্দ্রনাথের মুঘলী দরবার, নন্দলালের নাম গ্রামীণতা, যামিনী রায়ের রামরাজত্ব, এমনকি নীরদ মজুমদারের কুলকুণ্ডলিনী-তন্ত্রতপস্যার ওপর বিশ্বযুদ্ধের রাক্ষস ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুচিয়ে দিল সমস্ত শান্তি। পৃথিবীর অর্থনীতি গেল ঘুলিয়ে, সাংস্কৃতিক যজ্ঞেও এল চরম নৈরাজ্যের ভাঙন। স্পেনের মুহ্যমান শিল্পী পাবলো পিকাসো মননের চোরাবালি খনন করে 'গোয়ার্নিকা'য় আঁকলেন সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গতাণ্ডব। ধনতন্ত্রের হুমকিতে কেঁপে উঠল পৃথিবীর জঠর। সেই 'গোয়ের্নিকা' চিত্রকলা-জগতের উত্তরসূরীদের আদর্শ হয়ে উঠল। হিরোশিমার বিস্ফোরণে বিকলাঙ্গ, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু মানুষের পৃথিবীজোড়া হাহাকার ভারতীয় শিল্পীদের কানেও পৌঁছল। তাঁরাও উদ্‌ভ্রান্তের মতো আঁকতে চাইলেন ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর প্রতিলিপি। প্রকাশ কর্মকার, শুভাপ্রসন্ন, বিশেষভাবে বিকাশ ভট্টাচার্যের শিল্পধারায় উন্মোচিত মানবেরা সেই বিকৃত সভ্যতারই বংশধর। পিকাসোর সমকালে বা অল্প পরে মাতিস, গগ্যাঁ, ভ্যানগগ প্রমুখেরা ইয়োরোপের দাহের ছবি আঁকছিলেন ঠিক এইরকম ভাবেই।

অবশ্য ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ভারতীয় চিত্রকলার আদিপুরুষ ধীমান বা বীতপালের প্রভাব যাকে ভাবিত করতে পারে নি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রপিতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন তাঁর মন শিলাইদহের পদ্মালালিত শ্যামলাঞ্চলে 'অশ্রুজলে চিরশ্যাম' করছিল 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি', অথবা যখন শান্তিনিকেতনের খোয়াই-এর ঢেউখেলানো প্রান্তরে যোজনান্তব্যাপী তন্বীতমালের মাঝখানে বিবাগী হয়ে যাচ্ছিল তাঁর দৃষ্টি, সেই সময়ই তুলি হাতে নিয়ে তিনি কখন যে কালাপানি পার হয়ে ভিনদেশে ফেরার হয়েছেন—আমরা জানতেও পারি নি। আধুনিকতার যে জ্বালামুখ নিজের হাতে, যত্ন করে খুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজকের শিল্পীরা, যাঁরা বিশ্বযুদ্ধের আঁচে ঝলসেছেন, তাঁরা অদ্যাবধি পরম আগ্রহে নতুন নিরীক্ষায় শুশ্রূষা করে চলেছেন সেই অনর্গলিত ধারা।

সৎশিল্প তো স্থবির থাকে না, অনন্তচলনধর্মই তার সমৃদ্ধির পক্ষে শ্রেয়তর। আর সেই কারণেই উচ্চাভিলাষী শিল্পীরা মাঝে-মাঝেই নতুন পথে পা বাড়াতে ভালোবাসেন। 'গড ইজ অফুল'-এর বিকাশ ভট্টাচার্যকে চেনা যায় খুব সহজেই, 'শী অ্যানড দ্য চার্চ" ছবিতে শুভাপ্রসন্ন পাপবোধ দিয়ে পবিত্র ক্যাথলিসিটিকে প্রাণপণ পীড়ন করছেন দেখে বয়স্ক এলিয়টের বেকেট (মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্র্যাল) ভেঙে দুমড়ে পড়তেন কিনা জানি না, তবে শিল্পীর এটিই নিজস্ব স্বভাব। স্বাক্ষর-প্রমাণ ছাড়াও তাঁকে শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না মোটেই। গণেশ হালুই-এর 'অপরাজিতা' প্রাণময়, যোগেন চৌধুরীর 'রেমিনিসেন্স অব দ্য ড্রীম'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবির মতোই অকপট সারল্য। এঁদের কেউ-কেউ তারুণ্যের পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়েছেন প্রৌঢ়ত্বে, কেউ-বা প্রায় বৃদ্ধ। কিন্তু আজও কোথাকার যেন প্রভাব-প্রচ্ছায়ায় জারিত হয়ে চলেছে এঁদের মনোলোক। অনেকেরই নন্দনবোধে বৈদেশিকতার দাপট একেবারে বেপরোয়া। শক্তি বর্মনের কাজে অবশ্য টেকসচারের চাতুরী থাকলেও তা সহজেই কমিউনিকেট করে। রামকুমারের ইমেজ বা কে. জি. সুব্রামনিয়মের কাজে একসপেরিমেনট থাকলেও ভাব মারা পড়ে নি। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ এত বেশি বদলে ফেলেছেন রীতিনীতি টেকনিক, এমনকি দৃষ্টিভঙ্গিও যে ছবি দেখামাত্র কার ছবি তা নির্ণয় করে ফেলবার গর্ব টুটে যায় বারবার। যেমন হুসেন পালটে ফেলেছেন নিজের ছবির ভাষা। ইশা মহম্মদের ভাষ্য অবিচল থাকলেও পদ্ধতি গেছে বদলে। 'ভিজিট নামবার টু' ছবির বিচারে অসামান্য। কিন্তু বিকাশ ভট্টাচার্যের চলতি ধারায় তা কথা বলল না। সম্পূর্ণ খোলনলচে বদল করে ছবির গঠনকে ঢেলে সাজিয়েছেন সর্বাধিক প্রকাশ কর্মকার। কিন্তু তাঁর নতুন ধাঁচের ছবিতে কোথায় আগেকার বৈদগ্ধ্য, কোথায় আগেকার মুনশিয়ানা? তবে কি এতদিন পরে আবার প্রভাবের কাছে মাথা নত করে তিনি শিথিল করছেন নিজের ব্যক্তিত্ব?

বর্ণালী দাস

আহসান হাবীব

মৃত্যুর মাস দেড়েক আগে আহসান হাবীবের শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলাম, এখন তাঁর অসুবিধা কী? প্রেসারের সঙ্গে ডায়াবেটিস নেই তো? স্মিত হেসে কবি বললেন, কিছু-কিছু সব রোগই আমার আছে। তবে এই নিয়েই স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করছি আর কী? সেদিন একটুও মনে হয় নি এত তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন।

হঠাৎ একদিন পত্রিকায় দেখলাম, আহসান হাবীব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর আগেও তিনি অনেকবার হাসপাতালে গেছেন, আবার কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে এসেছেন। তাই এবার তাঁর হাসপাতালে যাওয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিই নি। তবু দেখতে যাব-যাব করে কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। এর মধ্যে লোকমুখে শুনলাম তাঁর অবস্থা বিশেষ ভালো না। ১০ই জুলাই সকালে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যাচ্ছিলাম, পথে এক বন্ধু বললেন, আজ সকালে আহসান হাবীব মারা গেছেন। স্তম্ভিত হলাম শুনে।

১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি বরিশাল জেলার পিরোজপুরে তাঁর জন্ম এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবার আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো না থাকায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হয়েও পড়াশুনা অব্যাহত রাখতে পারেন নি। ১৯৩৭ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে জীবিকা হিসেবে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেন এবং 'দৈনিক তকবীর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। উল্লেখযোগ্য যে তখন থেকেই তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে কিছুদিন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে কাজ করা ছাড়া কর্মজীবনের প্রায় সবটাই আহসান হাবীব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাহিত্যসম্পাদকরূপে অতিবাহিত করেন।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রাত্রিশেষ', বইটি কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কমরেড

ঢাকার চিঠি

পাবলিশার্স থেকে বেরিয়েছিল। 'রাত্রিশেষ' তৎক্ষণাৎ পাঠক-সমালোচকদের চোখে পড়ে : মোটামুটি ভালো রিভিয়ু হয় পত্রপত্রিকায়। ওই বইয়ের প্রায় সব কবিতাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের সময়ে রচিত। সেজন্যেই ওই কাব্যের অধিকাংশ কবিতার সুরই নৈরাশ্যবাদী :

[ক] দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখীর মতো
বন্ধ্যামাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণামান।
[দ্বীপান্তর]

[খ] ঝরা-পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়।
[এই মন এই মৃত্তিকা]

[গ] এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না আজকে এটা বালুর চর
চারিদিকে এর কৌটিল্যের কণ্টকময় বনধ্বংস
ঊর্ধ্বে আকাশ ম্লান মেঘের
নিম্নে অতল বন্যা এর
বাস করে শত চাণক্যশিশু শকুনির বহু বংশধর
এখানে তোমার ছাউনি ফেলো না ওখানে
বেঁধো না বিশ্রামঘর।
[আজকের কবিতা]

আগাগোড়াই সমাজসচেতন কবি আহসান হাবীব, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর সরস, তাঁর বাচনভঙ্গিটি উত্তেজনাসন্টিকারী কবির নয়—একজন সচেতন-রোম্যানটিক কবির। তাঁর প্রথম বইয়ের 'রেডরোডে রাত্রিশেষ' একটি ভালো কবিতা, ওতে কিঞ্চিৎ আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে :

খানিকটা হেঁটে গিয়ে
মার্কুইস লেন ছাড়িয়ে
কিড স্ট্রীট পেরিয়ে
তারপর চৌরঙ্গি।
গড়ের মাঠ দু টুকরো
মাঝখানে আড়াআড়ি পিচের পথ
পেরিয়ে
অতঃপর দীর্ঘ রেডরোড।
...
সকালবেলার হাওয়ায় লাগবে জোর
পুরনো ধুলোরা এবার উড়বে।

তাঁর অন্যান্য কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'ছায়া হরিণ' (১৯৬২), 'সারা দুপুর' (১৯৬৪), 'আশায় বসতি' (১৯৭৪), 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' (১৯৭৬), 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' (১৯৮০), 'প্রেমের কবিতা' (১৯৮১) এবং 'বিদীর্ণ দর্পণে' (১৯৮৫)। এ ছাড়াও তাঁর গল্প-উপন্যাস আর ছোটোদের জন্য রচনাবলি রয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবনেও বড়োই শান্ত, নির্বিরোধ ধরনের মানুষ ছিলেন আহসান হাবীব। কারো উপরে তিনি সংগত কারণেও বিরূপ হলে তাকে বৈরিতায় পর্যবসিত হতে দেন নি তিনি। এজন্যে তাঁর কোনো শত্রু ছিল না, বিপুল বন্ধুবান্ধবও ছিল না তাঁর যাঁরা তাঁর জাগতিক উন্নতিতে সহায়তা করবেন। জীবনের শেষ একুশ বছর তিনি ছিলেন 'দৈনিক বাংলা'র (স্বাধীনতার আগে যা ছিল 'দৈনিক পাকিস্তান') সাহিত্য-সম্পাদক। এক সময় তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় দৈনিকটির সাহিত্যের বিভাগটি ছিল অসামান্য উর্বর আর সুন্দর। প্রচণ্ড নৈরাশ্যের মধ্যেও একধরনের আশার হাতছানি তিনি দেখতে পান। 'আশায় বসতি' গ্রন্থের 'নৈঃশব্দ্যে নিহিত আমি' কবিতায় তিনি নিজের সম্পর্কে সুন্দর বলেছেন :

আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।
কোনো মসৃণ সদয় দীর্ঘ মই
আমার আয়ত্তে নেই, নেই
রৌপ্যাধারে সবুজ পানের খিলি তাই
তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই কিছু পৃথিবীতে, আমি
পরার্থে বিলাবো প্রাণ এমন মহৎ
উদ্দেশ্যে কখনো নই নিবেদিত, এক
নিরীহ সংসারী আমি, নির্বিবাদী আর
জীবনে তেমন কোনো চমকপ্রদ দর্শনের অভিমান নেই।

বিপুল প্রতিপত্তি তাঁর ছিল না, এক ধরনের শান্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তবু দেশবাসীর কাছ থেকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। কবিতার জন্যে দেশের উল্লেখযোগ্য পুরস্কার সবই তিনি পেয়েছেন, যেমন—বাঙলা একাডেমী পুরস্কার, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, ইউনেসকো পুরস্কার, আবুল মনশুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, পদাবলী পুরস্কার প্রভৃতি। আহসান হাবীবের মৃত্যুতে আমাদের কবিতার জগৎ অনেকখানি দরিদ্র হল।

সৈয়দ আবুল মকসুদ